রুচি-বিচার ও যুক্তিস্বচ্ছতার মাত্রা

শহীদ ইকবাল

রুচি-বিচার ও যুক্তিস্বচ্ছতার মাত্রা

শহীদ ইকবাল

www.chinnofoundation.org

চৈতন্য ॥ সিলেট

নিবেদন

অনেকদিন জমে জমে এ লেখাগুলো হয়েছে; বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নজনের তাগাদায়। গল্পকার মাসুদ পারভেজের সাহায্য ও অনুপ্রেরণায় এটি মলাটবন্দী হলো। তিনিই সিলেট-নিবাসী প্রকাশক রাজীব আহসানের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট অন্য সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

শহীদ ইকবাল
১৪২২ বঙ্গাব্দ

www.chinnofoundation.org

সৈয়দ মো. বদরুল ইসলাম
শ্রদ্ধাভাজনেষু

www.chinnofoundation.org

প্রবন্ধক্রম

১. ক্ষোভ ও বিষাদের ওপারের রবীন্দ্র-‘আনন্দ’
২. কাজী নজরুল ইসলাম
৩. নজরুলের কবিতার প্রত্যয়
৪. আবুল হোসেনের কবিপ্রসিদ্ধি
৫. শামসুর রাহমান : বিচারবোধের স্বরূপে
৬. কাদরীর কবিতা
৭. আবুল হাসান : স্বর্গোদ্যানের নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক
৮. কবি রুদ্র : আপাদমস্তক ‘উপদ্রুত উপকূল’
৯. আশির কবিতার নির্মাণচিন্তা ও প্রতিষ্ঠিত সঞ্চয়

*** *** ***

১. মনিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে
২. পুতুল নাচ ও মানিকের শিল্পমন
৩. মহাশ্বেতার সাহিত্যস্বভাব
৪. কল্যাণকর/বেসরকারি রাষ্ট্র ধারণা : প্রসঙ্গ *সমুদ্র বাসর* উপন্যাস
৫. কর্কশ নিয়মে বন্দী চিলেকোঠা
৬. ‘কী দেখিলাম এই খোয়াবে’
৭. *সাবিত্রী উপাখ্যান* : পন্থা ও পরিণাম
৮. ‘অপ্রাতিষ্ঠানিক’ বয়ান-কাঠামোর শিল্প : প্রসঙ্গ সেলিনা হোসেন
৯. মিলনের গল্প : জন-সংস্কৃতির বেসরকারি মুক্তাঞ্চল

www.shimofoundation.org

ক্ষোভ ও বিষাদের ওপারের রবীন্দ্র-'আনন্দ'

বাঙালির ভেতরে ও বাইরে মাত্রামাফিক পরিবর্তন আসে, উনিশ শতকে। তবে তা কুলপ্লাবী বলার উপায় নেই, নিয়তির ভার তখন অনেকটা ছায়া-প্রচ্ছায়ার আটকানো, পূর্বের কঠোরতা পেরুনো, চিরনিয়মের মূল অনেকটা আলগা, চিরকালীন রীতি-সংস্কার প্রথায় আগের ন্যায় তীব্রতর নয়—মানুষের বা প্রাত্যহিক আচরণিক তাবৎ কর্মকাণ্ডে এক ধরনের নড়েচড়ে বসার তাগিদ। কারণটি কী? তাতে প্রশ্নের আগে আরও প্রশ্ন জমে—ঠিক কেন তা হতে শুরু করল, কোন্ ইঙ্গিতে কীসের নিশানায়! আমরা একে একে চিন্তায় আনি, সামন্তবাদ বা ফিউডাল সমাজ চুরচুর ভাঙনে তখন পরিপ্লুত, সেই নবাবকাল বা রাজাগজাসমেত দুমড়ানো-মুচড়ানো ভস্মস্তূপ—ঐমতো সময়সমূহ। তাতে পাওয়া যায় নীরবতার নিঃশ্বাস, পড়ন্ত কালের দুর্মর প্রলেপ। সেইটিতে শুধুই ব্যবস্থা আটকানো নয়, ছিল মা-প্রণয়ীর অবদমন, পুরুষপ্রাধান্য, জৌলুস-জেল্লার জবরদস্তি। মানবতা-মানুষ ওই আধারেই ঠিকানায় বর্তায়। ব্যবহার্য জীবনে তখন ভোগ আর স্বৈরনিয়মের। তাল-লয়, তূর্যতাণ্ডব দৃঢ়মূল। বেরুনো যায় না, যেহেতু ব্যবস্থার যাঁতাকলে ব্যবহৃত তামাম তৈজসপত্র। শ্রমশোষণ আর উমেদারীর দায় ওই রীতিতে কায়েমী। সে সবের অবরুদ্ধতা থেকে পরিত্রাণ ওই উনিশ শতক। আর ওই আঁচে পড়েন রবীন্দ্র-পূর্ব প্রত্যূষকালীন বুদ্ধিজীবীগণ। কিন্তু রূপান্তরসমূহ তো সহজে আসে না, দ্বিধার কাঠিন্য, পেরুনোর দুর্বলতা অনেক। রীতিমান্য যা কিছু তার বিপরীতে যদি সৃজনশীল আইন হয় (যদিও তা হওয়ার জন্য অনেক ত্যাগ দরকার), সে আইনটির কার্যত প্রয়োগ দ্বিধাহীন থাকে না, জড়তায় আটকায়, তুমুলপ্লাবী বিপরীত মোহ চিত্তবিজড়িত হয়ে দাঁড়ায়। তবুও মনুষ্যতাড়ন অপার-অপ্রতিরোধ্য। উনিশশতকের একটি অংশে পাল্টে যায় অনিবার্য আচরণসমূহ, দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায় উপযোগী-উপাদান। তবে তখনও সে উপযোগী-উপাদান এক স্থূল কাটরা পেরোয় না, সূক্ষ্মতর সহানুভূতি ধরে অগ্রগামী হয়, ইহজাগতিকতায় ক্রম-বিস্তৃতি চলে অতঃপর সত্যসমূহ জীবনের জালে আটকাতে থাকে। কী প্রসঙ্গ : প্রগতি তথা ইহ-পার্থিব-মর্ত্য সংবাদ; সতীদাহ অচল প্রতিপন্ন, বাল্য বা বিধবা বিয়েপ্রথা ভাঙা, কেন্দ্রশক্তির বদলে প্রান্তশক্তির প্রসার, জাতি-জাতীয়তাবাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত, রাজনীতিক বলয়বৃত্ত অঙ্কন। বলেছি ওইরূপ—ক্রমশ আটকাতে থাকে। তখনও ধর্ম-সংস্কার তনয় আচরণসমূহ বিদ্যমান আর ইতিহাসসমূহ স্পষ্ট নয়। পাশ্চাত্য রেনেসাঁর প্রাবল্য ব্যক্তিতে, তারও অনেক ধীরে সমাজে এবং বিপরীতে শক্তপায়ে প্রচলিত ধর্ম-আচার-আচ্ছন্নতাকে অস্বীকার, পৌঁছুনো

www.chinnofoundation.org

ব্যক্তিতন্ত্র পরিস্রুত সমাজতন্ত্রে, বস্তুবাদে কিংবা ভাববাদের ভেতরের বস্তুতে, অধ্যাত্ম-আকরে প্রভূত ঋষিকুল মানুষ ও ততোধিক মানুষ প্রশ্রয় পেয়ে যায়। বেদ-উপনিষদ বা ওইরূপ অনুসন্ধিৎসা মানুষে বর্তায় বর্তমান হতে থাকে। নইলে উপায় কি!

'রূপের অন্তরদেশে অপরূপপুরে'

উপর্যুক্ত পটচিত্রে পড়ি : 'হে উদাসীন পৃথিবী,/ আমাকে সম্পূর্ণ ভোলাবার আগে/ তোমার নির্মম পদপ্রান্তে/ আজ রেখে যাই আমার প্রণতি'—এরূপ শতবর্ষ পরের তাঁর এ 'ক্ষেদ' এবং তার 'পরে আকর্ষণ প্রণয়-অঞ্জলি গেঁথে—পেতে চাই আমার এক্ষণকার রবীন্দ্রনাথ। যে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫-এ এরূপ বলেছেন, পৃথীবির উদাসীন রূপ—আরও একই সময়ে লিখেছেন : 'সভ্যের বর্বর লোভ/ নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা'। ক্ষোভ-এর প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথে বিচিত্ররূপী ও ক্রমায়মান—১৯ শতকের শেষে কথাসাহিত্যের দাপটে রবীন্দ্রনাথ বিকাশমান, কারণ উপর্যুক্ত সমাজ-কাঠামোর ভাঙচুর-পরিণতি আর তৎ-সম্পর্কিত মনোস্তরের ইঙ্গিত অবস্থান-স্ট্যাটাস অপার করে তোলে প্রাচুর্যময় জীবনকে। ভক্তি-বস্তু দ্বন্দ্ব ব্যক্তিক ক্ষেত্রকে দুর্মর গাঠনিক রূপে তুলে ধরে, কথার ভেতরে ওইরূপ বিশ্বাসবলয়প্রচার প্রগাঢ় হয়, চরিত্র প্রতিফলনে তা পরিস্রুতমান। তখন রবীন্দ্রক্ষোভ কাঁচা, বিষাদমূল্য নির্ভর 'নির্ভয় করো হে' আকুতি-আশ্বাস বলছি তা ক্রম-পরিণতি পাচ্ছে। নীতি-মনুষ্যত্ব-মানবিকতা-মানবসংসার তাতে ভারাক্রান্ত। উল্টোপীঠে ক্ষোভ দাঁড়াচ্ছে, বিষাদ বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠছে। আর তার অনেক পরের পরিণতি 'উদাসীন পৃথিবী' ক্ষেদ। এটি সময়সিদ্ধান্ত। কিন্তু কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের তাই শেষ কথা নয়, বা তা কখনো শেষ কথা হতে পারে না। অধীত-আখ্যায় রবীন্দ্রনাথ অসীম-অরূপ কিন্তু দাঁড়ান শুভ-শ্রেয়ো আরও অধিকতর শুদ্ধ মানুষ-জীবন-জীবিতরূপে। জেনে যান, মানুষই শেষ—সর্বান্ত। আর অন্তঃকরণে তার ভেতর-বাহির, পার্থিব-অপার্থিব-বিনাশী-অবিনাশী-নশ্বর-অবিনশ্বর-মর্ত্য-অমর্ত্য রূপকে যৌক্তিক করে তোলেন—একদিকে জীবনকে অন্যদিকে মানুষকে, আরও বিস্তৃত করে বললে মনুষ্য-আত্মাকে—যেটির কারণে সর্বোর্ধ্ব-সঙ্গত ও যুক্তিঋদ্ধ তার অমিত-আত্মা। সে পারাবারে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ও বিষাদ পরিলিখিত। অধিকতর ব্যঞ্জিত। কোনোকিছু আরোপিত না হওয়ায়, রবীন্দ্রনাথ মানুষে সর্বান্তঃকরণ থাকায় এর পরিক্রমা ক্রম-আকর্ষিত হয়েছে। জমিনে দাঁড়ায় তার দর্শন। সার্থক হয় শ্রেয়োবোধ। অপাররূপে। দৃষ্টান্তটি দাঁড় করানো যায় এ পাঠে :

একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছ তোমায়
আগন্তুক! রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছ

www.chinnofoundation.org

সূর্য-নক্ষত্রের সাথে।

কিংবা,

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক,
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।'

কিন্তু মানুষ—তাতে আপন মানুষ, আত্ম-অশেষ, আত্ম-সমালোচনা অতঃপর পরিব্যাপ্ত মানুষ—'প্রাণের মানুষ'। কিন্তু সবই কি রূপের স্বপন? তবে ক্ষোভ কি? কীসে বা কার জন্য? কেন? এর জিজ্ঞাসা-উত্তর :

প্রাচীন অতীত, তুমি
নামাও তোমার অর্ঘ্য: অরূপ প্রাণের জন্মভূমি,
উদয়শিখরে তার দেখো আদি জ্যোতি।

একটি জিনিস প্রাচুর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথে, দৈনন্দিনতার ভেতরে; সেটি নিশ্চয়ই বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে—লিখে চলেন মনুষ্য-বত্যয়সমূহ, কেন'র আড়ালে—ইতিহাসে-নৃতত্ত্বে, সমাজ-সভ্যতায়-রাজনীতিতে, অবনমিত-আখ্যায় (যেহেতু স্বভাবে ও পরিচর্যায় আপাদমস্তক অধ্যাত্ম-উপলক্ষ দণ্ডায়মান, অধ্যাত্মবিদই বটেন), সৃষ্টিশীলতায়—নাটকে-প্রবন্ধে-চিঠিতে-ভ্রামণিকতায় ইত্যাকার অনেক কিছুতে, এক্কেবারে নিজেকে দৈনন্দিনতায় বাঞ্ছিত করে তুলেছেন:

(ক) 'একটা কথা মনে রেখো, ফোটোগ্রাফ নয়। যা দেখেছি, যা জেনেছি, তা যতক্ষণ না মরে গিয়ে ভূত হয়, একটার সঙ্গে আর-একটা মিশে গিয়ে পাঁচটায় মিলে পঞ্চত্ব পায়, ততক্ষণ গল্পে তাদের স্থান হয় না।'

(খ) 'সাহিত্যের সেই শ্যামছায়াশীতল নিভৃত বীথিকার ভিতর দিয়ে আমার বর্তমান মোটর-চলা কলম আর কোনোদিন চলতেই পারবে না।'

(গ) 'বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে।'

(ঘ) 'মানব জীবনের সেই সুখ-দুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম ক'রে বারবার চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে, আপনার প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ নিয়ে—কখনো বা মোঘল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব-প্রকাশ নিত্য চলেছে...'

(ঙ) 'যেন একজন জীবিত মানুষ সত্যসত্যই নিজেকে মৃত বলে মনে করছে।'

(চ) 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে/ সরল জীবনে!/ এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;'

(ছ) 'ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—/ মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।।'

(জ) 'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন— ...'

www.chinnofoundation.org

(ঝ) 'এই-সব উপেক্ষিত ছবি/ জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা/ দূরের
ঘণ্টার রবে এনে দেয় বেদনা'

(ঞ) 'সেটা সত্য হোক;/ শুধু ভঙ্গি দিয়ে না ভোলায় চোখ।'

প্রভূত উচ্চারণে উপর্যুক্ত ক্ষোভ বা বিষাদ তব মানুষের তরে, আরও ঘনিষ্ঠভাবে সর্বশ্রেণির মনবতরে। এতেই তাঁর স্বপ্নও পরিস্রুত। দিকে দিকে, পলে পলে, অপার ঐতিহ্যাহৃত শক্তিতে বানিয়ে তোলেন তাঁর রসবোধ ও রপাস্বাদ। উপর্যুক্ত অংশসমূহ তাঁর নানা খণ্ডিত রেখাময় অবভাস, তাতে চিত্রিত নিজের ডাক, চিরনতূনের ডাক—বিস্ময়ের ডাক—অতঃপর আরও অতিক্রমে সব্বার আহ্বান। কোন্ সে আহ্বান—বিষাদের-ক্ষোভের-নির্মাল্যের। সেখানে ক্ষোভ-বিষাদের সংজ্ঞার্থটি অবয়ব পায়, দানা বাঁধে, সাধ্যময় হয়ে ওঠে। কারণ তার রূপ সীমা-অসীমে, রূপে-অরূপে আটকানো। পলে পলে তারই আহ্বান, আর নিরন্তর সে রূপচিত্রটি দ্বন্দ্বময় হয়ে আমাদের মাঝে পরিব্যাপ্ত হয়ে চলেছে। যে কারণে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম-সমাজ আর ব্রাহ্মণ্ডিক মর্তকে প্রত্যাশাময় করে তুললেন। প্রকৃতিতে, নিসর্গে, ভক্তিতে তীর্থের যাত্রী করে তুললেন সকলকে। গতিময়তায়—নবজাতক, জন্মদিনে সর্বার্থরূপে কামনা করতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ, বলতে থাকেন :

আমি যেথা আছি
মন যে আপন টানে তাহা হতে সত্য লয় বাছি।
যাহা নিতে নাহি পারে
তাই শূন্যময় হয়ে নিত্য ব্যাপ্ত তার চারিধারে।

কীরূপে এ আকাঙ্ক্ষার পাদপীঠটি আমাদের সম্মুখে মেলে ধরেন রবীন্দ্রনাথ? সত্যতে আরও পূণ্যবর্তী করে তোলেন এগিয়ে নেন তাবৎ কিছুকে। তুচ্ছ হয়ে ওঠে সকল চহিদাসমূহ, ভেসে যাই ওই আলোর আতিথ্যে। এ সকল পেছনে ফেলার জন্য বিনির্মিত মানবসত্তাকে বস্তুনিষ্ঠ ও পরিশুদ্ধ করে উদ্দীপ্তময় সীমাহীনতায় পৌঁছালে তাতে লোভের টান পিছিয়ে পড়ে, বাঞ্ছিতসমূহ অনিরুদ্ধতায় দারুণ হয়ে ওঠে—আপন টানে সবকিছু সত্য হয়ে ওঠে। মানবজীবনের প্রতুল রহস্যকে একপ্রকার সত্যে পৌঁছে দেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনের অকাট্য সত্যকে প্রগতি-সাপেক্ষ অপার সত্যের দার্শনিকতায় পর্যবসিত করেন। প্রতিষ্ঠা দেন জীবনবাদকে। বিবিধ দ্বন্দ্বে পেরুনোর পথ লুকানো থাকে এ সত্যে। সুখের বিপরীতে দুঃখ, জীবনের বিপরীতে মৃত্যু—পেরুনো যায় ওই প্রগতি-সত্যে আরও বিপুলভাবে জীবনসত্যে—নির্বিচারে তাতে সামগ্রিক সুখ, আনন্দময় উৎসব কায়েমি হয়ে দাঁড়ায়; রবীন্দ্রনাথ তখন সর্বকালের যোজনায় পৌঁছান, কথিত বা তথাকথিত পেরিয়ে অনন্ত উৎসাধারে অবতীর্ণ করান নিজেকে, আর বিষাদ-ক্ষোভ চলৎশক্তির প্রাঞ্জলতায় সার্বিকতার অংশ হয়ে যায়—যা ওই সত্য সাধনারই অংশমাত্র :

www.chinnofoundation.org

আমার চৈতন্যসীমা অতিক্রম করে বহুদূরে
রূপের অন্তরদেশে অপরূপপুরে।
সে আলোকে তার ঘর
যে আলো আমার অগোচর।

'পূর্ণতার সাথে ভেদ'

অনিবার্যতায় মানবসমুদ্রে প্রেম, আর তার চলার উত্তরোত্তর রথে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন উত্তর-ক্ষোভ ও বিষাদ। কেন? উপরের পাঠে যে জীবনতরীর উপমায় জীবনকে আলোকময় করতে দেখা যায় তাতে রবীন্দ্রনাথ এক সংজ্ঞার্থে দ্যোতিত, সেথায় পূর্ণতার মাঝে আছে অবশ্য-প্রেম। তার স্বরূপ-সাধনা সান্নিধ্যরহিত অপরূপ—সে প্রেম এক রূপে প্রতিশ্রুতমান। কিন্তু স্বয়ম্ভূ রবীন্দ্রনাথ আরেক পাঠে, তা ক্রমোন্নতির-সংস্কৃতিতে রূপে বাধা। ভেদ নিয়েই তার পূর্ণতা, সীমা নিয়েই সে অসীমান্ত। আর সে সীমায় ক্ষোভ-বিষাদ অনদ্যান্ত। আকুল করা প্রাণ, চিরবিরহের প্রেম, অনন্ত প্রেম, শকুন্তপ্রেম, যক্ষপ্রেম, তিলার্ধ-পরিগণিত প্রেম, কণ্টকাকীর্ণ প্রেম, দুঁহে শরীরী ইত্যাকার সব। তাতে ভেদ-বিচ্ছেদ-অপূর্ণ-অসারত্ব তিরোহিত নয় :

পথিক কালের মর্মে জেগে থাকে বিপুল বিচ্ছেদ;
পূর্ণতার সাথে ভেদ
মিটাতে সে নিত্য চলে ভবিষ্যের তোরণে তোরণে
নব নব জীবনে মরণে।

কতো স্পষ্ট, বিপুল বিচ্ছেদ অনল—আর তার পথ নব নব। 'তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে' তা বর্ণিল, মর্তের আলোতে বিভাসিত। এটিই নিত্য। তাতে নস্ট্যালজিয়া, আরতি, উন্মত্ততা, কামনা, সম্ভোগ আছে। সে ছাড়ে না তাকে, আটকায় বৃক্ষেশোভায়, আকাশলোভায়, অপরূপ মুরতিতে। নিত্যস্পন্দিত সে। আবার তাতে তার স্পর্শছোঁয়াহীন রূপও আছে, সে চন্দ্রালোক দেখে, বিশ্বময় হয়ে ওঠে এবং ওপারে মরণের তাণ্ডবও প্রত্যক্ষ করে। সুখ-শান্তি-শরীরে ছায়াকায়া ধরে কালের মর্মে পৌঁছায়, জেগে থাকে বিষাদে-বিচ্ছেদে। বলেছি, এ প্রেমের রূপ ক্রম-আবক্ষবন্দি। পুনর্বার ধেয়ে আসে রবীন্দ্রনাথে, গীতে-সুরে-কাব্যে।

তবে এসব কোনোটিই রবীন্দ্রনাথে আরোপিত নয়। প্রতিটিতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথ আহৃত সমাজ থেকে এবং ততোধিক বিধৃত সংস্কৃতি থেকে। আর সংস্কৃতির অবগাহনে বিরাজিত ক্রমমান মানুষ ও তার গ্রহণ-বর্জন কাঠামোর বিকশিত রূপ। ব্যত্যয়-বাঞ্ছিতও বিদ্যমান তাতে। ভারতবর্ষের প্রকৃতির ভেতরে, তার ঋষিরূপের আদলে আধুনিক আকাঙ্ক্ষাটিও দুর্মররূপে

www.chinnefoundation.org

ক্রিয়াশীল। সেটি নির্বিরোধী এবং গ্রহণীয়ও বটে। কিন্তু স্পষ্টত কি তা? তার রূপই বা কেমন? এখন এতে এক প্রত্যক্ষ উদাহরণ হাজির করা যায় :

সেই আমি'র গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস;
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে, সুখে দুঃখে

যৌবনবেদনারসে উচ্ছল এ 'আমি' লীলাসঙ্গিনী। যে বিবর্তিত—সমাজের ভেতরে ওইরূপে 'না'-'হ্যাঁ' হয়ে। বিষাদবাত্যাতাড়িত এ ছলনাময়ী কোমলে-কঠোরে নিকষিত, 'কবে'-'ওগো'-'ছিলে' দিয়ে সে ছলনাময়ী প্রাথমিকভাবে গঠিত, অতঃপর অভিজ্ঞতায় পরিশীলিতরূপে পুনর্গঠিত। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'মনে পড়ে গেল'-আখ্যায়। সেটি সাংস্কৃতিক প্রবাহে, অনেক প্রাচুর্য-প্রকৃতির অবগাহনে। বর্ষায়, গগনে, সন্ধ্যামেঘে, নদীকূলে, বায়ুস্রোতে, খেলাপ্রাঙ্গনে, কক্ষকোণে, নবমেঘভারে, চলচাহনিতে, ফাগুনপ্রাতে, নিশীথ-অন্ধকারের স্থানিকমায়ার রচিত। পুনরুক্তি ক্ষোভ-বিষাদের স্থানিকতায়। তার পোশাকটি এমন—এরূপ। কী বর্ণিল তার সাজ, আয়োজন। স্থনিক-অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ সাংস্কৃতিক অবয়বটি রচনা করেন, তার পূর্বপুরুষ উত্তরপুরুষ বা যে কোনো স্ট্যাটাসে। পেয়ে যান বিষাদকাতর মায়ার প্রেমিকাকে, যে অত্যুজ্জ্বল হয়ে ওঠে, পেরিয়ে যায় নব নব দিগন্ত, আমৃত্যু বাণীতে। তাতে 'বিষাদ' পেলেও ক্ষোভটি কি? 'তবু ছলিবে কি হে' বা 'দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা রচিবে অন্ধকারে?'—এতো ভেতরে আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা আরও গভীররূপে ক্ষোভ ও প্রেয়োবোধ। রবীন্দ্রনাথ দূরে ও গভীরে পৌঁছান, প্রাণে পৌঁছান—উল্লিখিত স্থানিকতা দিয়ে; তাতে ক্ষোভের প্রকৃতিটুকু চিনে নিতে হয়। বিশেষত যখন প্রেম ভেদকে অঙ্গীকৃত করে পূর্ণতার অঙ্গে সার্থক হয়ে ওঠে। আরও পরিষ্কার করা যায় ওই রঙরেখায়—'দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা রচিবে অন্ধকারে?'-এর জিজ্ঞাসায়। নিজের জিজ্ঞাসায় পূর্ণতা। আরও জিজ্ঞাসা আছে 'নীরবে লভিব তারে'। প্রেমের এ প্রকৃতরূপ বাংলা সাহিত্য-সমাজের আখ্যাপত্রে নতুন। শুধু নতুন বলে নয়, গ্রহণীয়তায় মুক্তধারার প্রত্যুষ-বাঞ্ছিত। উত্তরকালের আকাঙ্ক্ষায় পূজিত। এ কালচারটি ক্ষোভ-বিষাদের পরিমার্জনায় রঞ্জিত। সুগম্ভীর দিনান্তসঙ্গীতধ্বনিতে চঞ্চল ও উন্মনা, তাই তা সক্কলের এবং সার্বজনীন।

সার্বজনীনতায় প্রেমের আকুলতা কোনো কেন্দ্রে নয়, প্রান্তিকেও; নির্বাধ তারুণ্যে অমলিন। তাতে ছেড়ে যায় সবরকম বয়সের ভার। চিরন্তন, দিনান্তের দীক্ষা যেন। সেখানে সীমায় আবরিত অসীম, রূপে-অরূপ আরও একান্তের—বলা চলে ওই প্রকৃতি-নিসর্গ সান্নিধ্যে বন্দিত, প্রব্রজ্যাকাতর মানুষ-দেবতার অমরত্ববন্দিশ।

www.chinnofoundation.org

এক্সপান্ডেড আখ্যায় লীলাময় উর্ব্বশী অতিরিক্ত ছান্দসিক—কিন্তু সে প্রশ্নাতীত নয়, প্রশ্নবিদ্ধ—আর এরূপেই সর্বাত্মক-সাবলীল : 'এলো চুলে ব'হে এনেছ কী মোহে সেদিনের পরিমল?' বিবরণে নয় শুধু, অবগাহনে—সে সবকিছু নিয়ে সম্মুখবর্তী। এরূপে লীলা অপাঙ্গউদ্বেল বর্ণিল প্রয়াসটি উত্তুঙ্গ ও অপার হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম অপরূপময়তা পায় অরূপের ভেতরেই। অরূপের ভেতরেই তার রূপ-উত্তীর্ণ আকাঙ্ক্ষাটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ বা ক্রোধ সেখানে একটি অভিনিবেশ পায়, নির্বিচার ও নির্লিপ্ততায় আটকায়—খুঁজে পায় অকৃত্রিম সান্নিধ্য, আরও বেশি সে চিরন্তন হয়ে ওঠে, মোহময়ী বেশ মুগ্ধতা ছড়ায়, কল্যাণমূর্তি দ্যোতিত হয়ে ওঠে—সর্বোপরি তাতে পেরিয়ে যায় আক্ষেপের কার্ণিশ। পলে পলে তারও সুর-সুন্দর প্রবাহ রচিত হয়। তাইতো এক সংস্কৃতির ভেতর বিপুলায়তন রবীন্দ্রনাথ, অনেকরূপে সে সৌধপ্রতীম, সর্বনাশেও সে সর্বশেষ। লীলাময় প্রেম সে সর্বনাশেও কী কম উজ্জ্বল! অতুলনীয়তায় সে দুর্দান্ত : 'ধ্বংস করি তম/ সে বংশী আমারি চিত্ত; রন্ধ্রে তারি উঠিছে গুঞ্জরি'। চিত্তের অপূর্ব অমলেশ প্রতীতী ক্ষোভে-ক্রোধে-বিষাদে-শূন্যতায় ভরপুর। সে যেন পূর্ণতা পাওয়ার জন্যই তার অভিসন্ধি প্রকাশ করে। প্রবেশ করে অনেক অনেকান্তে, প্রশ্নে-জিজ্ঞাসায় পূর্ণাঙ্গ করে তোলে; বিবেকের এ আরোহনে প্রেম একটি সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে প্রকাশিত, আবার তা ওই চিত্তের সারাৎসার, তা-ই তাতে নিবেদিত; চিত্তেরই সংজ্ঞার্থ এতে বিদিত, এবং তা প্রকৃতির ভেতরে সত্যে বা সমাজধর্মে প্রতিষ্ঠিত—আর তার আবহটি উত্তরিত সাংস্কৃতিক-সংকেতে পর্যবসিত। ধরে নিই, একি বিক্ষোভ-বিষাদ রবীন্দ্রনাথের! আর তার প্রেম কি এরকমই। আরও সারণি নির্নয় করা যায় তাঁর সার্বিক অধ্যাত্ম প্রণোদনায়। প্রেম তার সম্পূরক বটে কিন্তু পরিব্যাপ্তি তো পরশলহরীময়। নিচের শিরোনামের ভেতরে সে পাঠটি চিনে নেওয়া যাক।

'অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা'

কোন্ বিপুল আশা? 'অন্ধকার' কোন্ সংজ্ঞার্থ? গোটা রবীন্দ্রনাথ তা অনেকভাবে স্বীকরনে নিয়েছে। তার প্রয়াস তো তাঁর বিচিত্রদর্শনে। দৃকপাত প্রাচীন কাব্যের বিধৃত প্রকৃতি, অধ্যাত্মরূপটি সে পর্যায়ে প্রখর, অতঃপর ক্রমবিকশিত, অনেককালের চর্চায় আর আমাদের অভীপ্সায়—'তার লাগি', এশ্‌ক—প্রেম। গুরুতর ও মুদিত আলোয় তা আঁধারপর্ণপুটে। এ সমাজের ভেতর থেকেই এ নীতি রচিত, বহুকাল। প্রকৃতিধ্যেয় 'আঁধার' বিকশিত, বর্ণিত; আর তা এখানে আগেই উচ্চারিত হয়েছে—অধিক আলোকিতরূপে। তবে ওই সমাজ তার ইনার স্ট্রাকচারের ক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব আত্মাকে পুনর্গঠিত করে, প্রান্ত ছুঁয়ে যায়, সূর্য-

www.chinfofoundation.org

রাত্রিদেবতা-আলো আশাকে জিইয়ে রাখে, বিষাদকে অমরতার আঁচলে বাঁধে—তুমুলভাবে, অপরিসীমরূপে। চিনে নেওয়া যায় তাঁর লেখায় :

আঁধারের সাথি, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।

রবীন্দ্রনাথ আঁধারকে করুণ করে তোলেন, কারুণ্যের মায়া দেন। গঠিত রাজার মূর্তি প্রচার করেন, রাজাকেও অন্ধকারে রাখেন, তার খোঁজ চলে বহু জায়গায়—কিন্তু মেলেনা। সুরঙ্গমা পায়নি, সুদর্শনা চিনে ফেলে—আর চিনে ফেললেই তো পাওয়া যায়, আঁধার তাতে কী গুরুতর, না-চিনে কী তোলপাড় সর্বত্রময়, কিন্তু চিনে নেয় কে?—কী অসীমান্ত তার রূপ, অবলীলায় তার আলিঙ্গন! এ অবলীলা তো সবাই বোঝে না, জানে না—জানার যে পথ তা মানে না। ফলে 'সর্বনাশ' চেনে না, ক্ষোভ বা ক্রোধের স্বরূপ তাদের হাতে ধরা দেয় না—বিষাদকেও করে তোলে বিকৃত। সমাজের বেদীতে বা সমাজদ্বন্দ্বে এটিই তো কমিটমেন্ট! কারণ এই তো প্রকৃতিধৃত রূপ—আর এরই তো প্রকাশ প্রত্যূষে—এই ব্রহ্মাণ্ডে। যে শক্তিতে আবির্ভূত সূর্য, পুনর্নির্মিত শক্তি-আধার; যা আমার পাঠ্য—চলমান জীবনের 'অপাঠ্য' পাঠ্য :

কতো যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি
বিদায়বেলায় আজিও রহিল বাকি।।

অতঃপর, অবশিষ্ট—সেটিরও অপার মীমাংসা, পেয়ে যাওয়া যায় সর্বত্র ওই নির্ণীত দর্শনে—জীবন যেখানে অনিঃশেষ, আকীর্ণময়তার লুপ্তি, পরিব্যাপ্তসঙ্কুল সাধ্যময় :

যা-কিছু পেয়েছি, যাহা-কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,

মীমাংসাটির কায়া মিলায় ছায়ায়, পূর্ণের পদপরশ পাওয়ার আশায়। এ অদ্ভুতত্ব তুমুল আশান্বিত যে জীবনের সন্ধান দেয় তার গদ্য-পদ্য দুরকম ভাষ্যই রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। নানা সময়ে তার প্রমাণও আছে। তবে এসবে রবীন্দ্রনাথ কোনো ক্ষেত্রবিশেষে আটকান না, ব্রাহ্মণ্ডিক চেতনায় একীকৃত হন—ওইমতো মানুষকে ঘিরে—তাকে কেন্দ্রে রেখে। কারণ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অর্থবহতা মনুষ্য-আখ্যানে—তাকে জীবিতের ঘোষণা করায়। সে বাঁচে, গ্রহণ করে, শুভেচ্ছায় এগিয়ে যায়, বিকিরিত হয় ব্রাহ্মণ্ডিক পরিমণ্ডলে। রবীন্দ্রনাথ সেরূপেই আবিভূত হন মানুষের মাঝে—তিনি বদলান, পরিবর্তিত হন, সম্মুখে এগোন—মানুষ অভিধায়। আর এরূপেই মর্ত্য কায়েমী হয়ে ওঠে, সত্যে বিভাসিত হয় অধ্যাত্মচিন্তারস।

www.chinnofoundation.org

রবীন্দ্রনাথে তা ক্রমাগত সৃষ্টিশীল, বিস্তৃতিময়, নানা বিতণ্ডা-বিষাদ পেরিয়ে আলোকিত অর্থে যাপিত—বায়ু-বৃষ্টি-ধূলি-মেঘ-ঝড় আর আগুন-আলো-সূর্য সর্বত্রই একরূপ উদ্‌যাপিত, সে উদ্‌যাপন নিজেকে বিস্তারিত করার, শুধু ধার্মিক বা ধর্মদণ্ডে সমর্পিত নয়, অধ্যাত্ম-আখ্যায় পরিশুদ্ধির ভেতরে নিপতিত হওয়ার, আরও গভীরে পৌঁছার, জটিলতাকে অপসৃত করে সারল্যের নির্মাল্যে পেরুনোর :

দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
দীপ্ত গগনমাঝে রে।
চমকি জাগিয়া পূর্বভুবন
রক্তবদন লাজে রে।।
ভৈরব তুমি কী বেশে এসেছ!

এতে যতোটা অধ্যাত্ম (নিশ্চয়ই তা সর্বাত্মকরূপে যে পেতে চাইবে তা পাবে) তার চেয়ে নিজের উত্তরণের, জীবনের অনুকূলে পৌঁছানোর, ক্ষোভ-বিষাদ পরিচর্যার ভেতর দিয়ে মুক্তির, মুক্ত করার, শান্তিপারাবারে চলার, এগুনোর—ভয়-দ্বিধা পেরুনোর, বেদনা ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে যাওয়ার—যেটি মানুষের নৈমিত্তিক-সংস্কৃতির ভেতরের অন্তর্দাহন তা নিজের করে নেবার। রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম হয়ে ওঠেন—তাঁর কালের জীবনাচরণে, সেটি অর্জন করেন—ঝরিয়ে দেন—মুক্তির জন্য, মুক্ত করবার জন্য—ভেতরের বা বাইরের দ্বিধাসকল কাটিয়ে ফেলবার জন্য। আর এজন্য যে কাব্যদুহিতার বা লক্ষ্মীর অনুসন্ধান তা নিজের যেমন আরাধ্য ছিল, তেমনি তা প্রত্যেকেরও, প্রত্যেককের মধ্যেই তা বিরাজমান—সেটি অবমুক্ত করেন এরূপ উপমায়, এরূপ ট্রেডিশানের ভেতর দিয়ে। তাতে যে সবকিছুই প্রথাময় তা নয়, দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে জড়তা ভেঙেছে, কেটেছে অচলাতন-সার। কিন্তু সেটি শুধু লক্ষ্য নিয়ে নিজের নয় বা অধ্যাত্ম-বায়বীয় কিছু নয়—একেবারে প্রত্যেককের, সবার এবং সর্বজাগতিক মহিমায়। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মতায় কোনো গতানুগতিকতায় বাঁধা পড়েন না, ক্রমাগত তা চর্চায়, শীলনে, আহরণে, জ্ঞাপনে উজ্জ্বলতা পায়, উদ্‌যাপনে দ্বিধাহীন হয়ে ওঠে। আর এটি বোধ করি ভারতবর্ষীয় আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের ভেতর অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এর ব্যত্যয় ছিল না কিছু। কারণ রামায়ণ, মহাভারত বা বেদ-উপনিষদে যে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয় পেয়ে উচ্চণ্ড সত্যে পৌঁছান তা কোনো বিচ্ছিন্ন কর্ষণ-আকর্ষণের বস্তু যেমন নয় তেমনি অবিচ্ছন্নরূপে সার্বজনীন বেদনে কীরূপে প্রতীকায়িত তাও বিবিধ দ্বন্দ্বে যুক্তিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তাতে পক্ষপাত নেই—বিশেষ কোনো ধর্ম-কর্ম-বর্ণ-জাতের বিভাজন নয় ('একধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে'... এক পুণ্য নামে), তাতে ওইকালের আবহাওয়ায় ঋষিমন্ত্রে পঠিত হয়, তা গৃহীত, প্রার্থিত এবং অনিবার্যতার দিকে এগিয়ে চলে—সাবলীল চেতনায়, অনিরুদ্ধ দ্যোতনায়, অবিসম্বাদিতরূপে—যা

www.chiriofoundation.org

কারো নিজের নয়—সব্বার, সর্বপ্রয়োজনের, চিরদিনের; তাইতো তার গুণ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়ার, অন্ধকার ছাড়িয়ে আলোর দিকে যাওয়ার, প্রভূতরূপে মনুষ্যকুলের প্রাণনার ইন্ধন যোগানোর—যা দিয়ে সে নিজের জগতের জীবনের সকল অর্থ করতে পারে। এই তো রবীন্দ্রনাথ! আর এরূপেই ক্ষোভ-বিষাদের আকরসমূহ সর্বার্থতা পেয়ে যায়—প্রত্যেককের ভেতর দিয়ে। আর এইটিই তো আমাদের সংস্কৃতিকে পৃথিবীর বুকে উচ্চ করে তুলেছে, রবীন্দ্রনাথ পেয়ে যায় বিশ্ব-সমর্থন, বিশ্বকবির আখ্যান। এবং উচ্চে ওঠার দায়ে বাংলা ভাষা তার সুধারসে পরিগৃহীত কাব্যবিভা, সঙ্গীতনিচয় পেয়ে যায় আধুনিকতার স্বাক্ষর। এবং সেকলও যদিও পাওয়া না-পাওয়ায় আটকায় না, তবুও দেখি নয়ন মেলে বিরাট এক অকাতর সাহস জেগে উঠেছে আমাদের তটরেখায়—সেটি রবীন্দ্রনাথ আর তার অর্জিত বিপুলায়তন সাহিত্য।

'বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি/ বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই'—এ আখ্যায় কী আছে? কেন বঙ্গ-আবহে এ কম্মে তাঁর দ্বিধা, তবে কি তার চর্চা ছিল না, তা-কি লজ্জিত পুনর্বার! তুলে এনেছেন মাতাপুত্রসংবাদ। সে আদর্শে তিনি পূর্বাপর, তাতে কেন্দ্রীভূত ন্যায়ধর্ম। যেটি আলো-উপাসনার মন্ত্র! যা মানবমাত্রই কাম্য। ধর্ম বা শ্রেণিভেদের তারতম্যে যা অসম্ভব। কোনো ন্যায়েই তার চলে না। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের যে পরিবেশে জন্মেছেন, চিনেছেন তার ভূমি-হাওয়াকে সেখানে এরূপ প্রত্যয়ের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত আধুনিক হয়ে উঠেছেন। দাঁড়িয়েছেন নিজস্বতায়, নিজস্ব-সংস্কৃতির ভেতরে। এটি তাঁকে খুঁজতে হয়েছে, উপাদানসমূহও কার্যত বানাতে হয়েছে, এ মানুষকে বানিয়ে তুলতে হয়েছে—অপার দৃষ্টিতে। উপর্যুক্ত আলোচনায় তার ক্ষেত্রটি জানিয়ে দেওয়া গেছে, কিন্তু ন্যায়কে গড়ার, তার ভেতর দিয়ে যাবার, আধুনিক হবার পথটি—তার সময়ে যে স্থান-কাল পরিসরে (বৃটিশ শাসন, অবসিত নতুন ভাবনায় বিশ্বযুদ্ধের মোকবেলা) দুরভিসন্ধির যেমন তেমনি দুর্লভ বলা যায়। বলি, 'দুর্লভ কাল'। তাতে রবীন্দ্রনাথ বীরের সদ্গতির কথা ভাবেন, বুঝিয়ে দেন, নিশ্চয় করে তোলেন, সাক্ষাৎ-সংস্কৃতির ভেতরে তার দান বলে চিহ্নিত করে ছড়িয়ে দেন। এবং এইটিই যে সমাজের কাম্য, মানবের সত্য তা সম্মুখে আনেন। উদ্‌যাপনে সমর্থ্য করে তোলেন। এবং তাতো ক্রমাগত—সবকিছুর ভেতর দিয়ে। ফলে ওই বিষাদ তাতে পূর্ণতরো, ক্ষোভের কেন্দ্রে অনিবার্য 'ন্যায়'—তা তারই নিজের এবং সকলের—সমাজের—সর্বোপরি আধুনিক সমাজের। সেখানে সেই শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতরো, শ্রেয়োবান—তাবৎ পৃথিবীকুলে।

www.chinnofoundation.org

এ প্রাসঙ্গিক চেতনায় রবীন্দ্রনাথ দাঁড়ান, আমাদের নৈমিত্তিক জীবনে, প্রত্যুষ-মধ্যাহ্নে-সায়াহ্নে, শ্বাস-প্রশ্বাসে। কী তার আকাঙ্ক্ষা-ক্ষোভ-বিনাশ-বিষাদ জেনে যাওয়া যায়, তিনি প্রতিষ্ঠা পান মনোমাঝে, এগিয়ে দেন আমাদের, ভেতর-বাহির এক করে প্রগতির পথিকৃতের আলোতে বিছিয়ে দেন সকলকে। এতে তাঁরও পূর্ণতা ও পর্যাপ্ততার পথ রচিত হয়। তিনিও ক্রমোত্তরণের পথ পেয়ে যান, হেঁটে চলেন। বলেন, যা বলেছিলেন :

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন হয়েছে ভোর।
মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে, রয়েছে ডোর।

অতঃপর এ 'নিশার স্বপন' রচনার পর পথিকৃতকে পান :

জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রুজল; প্রতি কাজে
রবে তব শুভ্রহস্ত দুটি

কীরূপে সুখদুঃখের ছলকে আপন করেন, তুলে ধরেন অন্দর-মাঝে। ক্যাজুয়াল কথনে, শুভ্রতার মায়া, শুদ্ধতার দিগন্ত উন্মোচন, অপরূপ তার উপভোগ—সেখানে 'ন্যায়' প্রশ্রয় পায়, কুণ্ঠাহীন হয়ে ওঠে, আর তাতেই সর্বাত্মক বিন্যাসটি ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথে। যেমনটি পূর্বেই বলেছি, তাঁর অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি সম্পর্কে; ভক্তির ভেতরের আয়-উন্নতি সম্পর্কে—কিন্তু এখানে তার প্রত্যক্ষতা ধরা পড়ে উপর্যুক্ত অংশে নিজের মতো করে, বেরিয়ে আসার—সম্মুখে চলবার বারতা যেন। আর ওই 'ন্যায়' তা বীরের তথা সদ্গতি কামনার বশীভূত অংশ ঘনীভূত হয় মানুষের জন্য। তিনি তাতে স্বর্গছাড়া করতে চান মনুষ্যকুলকে—স্থান দিতে চান মর্ত্যে-মাতৃক্রোড়ে। সেখানে যা নির্মল প্রাপ্য তা অতুল্য-অভাবনীয়, কিছুতেই তার নেশা মেটে না : 'যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণ, যত অভাজন,/ যত পাপীতাপী, মেলি ব্যাগ্র আলিঙ্গন/ সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়'। এ ন্যায় সত্যিই কি অতুল্য নয়! 'যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই'—এটি রবীন্দ্রন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। বলছি, তাঁর এরূপ প্রশ্রয়ে 'বিক্ষোভ ও বিষাদ'চিন্তা যাপনের কথা। তাতে তার পূর্ণতা তো এমতেই বিন্যস্ত। শুধু সুখ আর শন্তি নয়, দুঃখ-কষ্ট-বেদনায়-বিষাদে মর্ত্যের ধুলিস্পর্শে বাঁচতে চান, তাই-ই প্রকৃত বাঁচা, সকলের হয়ে বাঁচা, নিরন্তররূপে তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার মজাও তো তাই-ই। সেজন্য তাঁর ন্যায়ে যে সংস্কৃতি পুনর্বিন্যস্ত তা উপর্যুক্ত পংক্তিতে—পাপীতাপী তাতে একাকার। সর্বোপরি মানুষগুণে তা স্বীকৃত ও বন্দিত। এখানে রবীন্দ্রনাথ কতোটুকু বস্তুবাদী তা বলার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু মানবকল্যাণে কোনো উদ্‌যোগ তার মুখ্য নয়—সর্বত্র তিনি ন্যায় দিয়েই তার ধর্মকে-বিশ্বাসকে অবলোকন করেছেন। সেটি তাঁকে সর্বমানবের

www.chinnofoundation.org

মর্যাদা দিয়েছে, দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সমস্ত প্রতিকূলতার বিপরীতে। রবীন্দ্রনাথের এ দার্শনিক প্রতিজ্ঞা সীমা ছাড়িয়ে গেছে কি-না সে প্রশ্নের চেয়ে বড় পৃথিবীর সমস্ত আস্বাদকে ইন্দ্রিয় উপভোগের লালনে সমস্ত সমাজের প্রান্তে তিনি কীভাবে মিটিয়ে দিয়েছিলেন—তা সর্বান্তঃকরণে মানুষের ভেতরে পেয়ে গেল নির্বাধ প্রতিষ্ঠা। এইটিই তাঁর সবচেয়ে বড় পাওয়া।

'রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি'

এরূপে এ লেখার প্রান্তে পৌঁছালে বুঝে নিই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-প্রেম-ন্যায় আলোকে প্রতিষ্ঠিত 'বিক্ষোভ' ও 'বিষাদ' সংজ্ঞার্থ ও তার পাঠ-পরিক্রমা। চিনে নিই তাঁর দর্শনে জীবনাভিজ্ঞতায় জ্যোতির্ময় বিজয়ীবীরের আখ্যান। তিনি সমস্তরূপে নিজেকে বেঁধে ফেলেন—প্রেমে-তাপে-বিষাদে-নৈবেদ্যে—কী অপরূপ তাঁর সে নন্দন, প্রতিশ্রুতির দ্যোতনা তাঁর বিরাট—দানও বিরাট। আর সেটি কোনো ইজমে, লক্ষ্যে, বিবরণীতে নয়; আপন অন্তর হতে গড়ানো গৃহছাড়া-লক্ষ্মীছাড়া মানসমুরতি। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ অমর করেছেন তার চিন্তা-প্রতিমা, নিজে নিজেই এবং প্রত্যেককের ভেতর দিয়ে, এ ছাড়া আর কি-বা উত্তর? আজকাল সকলের কর্মকাণ্ডেও তো তিনিই—সেটি যে মর্জিতেই চলুক। বাঙালির দুর্লভ দান এ রবীন্দ্রনাথ।

www.chinnofoundation.org

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম যতোটা কবি তার চেয়ে তিনি দায়নিষ্ঠ শিল্পী। কেন বলছি? তবে তিনি কি কবি নন! তাছাড়া এ পর্যায়ের সন্দেহের অবকাশ কোথায়– যখন তিনি আমাদের জাতীয় কবি। প্রসঙ্গত বলতে চাই, নজরুলের কবিদস্তুর মন অনস্বীকার্য কিন্তু কবিতা কোথায়! 'কবিতা তো ভিনাসের মতো সমুদ্রের নীল জলরাশি থেকে জেগে ওঠে তার মৃত্যুহীন, রহস্যময় সৌন্দর্য নিয়ে, সুপ্রাচীন পৃথীবির স্তব্ধতাকে চূর্ণ করে।... তাঁদের স্বজ্ঞার ভেতর অন্তর্লীন আলো আর অন্ধকারে আভাসিত হয়ে ওঠে এক ধরনের প্রজ্ঞা যার কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই– শুধু ছায়া আছে। তবে এই ছায়ামূর্তি শুধুমাত্র মায়া নয়। এই ছায়ার অভ্যন্তরে প্রতিমূর্ত হয়ে ওঠে মানুষের কল্পনাপ্রতিমার মহোত্তম অভিব্যক্তি– যে অভিব্যক্তি আমাদের পরিচিত বাস্তবতাকে অতিক্রম করে যায়।' এমতে নজরুলের কবিতাকে প্রতিষ্ঠা করলে কী দাঁড়ায়? আরও প্রশ্ন নজরুল অন্যমনা কথক, কথাকার হিসেবে তার সাহিত্যজীবন শুরু– কিন্তু তা পরিবর্তিত হলো কোন্ রথে–যখন তাঁর গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা কম বা অনুন্নত বলা হয়, তবে তাঁর কবিতায় প্রবেশ ও প্রতিশ্রুতি কী দাঁড়াল! বিশ শতকের তৃতীয় দশক নজরুলের কবিতার কাল, কবিতা লিখে নজরুল অপার জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, পেয়ে যান, সম্বর্ধিত হন, ওই বৃটিশ-বিরোধী দামামার কালে; একজন কবি কীভাবে এক উচ্চতায় পৌঁছাতে সক্ষম হন। এসবের কারণ কি–কমিটমেন্ট দিয়ে নজরুল কী তার সাহিত্যকে সাজাতে চেয়েছিলেন! তবে তার মূল্য কি? এসব প্রশ্নসঙ্কুল পথে নজরুলকে টেনে নামানোর কারণ অখণ্ডিত ও পূর্ণাঙ্গ নজরুলকে চিনে নেওয়া, বিশেষ করে এ প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ আর ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা নজরুলকে নিজের মতো করে চালাচ্ছে, বিভিন্ন তাপে তা দিচ্ছে, নজরুল পরিণত হয়েছে ব্যবসার সামগ্রীতে, পণ্যসম প্রতারণা, নজরুল বেঁচে থাকতে যা ঘৃণা করতেন, অসম্ভব জ্ঞান করতেন, কখনো কোনো স্বার্থবুদ্ধির চাপে কিচ্ছু পরোয়া করেননি। তাহলে আজ নজরুলের এ পরিণতি কেন? সেসব যুক্তিতে পৌঁছাতে চাই ।

'গাহি সাম্যের গান', 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে', 'শির নেহারি আমারি নত-শির'– চিরপ্রচলিত এসব পংক্তি তাঁর জনপ্রিয়তার মূল, কবিখ্যাতিও এতে আছে। ব্যক্তিজীবনে নজরুল দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছেন, আর তার যুগ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন : 'আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া, সব সঙ্কীর্ণতা, সব মিথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি।' এমনটির প্রয়োজন কেন? আর সে দায় একজন কবিকে কেন নিতে হলো? কবির

www.chinnofoundation.org

যে অলৌকিক অন্তর্লীন প্রজ্ঞা সেখানে নজরুলকে কেন এমনটি করতে হয়! বিশ শতকের প্রথমেই কিশোর নজরুল আনন্দময় এক জীবন পেয়েছিলেন, যোগ দেন লেটোর দলে, লোকমন তাকে বিবাগী করে তোলে কিন্তু শিঘ্রই সে ভ্রম ভেঙে গেল 'অসম্ভবের সম্ভবের কালকে' চিনে নিলেন তিনি। বেপরোয়া-ভবঘুরে জীবনে নিজেই অনেক কিছু মীমাংসার দায় তার কাঁধে চেপে বসলো। কিন্তু প্রতিভা সবকিছু ওই অনিবার্য অনন্যতায় গ্রহণে সক্ষম, গভীরে পৌঁছে সে অন্তহীন জীবনকে নবজন্ম দেয়। ঊনপঞ্চাশ বাঙালি পল্টনেও সে প্রতিভা যেন জড়বিশ্বের অবিশ্রান্ত সংগ্রামকে গ্রহণে সক্ষম হয়। পারস্যের হাফিজ দ্বারা আক্রান্ত হন, গজল রচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়, নতুন রাগ-রাগিণীর জন্ম দেন অপার আকুলতায়। প্রতিভাধর নজরুলের এ এক পর্যায়, সেখানে সৈনিক হিসেবেই 'সওগাতে' "বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী" লিখে পাঠান; বোঝা যায় তার প্রতিভার দার্ঢ্য। সেটি কথক নজরুলের তথা কেন্দ্রীয় প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত উন্মেষ। নৈরাজ্য বা শৃঙ্খলাহীন অপূর্ণতা তাতে অনুপস্থিত। ওই পর্যায়ে এসবের সঙ্গে কার্যত নজরুলকে মেলানো যায় না। মহান শিল্পীদের কীর্তিতে যে উজ্জ্বলতম নির্দেশনাটি থাকে সেখান থেকে নজরুলকেও ব্যতিক্রম মনে হয় না। কানরাড, পিকাসো, দালি, ক্যামু, বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো তাদের নৈরাজ্যদীর্ণ অস্থিরতা আর যন্ত্রণা এমনসব শিল্পকর্মের যোগান দেয় যা বিস্ময়করভাবে পূর্ণাঙ্গ। নজরুলের ঐমতেই প্রারম্ভিক বিকাশ, এবং সেভাবেই ফেরেন তার সাহিত্যে। কিন্তু এক প্রবল দায় এসে মাথা চাপা দেয়, মুজফ্‌ফর-সান্নিধ্যে। উপনিবেশ-কাঠামোতত্ত্বে। 'দেখিয়া-শুনিয়া ক্ষেপিয়া যাওয়ার' পরিপ্রেক্ষিত। অন্যমনা-অভিমান ভেঙে পরশুরামের কুঠার হাতে নেওয়ার ব্রত। নজরুলকে বেরিয়ে পড়তে হলো, গাইতে হলো 'শেকল ভাঙার গান'। উপনিবেশ-শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে সকলকে এক করা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ঐক্য করা, সাম্যময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, মানুষকে সক্কলের উপরে স্থান দেওয়া, নিজ ধর্মের-গোত্রকুলকে বোঝানো এবং আধুনিক হওয়ার পথটির অবমুক্ত করার চেতনা ছাড়ানো– ইত্যাদি অনিবার্য কর্মকাণ্ড। তখন পত্রিকার সম্পাদক, 'লাঙল'-'নবযুগ'-'ধূমকেতু' করা আর "আনন্দময়ীর আগমনে" লিখে জেলে যাওয়া, 'our literature claims you'– কিন্তু নয়, ওই অভিমান আর অহং কবিকে পিছু হটায়নি, অনলবর্ষী করে তোলে সবকিছুতে। এরূপ দায়ে কেন তিনি পড়েন! হয়ে-ওঠা জীবনের প্রত্যয়ই কী এতে মুখ্য না নিজের ঐরূপ অমোঘ কালসচেতনতা! এরূপ প্রশ্নসাপেক্ষে একটি উদ্ধৃতি এখানে স্মরণ করতে চাই : 'নজরুলকে নির্মাণই করেছিল তাঁর দেশকাল। প্রশ্ন এই নয় যে তাঁর সৃষ্টিতে তাঁর যুগের চরিত্র ধরা পড়েছে... নজরুল যেন কালের হাতের পুতুল বা তাঁর সময়ের প্রতিবিম্ব। (হায়াৎ মামুদ : *সাহিত্য কালের মাত্রা*) শিল্প তবে

www.crimcfoundation.org

কোথায় আটকালো, কেমন তার প্রকৃতি– সে উত্তরে শুধু নজরুলের ট্র্যাজেডি বলে ছেড়ে দিলেই সব চুকেবুকে যায় না। প্রতিভার কারুণ্যে তার কী ছিল কেমন তার রূপনন্দন তা তো আমরা জানি, কিন্তু অপাপবিদ্ধ দানটি নিয়ে যতো কথা– সেটি তো তার কবিতা গ্রহণ করেনি, করার উপায় যে ছিল না, তাই *বিষের বাঁশী-দোলন চাঁপার* মগ্নতা, শরীরী কামনাঋদ্ধ যাতনা, যৌবনশোণিতে উতরোল আকুতি ভারী রকমের পংক্তিতে বিন্যস্ত হয়, তাতে নববয়েসের প্রবারণা-ছলনা-আরাধনা-উচ্ছ্বাসতুলিত হয়। আর অপরদিকে উগ্র বিদ্রোহ, বিপ্লব নয়, সংগ্রাম– সবকিছুর বিরুদ্ধে– এক অর্থে নৈরাজ্যরূপেও। 'উষার দুয়ারে হানি আঘাত', 'ভেঙে ফেল কররে লোপাট'–এসব। তবে কিছুই পরিকল্পিত নয়, অজস্রস্রোতের ভেতর থেকে উঠে আসা সীমাহীন আহ্বান। এখানে নজরুল শ্রেষ্ঠপ্রতিম, সব গ্লানি ভেতরে রেখেও হীরকোজ্জ্বল এবং আন্তর্জাতিকমানের, একত্রে তাঁর প্রেম-বিদ্রোহ, এক পরিপ্রেক্ষিতে হিসেবে আনলে, মুসলিম কবিকণ্ঠে এ কীভাবে সম্ভব : 'আমি মহাপ্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহুগ্রাস!.../ আমি উন্মন মন উদাসীর'– এটি ঐরূপ ব্যত্যয়-প্রতিভা, তবে ওপর পারের গরল-গান : 'তব মুখপানে চেয়ে আজ/ বাজ-সম বাজে মর্মে লাজ'রূপে আয়ত্তাধীন জীবন-সংবেদ। এসবে পেরুনোর পথটি আছে। সেটি সমস্ত প্রতিরোধ পেরিয়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, সুন্দরের সমাবর্তনে শমিল হয়। নজরুল 'আমার সুন্দর' আখ্যায় যা রচনা করেন তা মুক্তির-শান্তির এবং সংগ্রামের। ঘোর বেশি, সমাজঘেঁষা। বড় বেশি সব মানুষের। এখানে 'সব মানুষ' প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই জেল-জুলুম বা ক্ষেপিয়া যাওয়া, কারো না হওয়া– এসব হয়েছে। হিন্দু যেমন তাঁকে অপ্রিয় ভেবেছে, মুসলমানও তাই ভেবেছে, নারী-পুরুষ তাই ভেবেছে। তাই কারো হননি নজরুল, কারো হতে পারেননি। তবে সেটি তাঁর শিল্পীর তোয়াক্কা নয় বা জাতীয় কবি হওয়ারও তোয়াক্কা নয়, বিশ্বাসের বড়াই করাও নয়; পরিষ্কার বলে নিজের ফলপ্রসূ ও তুঙ্গস্পর্শী রূপের প্রকাশ–তা প্রতিভাজাত, সত্তাসম্ভূত ডাইনেসিয়া আবেগ। এখানে উপর্যুক্ত যে কবিতার ধাবমান রূপটি উদ্ধৃত করেছি– তা বিকল, আর সেটিই নজরুলের ট্র্যাজেডি।

অগ্নি-বীণার লেখাসমূহ মুসলমানগণের জন্য আর তাতে শিল্পহানি বা দোষদুষ্ট কথার চল আছে, নজরুলের মতো আগুয়ান প্রতিভা এরূপে ওই উত্তুঙ্গ-প্রারম্ভে উদ্ভাসিত হওয়ার কারণ কি? জাতীয়তাবাদ, জাহানে জাগানো, সত্তাকে চিনিয়ে দেওয়া, অতীত ঐতিহ্যে ফেরানো, অসাম্প্রদায়িক বিশ্বাস জাগানোর জন্য পুরাণকেন্দ্রিক খোঁজখবর দেওয়া, আধুনিক হওয়ার পথটিতে তুলে দেওয়া ইত্যাকার সব; ওই কবিতায় কাজে লাগানো। তখন তো ভারতমুক্তির তপ্তসময়, নিজ ধর্মের দায় নেওয়া, জাগানো, শেখানো কে আছে ওই মুসলমানদের! বাঙালি

www.crimefoundation.org

মুসলমানদের কথা তো আরও পরে, দুর্বলতায়, হীনতায়, অপরতায়, নিম্নমানে– কিন্তু ভাগ্য নজরুল তাঁদের কাণ্ডারী, তাঁদের লোক– তবে সবার, প্রত্যেককের, সব বর্ণ-গোত্র-ধর্মের; কিন্তু দস্তুর বাঙালি কবির, সে কারণেই মুসলমানরা তাঁকে গ্রহণ করেন– সদম্ভে, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে, যে ব্যক্তিত্ব তাদের ছিল না তা নজরুলের কারণে পেয়ে গেল, গ্রহণ করতে সক্ষম হলো, প্রকাশিতও হলো। আরও যেটি সম্পন্ন হলো, ঠুলি খুলে তাকালো আকাশে এবং একই সঙ্গে মাটিতে, অস্তিত্বে-জন্মে-নিত্যনিষ্পন্নে, চেতনায় অসাম্প্রদায়িকতাটি তৈরি হলো, ঐতো নজরুল আর তার "খেয়া-পারের তরণী" :

যাত্রিরা রাত্তিরে হতে এল খেয়া পার,
বজ্রেরী তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার?
প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে
ঝনঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে!

এরূপ উচ্চারণ শুধু নতুন বললে হয় না, ধ্বনি-তাল-লয়-সুর-ঝংকার এ কবির হাতে অভিনবত্ব পেয়ে গেল–'স্বনিল রে ঈশানে' অর্থ-তাপ আর চিত্রল দাগাঙ্কন, মনোলোভা-প্রয়োগ, মিলবিন্যাসে পৌরাণিক দ্যোতনা, এ আহ্বান প্রকৃতিসমেত, আর সে প্রকৃতি আপনার চিরপরিচিত, সঙ্গসুখে-আলিঙ্গনে অনুভাব্য আবীরময়– এতে রোম্যান্টিক রস-আর্তি বিদ্যমান, এক ধরনের প্রলয়প্রেম দুর্নিবার বলা যায়, তাতে ভর করে হবে খেয়া পার, তা নিঃশঙ্ক-নির্ভার এবং নিশ্চিত। বক্তব্যটি ছন্দেই অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে–এতে প্রতিভার আকর অংশটি চার-স্তবক করে পূর্ণ কবিতায় ধরা পড়ে, অক্ষরবৃত্ত দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে। ওই কর্মের জন্য, যা নজরুল-সময়ে মুসলমানদের দরকার ছিল এবং তিনি তা চেয়েছেনও, পেরেছেন এরূপে দিতেও। সে কারণে যে অপচয় তাঁর মেধার তা কবিতার, সে অপচয়টি বোঝা যায়, ধরা পড়ে– এমনসব অক্ষরবৃত্ত ঝকমকিয়ে উঠলে। সেসব আরও আকুলতায় পৌঁছায়, দৃঢ়তরতার উদ্রেক করে– যখন কবিতার শক্তি ও অনিবার্য অনন্যতা পেয়ে যাওয়া যায়, এমতে বলি– কবিতা যদি মানব চৈতন্যের সাথে জড়বিশ্বের অবিশ্রান্ত সংগ্রাম হয় তাহলে উপর্যুক্ত পংক্তিতে তার ক্ষেত্র বা দায়টি কীরূপে পর্যবসিত হয়। মনে পড়ে, কোলরিজ বা হোমার-আখ্যান, যেখানে যাত্রী বা ভ্রমণের ঐতিহ্যটি আলোহারা সমুদ্রের সোমরসে আত্তীকৃত। সেটি তো এক রকমের বিলোড়ন, কার বা কীসের– আত্মার, দেবতা-দর্শিত আত্মার, তাহলে এ তরণী শুধু এ কালের নয়, প্রতিভারঞ্জিত অচ্ছেদ্য-অজস্রতার। তবে নজরুল যে জন্মলগ্নের ট্র্যাজেডি তা আকণ্ঠ-নীলে ধারণ করেছেন, আর উপযোগেও হারেননি– বিশেষত কূলহারা মুসলমানদের নিশানা দিতে। বলে চলেছেন, 'কামাল', খালেদ'–গর্জনে। জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় ওই তুরস্ক, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে সফল বীর

www.chinnofoundation.org

ও বরপুত্রদের তুলে আনেন, শানিয়ে তোলেন। এলোমেলো কবিতা যাই হোক 'কামাল তু নে কামাল কিয়া ভাই' কিংবা 'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া' লিখে মুসলমানদের প্রাণে নিজের প্রতিজ্ঞাকে জানান দেন, মুসলমানকুলকে ব্যক্তিত্বের বলীয়ানে ফেরান। এক ধরনের আখ্যান ঢংয়ে নাট্যক্রিয়ার রূপটি প্রকাশ করেন– যাতে তা সর্বদিকে পৌঁছায়। সবকিছু আত্মপরিচয়ের নিমিত্তে। আর আধুনিক স্বরটি চিনিয়ে দেওয়ার অনুপ্রেরণায় তিনি আচরণীয় হয়ে ওঠেন– তাঁর লেখায়। আর "বিদ্রোহী"তে তা প্রভূত প্রাচুর্যে বিদ্যমান। সে পাঠ আরও অনিরুদ্ধ, অনির্বাণ। বিশ শতকের প্রথমপাদের উপযোগের বাইরে একে উপভোগের এক অবিরাম ব্যাপার নিহিত আছে। সেটিও ওই প্রেক্ষাপটে, অধ্বনিন বিশ্বের আহত কল্পনায়-অন্তর্লীন দ্যোতনায় আরও ব্যাপক করে বললে শুন্যতার অর্থময়তায়। যেখানে নজরুল উচ্চারণ করেন তীক্ষ্ণধী কণ্ঠে, ললিতলোভনকান্তিতে, একস্বরে-একসময়ে-অখণ্ডতায় সেখানে তাঁর ঐরূপ প্রতিভা থাকে অনস্বীকার্য। যদিও উপযোগ বা অনন্যতার আদিখ্যেতায় এখনও তিনি কূলপ্লাবী তবুও জেনে যাওয়া যায় এ প্রতিভার সমাপ্তিহীন যুদ্ধসংবাদ– আর সেটি কোনো স্থান-কাল পরিসরে পরিব্যাপ্ত নয়, একেবারে সমস্ত দূরত্বমোচনকারী এক উর্ধ্বলোকসংবাদ :

মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন আমি ধ্বংস
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর!
আমি দুর্বার,

এতে কোন্ প্রস্তাবনা আছে! কী তার কর্মবিধান, কোথায় তার স্থাপন। তার চেয়েও আরও আপাতবিচ্ছিন্ন স্বপ্নকল্পনা নয় কি এটি?– যা একটি বিশাল ও অপ্রত্যাশিত রকমের নবতর অর্থ দান করছে; নক্ষত্রলোকের অসীমতায় সে কি-না অনিঃশেষ প্রাচুর্যপূর্ণ এবং দূর-দীপিত। 'আমি' অনেক মাত্রায়, অনেক উপাত্তে জারিত। তার পরত অনেকময়–মহাবিশ্বসম বা তারও অধিক, অনন্ত শূন্যতার। আর তাই 'অভিশাপ' (পৌরাণিকভাবে অবলুপ্তির ভেতরে পরিশুদ্ধি) আর পৃথ্বী তো পার্থিবময়, এরপর সবচেয়ে বড় এতে 'আমি'র কেন্দ্রীকরণ, যেখানে কবি সবকিছু ছাড়িয়ে পদার্থময়-অজর-অক্ষর। কবিপ্রতিভা এখানে শব্দাবলীর ভেতরে দ্বান্দ্বিক দ্যোতনায়– অনিঃশেষ সংগ্রামের আলোয় সঞ্জীবিত করে। পূর্ণতাও তৈরি হয় সে কাঠামোর ভেতরেই। এভাবে নজরুলকে উন্মোচনে আনা যৌক্তিক এবং অবশ্যম্ভাবী, সেখানে তাঁর শিল্পের দায়টি ভিন্নভাবে চিহ্নিত হতে পারে।

কিন্তু এমনটিও সত্য, প্রতিভার ঝলকানি তো কিছু ক্ষেত্রে, জীবদ্দশায় রচিত অন্য কর্মের– সেখানে দুর্বল দিকসমূহ কেন! গদ্যকারের বৈফল্যে মেলে তাঁর অনভিজ্ঞতা, কবিতা পদ্যময় অসংযমি- আর শ্লোগান-রাজনীতির দাবি, প্রেমে অভিমানের আধিক্য আর পুনর্বার আত্মবিবরণী তুলে ধরা (আপাতত গানের কথা

www.chhotofoundation.org

বলছি না, তার আলোচনা অন্যত্র)– এতে তাঁর শিল্প ব্যর্থ; আর তাই তাঁর ট্র্যাজেডি। প্রতিভা-বেপথু, হারানো, দৃষ্টিহীনতা। এমনটি তাঁর সমগ্র রচনাবলী অবলম্বনে কী প্রামাণিকতায় নির্ণেয় হতে পারে! উত্তর–এ তাবৎ সময়ের প্রত্যেকের লেখনীতে, নিন্দা-প্রশংসার অক্ষরে বিভূষিত। নজরুল লেখেন : 'আমার সুন্দর প্রথমে এলেন ছোট-গল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে।' সুন্দর তার উদ্দেশ্য, কবির উদ্দেশ্য, তার প্রমাণ উপর্যুক্ত কবিতা-বিশ্লেষণে একপ্রকার বিশ্বস্ততায় মিলেছে। কিন্তু চেতন-অবচেতন সত্তায় নজরুল কী করতে পেরেছেন! প্রেমকে সত্য-শিব-সুন্দর মনে তো করেছেন, প্রেমই তো মুখ্য, আত্মদানই তো তার বীক্ষা। কিন্তু তার উপকরণ-উপাদান-বাইরের বাস্তবতা তা বঞ্চিত না করে বাঞ্ছিত করাই দরকার। সে তো কথাকারের কাজ, আর তার জন্ম-বাস্তবতা কী– ব্যক্তি, তার মুক্তি, তাকে এগিয়ে দেওয়া, সমাজ পরিপূরকরূপে প্রতিষ্ঠা করা– তবেই তো দ্বান্দ্বিক কিছু দার্শনিকতা পারে, রুশ-সাহিত্যে কথাকারের দ্বন্দ্ব কী– সেখানে *মৃত্যুক্ষুধা* অল্পমাত্রায় পেলেও ব্যাতিরেকে আর কি! আর গল্পে তো বিরহের-অভিমানীর গলগ্রহকথা। তখন নজরুল তো নক্‌শা কাটেন, তাঁর নিজের প্রতিকৃতি আঁকেন, জীবনের আলো-অন্ধকারের স্বরূপ আত্মদহনকথায় আনেন, তা আবেগ-আরোপিত, নিজস্ব যন্ত্রণামথিত, দণ্ডিত। কিছু তুলে ধরা যাক : সে হলো আজ তিন বছরের কথা। আমার এই খাপ-ছাড়া জীবনে তার স্মৃতিগুলো ঝড়ের মুখে পদ্মবনের মতো ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেছে! কখনও তার একটি কথা মনে পড়ে, কখনও আধখানি ছোঁওয়া আমার দাগা-পাওয়া বুকে জাগে। মানস-বনের জুঁই কুঁড়ি আমার ফুটতে গিয়ে ফুটতে পায় না, শিউলির বোঁটা শিথিল হয়ে যায়! ওরই সাথে এই শাঙন ঘন দেয়া গরজনে আর একদিনের অমনি মেঘের ডাক মনে পড়ে, আর আঁখি আমার আপনি জলে ভরে ওঠে।

এতে কী আছে! নিজের বেদনাবহ ভাবনার কথা, তবে অনেকখানি কাব্যময়– আবেগের মাত্রায় অসীমতা, দুর্বল অতেশয়োক্তি। এসবের কারণ, অভিজ্ঞতার শূন্যতা আর উদ্বেল বিরহের করুণ মায়া। পরিচ্ছন্ন নয়, পরিতাপ তাতে আছে যেমনটা। "অতৃপ্ত কামনা"য় আমারই বেদনা মুখরিত। লুপ্ত স্মৃতিতাপ, এক রকমের বিজনভূমের বিয়োগরূপ। চিত্তে তাঁর অপপ্রশস্তির আচ্ছন্নতা ছিল, দ্রারিদ্র্যের গ্লানি– তাঁকে এতো কষ্ট দিয়েছে, শিল্পিত মনকে তা হেনস্থা করেছে– সর্বদিকপ্লাবী করে তুলেছে। তবে "পদ্মগোখ্‌রা" আলাদা, টোটেম-টাবুর মৃত্তিকা ঘর্ষণ তাতে আছে, আর *মৃত্যুক্ষুধা* তো তাঁরই প্রতিফলিত জীবনস্মৃতি– ব্যাপ্তি তার আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী। এভাবে নজরুল পৌঁছান এক্কেবারে জীবনের কন্দরে, তৎপরতা তাঁর বিচিত্রমুখী। নিছক সব শিল্পীরই যেমনটি থাকে তেমন, কিন্তু যেহেতু প্রতিভাবঞ্চিত নন তিনি সেহেতু তারতম্যে, মাত্রায় অনেকবার উজ্জ্বল,

www.chinnofoundation.org

একাধিকবার প্রজ্বলিত– নিজস্ব নিশানায়। একেবারে জীবনকথায় তুড়ি যেন তার কথাসাহিত্য, এর বাইরে পৌঁছেনি কিছু, বোধ করি সমাজবাস্তবতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তিনি পাননি। সমাজ রূপান্তর-পরিবর্তন, আর্থনীতিক দিক, উৎপাদন-সম্পর্ক, ব্যসন-বিলাস, শ্রেণিসৃষ্টি তা প্রতিভাকে হানা দেয়– স্ববিরোধীতায়, অগোছালো অপচয়ে; নজরুলেও তা বিন্যস্ত সে কারণেই অবারিত-উন্মুক্ত তাঁর গদ্যবিভা, প্রয়োজনে বেরিয়ে পড়ে কীসব উপমা, চিত্রল ছায়াপাত, সন্নিবেশিত সভ্যতা হুংকার; কিন্তু কাঠামো পায় না– তাতে পদাঘাত লৌকিক জীবনের টানাপড়েন, কষ্ট-দারিদ্র্য-অভিমান অপচিত সবকিছু। বাঁচার অর্থেই তিনি যেন অকেজো হয়ে গেছেন। সেসব পেরুতে গিয়ে উতাল হাওয়ায় বেভুলো হয়ে যান, দমন-পীড়নে পড়েন। অর্থ হারিয়ে ফেলেন। এসব ভেতরে বহন করলে ওই প্রতিভার রঙ তখন ম্যাড়মেড়ে, বিবর্ণ অনেকটা। তাতে প্রকৃতির সমর্থিত রূপ ছায়াপাত করে না, হু-হু করা প্রকৃতি শিল্পে অসমর্থিত হয়ে আসে, উপমা ও উপমানচিত্র নিরর্থক পর্যবসিত হয়। এভাবে নজরুল তার কাব্যেরও অনেক জায়গায় আঘাতপ্রাপ্ত হন, অহেতুসম্ভব করে তোলেন। কিন্তু অদরকার তাঁর জন্য কিছুই ছিল না। জীবনকে বিকল করতে চাননি তিনি। ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিভাই তাকে এগিয়ে নিয়েছে, টেনে নিয়ে সমাজের ওইসব ভারকে অন্তর্কথনসুতোয় গেঁথে তুলেছে। একটুও তাতে ক্ষুৎ নেই। সেজন্যই নজরুলকে কেউ সাম্যবাদী বানান, মানবতার কবি বানান, কেউবা যুগের নন হুজুগের কবি বলেন এবং যুগের কবিও বলেন– সমসাময়িক বলে তাঁর লেখাকে আখ্যা দেন। এসবের কারণ নিশ্চয়ই ওই সমাজভিত্তিটি। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে তাঁর চক্ষের সম্মুখেই যেটি ঘটেছে। কিন্তু লুকাননি, কৌশল নেননি, জয়-পরাজয় ভাবেননি– সরাসরি দাঁড়িয়ে যান, নির্মোহ সত্যে এক অনিবার্যতায়। আর তার রেশ-প্রভা এতোই বেশি যে ১৯৪২র পর তাকে নিয়ে রাষ্ট্র-রাজনীতির কম কিছু আমরা দেখিনি। এক্কেবারে এক ফৌজি শাসক-কর্তৃক উদ্দেশ্যপ্রবণ কায়দায় তাঁকে প্রয়োজনের অনুকূল করে তুলতে এতোটুকু কসুর করেননি। তাহলে যেটি সত্য, বিরল প্রতিভা ওই এদেশীয় সমাজ প্রস্তাবনাটি যথারীতি ধারণ করেছিল। এ আলোচনার প্রথমেই যে ঊর্ধ্বকমাচিহ্নিত পংক্তি বসিয়েছি তা এতো জনপ্রিয় কেন! নির্বিশেষে তা গ্রহণের অর্থ কি– কেন নজরুল সববয়েসীদের পাঠ্য হন– হতে পারেন, ওই সমাজদস্তুর। ওই আকুল, রণ-আহ্বান, যেভাবে এক দৃষ্টিতে মুসলমান, সেভাবেই সক্কলেই, ঐক্যবদ্ধভাবে– আবালবৃদ্ধবণিতা। আর তা সেকাল-একাল নয়, সর্বকালে, এজন্য বাকরুদ্ধ নজরুলও কম পীড়নে পড়েননি।

তাহলে গল্পে-কবিতায় অসমর্থিত প্রকৃতির ছায়াপাত হলেও দেখা যায় সমাজভিত্তির ক্ষেত্রে ওই 'অসমর্থন-শিল্প' কীরূপে ততোধিক সারল্যগুণে পৌঁছেছে

www.chinnofoundation.org

মানুষের কাছাকাছি। প্রতিভা-রণনে নজরুল হয়ে উঠেছেন অন্যরকম– নির্বিবাদী, সরল ও যৌক্তিক। নির্বিবাদ– সেটি যৌক্তিক চাওয়া, কিন্তু না পেলে বিবাদী। বিবাদগ্রস্তই ভেবেছিল বৃটিশ সরকার বা সারাক্ষণ সব স্বার্থান্বেষী, মোল্লা-পুরুত, ফতোয়াবাজরা। নজরুলের প্রতিভা কমিটমেন্টে পৌঁছেছিল। যেটুকু শিল্প, তার চেয়ে বেশি কমিটমেন্ট। সেটি প্রবল প্রতাপঋদ্ধ। কবিতা-গল্পে বেশুমার সব লেখনীতে তার অবস্থান নিজের মতো কিন্তু জীবনের ভেতর থেকে পাওয়া দায়বোধ সেটি ব্যবহৃত হলো। এমন তাপ আর তার সাংগঠনিক শক্তি এতো ব্যাপক তা আলোকিত যেমন করলো অনেককে তেমনি ব্যক্তি ছাড়িয়ে রাষ্ট্রশক্তি তা প্রয়োজনমাফিক ব্যবহারে সম্মত হলো। জানা যায়, সাতচল্লিশ-পর্যন্ত নজরুল ব্যাধিগ্রস্ত, গঠিত তাঁর জন্য 'নিরাময় সমিতি', কিন্তু কাজ হয়নি। অনাদর-অবহেলা বোধ করি জীবনে আবার ফিরে এলো। নতুন রাষ্ট্রের ডামাডোলে অযত্নেই থাকেন নজরুল কিন্তু প্রয়োজন পড়ে পাকিস্তানে, সেজন্য বাকরুদ্ধ নজরুলের রচনার অবাঞ্ছিত অংশের দায়িত্ব নেন গোলাম মোস্তফা। তাঁকে মুসলমান বানানো চেষ্টা করেন, পাকিস্তানের কবি বানানোর চেষ্টা করেন। এ দরকারে তাঁর সাহিত্য সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে। নজরুল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হন। খণ্ডিত করার চেষ্টা চলে। নজরুল সুস্থকালে কোনো সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র সমর্থন করেননি। সেরকম রাষ্ট্রচিন্তাকে তিনি অস্বীকার করেছেন। অথচ, তাঁর স্বভাবের প্রতিভাবৈশিষ্ট্যের বাইরে তাঁকে অপপ্রয়োগের চেষ্টা করেছে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ। কেন? নিশ্চয়ই ওই প্রতিভার বা দায়বোধের অমিত দীপ্তির কারণে। শুধু পাকিস্তানেই কেন, স্বাধীন বাংলাদেশেও তা তো কম হয়নি। এসবের কারণ কি? নজরুল মুসলমানদের আধুনিক বানাতে চেয়েছিলেন, মুসলিম স্বাতন্ত্র্যধর্মী চিন্তা থেকে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন, মুসলমানদের নিজস্ব পুরাণে-ঐতিহ্যে ফেরাতে চেয়েছিলেন– এটিই কি কারণ! বিশ শতকের বাঙালি সমাজে নজরুল অসাধ্য সাধন করেছিলেন, বাঙালি মুসলমানদের কবিতা দিয়ে জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত করেছিলেন, প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা কবিতায় এনে এর ভেতরে সৌকর্য বাড়িয়ে দিয়েছিলেন– বাঙালি মুসলমানের সমাজে তিনি বরপুত্র হয়ে এসেছিলেন– সেটিই কি তাঁর জন্য বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়! তা আসলে নয়, যে স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে তিনি নিঃশঙ্ক ছিলেন, তাঁরাই পরবর্তীতে তাঁকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। তাঁর সাহিত্যের চেয়ে তাঁকে পুঁজি করাই মূল লক্ষ্য। এসব শিল্পী নজরুল বিষয়ক আলোচনা-আখ্যান নয়, কিন্তু নজরুলের সাহিত্যের দায়বদ্ধতা এবং আজকের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল বা তাঁর উপযোগিতার মাত্রা নিয়ে এসব প্রসঙ্গ যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠে। আর স্বভাবজাত প্রতিভার বৈশিষ্ট্যেই নজরুল স্বকীয় এবং অখণ্ড– সেখানে

www.chinnofoundation.org

কোনোকিছুই তাঁকে আড়াল করতে পারবে না, যতোই সে অপচেষ্টা চলবে ততোই তিনি হীরকদীপ্তিতুল্য হয়ে উঠবেন। এর আর ব্যত্যয় কি!

'কোনো কোনো ক্ষমতাশালী লেখকের প্রতিভায় কী একটি গ্রহদোষে অসম্পূর্ণতার অভিশাপ থাকিয়া যায়; তাঁহারা অনেক লিখিলেও মনে হয় তাঁহাদের সব লেখা শেষ হয় নাই। তাঁহাদের প্রতিভাকে আমরা সুসংলগ্ন আকারবদ্ধভাবে পাই না; বুঝিতে পারি তাহার মধ্যে বৃহত্ত্বের মহত্ত্বের অনেক উপাদান ছিল, কেবল সেই সংযোজনা ছিল না যাহার প্রভাবে সে আপনাকে সর্বসাধারণের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে প্রকাশ ও প্রমাণ করিত পারে। (রবীন্দ্রনাথ) নজরুলে কি 'গ্রহদোষে অসম্পূর্ণতা' ছিল? নজরুল প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন কি? পূর্ণাঙ্গরূপে পারেননি। কারণ, তাঁর ব্যক্তিজীবন এবং তৎসংলগ্ন বিশ শতকের প্রথম পাদের আর্থ-সমাজ-রাজনীতির বাস্তবতা। পৌনপুণিকভাবে তাঁকে ম্লান আর কষ্টে কাটাতে হয়েছে, দারিদ্র্য তাঁর কাছে মহান হলেও সেখানে তিনি অনেকাংশে অসহায়ই ছিলেন। প্রতিভা সেখানে অপ্রতিষ্ঠিত বা বাধাগ্রস্ত হতে পারে, আর যেমনটি আগেই উল্লেখ হয়েছে, নজরুল জন্মকালেই এক পরাধীন পৃথিবীর অবলোকন। জীবনতাড়িত জীবনে নজরুল আর পরাধীন জীবন চাননি, করতে চাননি নিজেকে সেখানে সমর্পন। সেজন্য আর আকারবদ্ধরূপে থাকেন না তিনি। লেখালেখির জগতেও চরম বিশৃঙ্খল সময় অতিক্রান্ত হয় তাঁর। সেটি কবিস্বভাবে পরিণত হয়– আর তাঁর জয়-পরাজয় যাই বলি তা তার মধ্যেই নিহিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলি : 'প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না।' সেসবে নজরুলের তোয়াক্কাও ছিল না। আগেই উল্লেখ আছে, প্রতিভার 'গ্রহদোষে অসম্পূর্ণতা' যেমনই হোক, নজরুল এক উন্মুক্ত, শোষণহীন, নিরুপদ্রুপ সমাজ চেয়েছিলেন: শুধু শাসকের বদল নয়, ব্যবস্থার বদল– সেটির সাপেক্ষে তাঁর সমস্ত লেখালেখি বিসর্জিত হলে– সে কমিটমেন্টের ক্ষেত্রটুকু কোন্ গৃহিণীপনায় আটকায় বা কী পেল না পেল তা মুখ্য নয়, বা মুখ্যও থাকেনি। তিনি হয়তো মহানরূপে প্রতিপন্ন হননি কিন্তু মহৎপ্রাণে পরিণত হন– সর্বকালের– সবার জন্যে। এটিই নজরুলের প্রতিভার স্বীকৃতি। নজরুলের শিল্পসত্তাও সে মাপেই বিচার্য। সমস্ত নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে তিনি সে ভাবেই প্রতিষ্ঠিত।

নজরুলের মহৎ শিল্পচেতনার একটি বিরাট পর্যায় তাঁর গানের জগত। গানকে তাঁর কাব্যসত্তারই একটি উন্নত ও পরিপক্ব ক্ষেত্র বলেই মনে হয়। বিশ শতকের চতুর্থ দশকে তাঁর গানের ক্ষেত্রটি চিহ্নিত, অপরূপ বাণীসুষমায় গানের জগতকে আলোকিত করেন তিনি। পৌঁছান প্রকৃত প্রতিভা শিখরে, তবে মান্য এজন্য তাঁর কোনো গৃহিণীপনা ছিল না, তোয়াক্কাও করেননি এতাটুকু, কিন্তু উদ্দামতার স্থিতিতে পৌঁছেছিলেন তিনি। এক্ষেত্রে নজরুলের সবচেয়ে বড় সাফল্য

www.chinofoundation.org

গজলগান রচনা। যেটি তাঁর পূর্বে ছিল অনায়ত্ত। ব্যক্তিজীবনের প্রাথমিক স্থিতিও বোধ করি চারের দশকের প্রথমার্থে ছিল, যদিও পুত্র বুলবুলের মৃত্যু তাঁকে মুষড়ে ফেলে– 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়... '– অপূর্ব হয়ে ওঠে। সবসময়ই তাঁর প্রতিভার 'গ্রহদোষে অসম্পূর্ণতা' ছিল। অপরিকল্পিত শিল্পকে এবার জীবিকার উপকরণ করেন, অর্থ উপার্জনে, চলচ্চিত্রে গান রচনায়, এমনকি অভিনয়ও বাদ দেননি। এক সময় আর্থিক স্বচ্ছলতাও আসে, কিন্তু প্রমীলার অসুস্থতা তাঁকে আবার বেপথু করে। তিনি সন্ন্যাসধর্ম নেন। বিশৃঙ্খলতার ভেতরেই তাঁর জীবন কাটতে থাকে। এক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু আর তার পরে নিজেই বাকরুদ্ধ, 'আমার সুন্দর এসেছিল গানে'–তাও স্তব্ধ হয়ে যায়। 'প্রভাতের ভৈরবী-সুর-সিক্ত শীতল বায়ু-হা হা স্বরে যেন তারই না-পাওয়ার নিরাশা-ক্লান্তি আর পাবার আশায় আনন্দ ব্যক্ত করে। যামিনীর যেমন এ-প্রতীক্ষার অন্ত নেই, আমারও তেমনি এ পথ-চলার আর শেষ নেই।'– এসব আহ্বান-আকুতিই তাঁর চিরস্বভাব, কিন্তু উপস্থাপন হয়েছে বিচিত্র মাধ্যমে– কখনো গানে, কবিতায়, কথাসাহিত্যে। সে 'সুন্দর'ই তাঁর পছন্দের প্রেয়সী, কিন্তু তা মরীচিকার মতো। একে একে রঙ বদলায় কিন্তু তা কেন্দ্রে একই। এখন প্রতিভা বা মেধা যাই বলি, সেটিই তার মধ্যে বিরাজমান। এবং সেরূপেই তা আমাদের নিকট গ্রহণীয়।

নজরুলের সাহিত্য দায় বিষয়ে বিস্তর আলোচনার সুযোগ থাকলেও এখানে চৌম্বক কিছু দিক স্পর্শ করা গেছে। নজরুল প্রতিভা আমাদের সাহিত্যে এক নতুন বীক্ষেপ। তার রঙ ও রেখা নানা তলে বিভূষিত। সেটি গ্রহণের আস্বাদ অতুল্য, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর ট্র্যাজেডিটুকু আমলে আনা সঙ্গত। কীরূপে তিনি বেপরোয়া হয়ে পড়েন, বিশৃঙ্খল মনে করেন, সুন্দরের জন্য প্রত্যয় ঘোষণা করেন– সে চিন্তার ভেতরেই তাঁর ট্র্যাজেডি-মূল্য নিহিত। যদি তাঁর কথায় 'অসম্ভবের সম্ভবের কালে' না জন্মাতেন তিনি তবে নিশ্চয়ই অন্য নজরুল আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হতো। সমস্ত বিভেদের বাইরে তিনি যে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিলেন তার গড়নের দায়িত্বও তাঁকে হয়তো নিতে হতো না। আর এমন বহির্মুখি অস্থির বিহ্বল চরিত্রের জন্য আর যাই হোক কবিতা অপেক্ষা করে না। 'পদার্থময়', 'অক্ষর' কবিতা কাজী নজরুলের স্বভাব-বিরুদ্ধ– আর সে প্রকরণটি তাঁর জীবনের বেড়ে ওঠার অনিশ্চয়তায়, ভরপুর। সে কারণেই যতো আশা আর উপভোগের ইচ্ছা নজরুলে পোষণ করি– তা তাঁর জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই। শিবনারায়ণ রায়ের ভাষায়, 'যা পেয়েছি তাই বা কম কিসে'। শোষণ-নিপীড়ন-বিপর্যয়ের বিপরীতে প্রেরণাদাত্রী কবি হিসেবে নজরুল শিল্প প্রত্যেককে আনন্দ দেবে। প্রতিনিয়ত-পুনরায় সত্য ও ন্যায়ের স্বপক্ষে উদ্বুদ্ধ করবে– সেখানে তাঁর কবিতা বা

www.chinnofoundation.org

অন্যান্য রচনা যে মাপেই আলোচিত হোক। নিঃশর্ত দায়বোধের জন্য, শ্রেয়বোধের জন্য তিনি চর্চিত হবেন নিরন্তর। আর পাবেন চির-মানবের প্রার্থিত স্বীকৃতি।

www.chinnofoundation.org

নজরুলের কবিতার প্রত্যয়

'বল বীর'—প্রত্যয়টি বাংলা কবিতার জন্য ওইকালে বেশ বিস্ময়। 'সমর্পন', 'নতজানু', 'বিলীন হওয়া', 'সপে দেওয়া', 'না-বলা মন' নিয়ে কবিতা পেরুচ্ছিল। কেমন তার রূপ-স্বভাব, কীভাবে তা প্রকৃতি ও জীবনকে অনুভব করে, অনুরাগী আভা দেয়—তা আধুনিক-পূর্ব ও পরে রবীন্দ্র-বলয় পর্যন্ত দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্র-বলয়ের কবি। কিন্তু তিনি পৃথক মাত্রার। কেন? কোন্ কারণে? প্রশ্নটির উত্তর অনেকভাবে দেওয়া যায়, হয়তো তা নতুনও নয়—কিন্তু প্রয়োজনটা যেন ফুরোচ্ছেনা। ফুরোয় না। উপর্যুক্ত স্বভাবসমূহ নজরুলে নেই, কিছুতেই সেটি নজরুল স্বভাব অনুগামী নয়। তীব্র, তীক্ষ্ণ, অনুভাব্য স্বভাবী নজরুল কিছুতেই সমর্পিত মনের ছিলেন না। দারিদ্র্যকে 'মহান' বলেন, কবি যেন যত কামারের, নারী-পুরুষের-হিন্দু-মুসলমানের সবার। সবার হয়েই বিদ্রোহ, কূলছাপানো বিদ্রোহ, অপ্রতিরোধ্য বিদ্রোহ। দ্রোহ মনে, মননে—বৃটিশ রাজশাসকের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে, সমাজ-প্রতীভূদের বিরুদ্ধে। মেনে নেননি অমানবতার কোনো কিছু। রক্তে-মাংসে মানবিক। নজরুলের মানবিক রূপটি অন্যকালের, তাঁর পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে প্রভূতরূপে আলাদা। সেটির প্রত্যক্ষরূপ শুধু উজ্জ্বল বললেই শেষ হয় না, 'চিরপদার্থময়' ও উত্তর-প্রজন্মের বার্তাবাহী। মানবিকতার এ স্বরূপ-আখ্যান দুর্বিনীত। অসাধ্য পেরিয়ে যাবার দুর্বিনীত প্রেরণা। সেটি তাঁর কবিতায় প্রত্যয়দীপ্ত। কবিতাই হয়ে উঠেছে সে লক্ষ্যের অস্ত্র। কথাগুলো গৎবাধা, পুনরুক্তিদোষদুষ্ট হলেও এর স্ফুলিঙ্গ যে বহুবিকিরিত, কখনোও তা কোথাও আটকায় না বরঞ্চ অন্তর্নিহিত শক্তিকে একত্রিত করে, ছড়িয়ে দেয়—তা প্রত্যেককের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শিহরিত করে, এগিয়ে দেয়, উপায়হীনের উপায়রূপে গণ্য হয়, অসহায়ের সহায় বা অগতির গতি হয়—সেটি কে অস্বীকার করবে! এভাবে 'বল বীর' উচ্চারণটি পেতে চাই, নিকটস্থ করতে চাই, বিবিধ ব্যবচ্ছেদে আয়ত্ত করতে চাই। আর তার পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল-কবিতার একচ্ছত্রতা যাচাই করে দেখে নিই—একালের এখনকার বিনাশী মূল্যবোধের ভেতরে, আমাদের সামগ্রিক প্রয়োজনের বা তার ভেতরেই নন্দনবোধের ধারণাটি বা পরিচর্যার প্রয়াসটি সাক্ষাৎ জেনে নিতে।

www.chinnofoundation.org

২.

কবিতার কেন্দ্রে ব্যক্তি-সমাজ-সভ্যতার বিষয়টি আছে। যে 'অ-দায়' মনে করি মধ্যযুগের সাহিত্যের তথা কবিতার, তাও সে ওই মানের সমাজচিন্তার প্রতিফল। আবার একইভাবে নজরুলের কবিতাকে যেখানে দেখতে চাই তাও দায়বদ্ধ জীবনচেতনার একই চিত্রার্পণ। এ থেকে চ্যুত বা বিচ্যুত কিছু করা নয়, জীবনভাবনার বিবর্তিত ও বিকশিত রূপটি বা আরও স্পষ্ট করে বললে দ্বন্দ্বাত্মক উৎসারণটি জেনে নেওয়া যায়। আর তখন তার অনুগামী হয়ে ভবিষ্যতকে চেনা সম্ভব। এক্ষেত্রে নজরুলেই ব্যাপকত্ব, বিশেষভাবে দ্রুতলয়ের ধাবমান ধ্বনিতে তা বিদ্যমান। যে লয় তা-ও তো তাঁর কাজ—সেখানেও তিনি অবধারিতভাবে নতুন। কীভাবে? সে প্রশ্নে পৌঁছানো যায় তাঁর উক্তিতে, ভেতরের কমিটমেন্টে : 'ঐ শোনো নবযুগের অগ্নিশিখা নবীন সন্ন্যাসীর মন্ত্র-বাণী। ঐ বাণীই রণক্লান্ত সৈনিককে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ঐ শোনো তরুণ কণ্ঠের বীরবাণী, —আমাদের মধ্যে ধর্ম-বিদ্বেষ নাই, জাতি-বিদ্বেষ নাই, বর্ণ-বিদ্বেষ নাই, আভিজাত্য-অভিমান নাই।' এমনটি তো কবির কথা নয়! 'কবিতা আমাদের জীবনের পক্ষে সত্যিই কি প্রয়োজন? কেন প্রয়োজন?' কিন্তু কবিতা-কেন্দ্রে নজরুলধৃত বাণীটি পেয়ে যাই, সে সূত্রে তর্ক-কুহেলিকা কম নয়। তাঁর সময়ে তো 'তলোয়ার দিয়ে দাঁড়ি চাঁছা' বা একালেও 'জার্নাল' বলে চালানো! নজরুল তো তৃতীয় শ্রেণির কবি নন, যে অর্থ বা প্রভূত সত্য দ্বারা তিনি নিহিত তাতে তিনি প্রকৃত কবি—আরও ব্যাপকভাবে বললে বাঙালি কবি। ব্যক্তিজীবনে নজরুল বিবিধ বাস্তবতার ভেতর দিয়ে চলেছেন, সেখানে তিনি 'সুন্দর'কেই ধরতে চেয়েছেন। সুন্দরই তার আরাধ্য। জীবনের এক এক পর্বে সে সুন্দর বিভূতি পেয়েছে, তার রঙ-রূপ বিচিত্রময় হয়ে উঠেছে—জানা হয়, সেটিই তার মানবপ্রেম ও চিরন্তন বিস্মিত আকাঙ্ক্ষা। পরিপ্রেক্ষিতটি জেনে নিলে তার প্রমাণ মেলে। সে রূপেই তাঁর কবিতা এবং ওইরূপ একচ্ছত্র প্রত্যয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধের পূর্ণ-উপনিবেশ প্রযুক্ত সমাজে একদিকে তার আত্মজীবনের লড়াই অন্যদিকে প্রচল সমাজের দৃকপাত তাকে প্রলুব্ধ করে লেখায়—বিশেষত কবিপ্রভায়, প্রতিভাদীপিত কবিরূপে, 'এমবডিমেন্ট', 'stuff of poetry' রচিত, দ্বিধহীন স্ফূর্তিতে, প্রলয়কণ্ঠীরূপে। সেটি কেন? 'ক্ষেপিয়া' গিয়া নাকি প্রতিশ্রুত বীক্ষায়—অবশ্যই আরোপিত নয়। ভেতরের কাঠামোতে পরিবর্তন চেয়ে বাইরের কাঠামোর বিনুনি। মানসিক স্তরের অনেক বাধা পেরিয়ে, আহৃত মননে, অনল প্রবাহ যেন জেগে ওঠে—ওই কলমে। বলতে চাই, শুধু প্রয়োজনটি তো সেখানে মুখ্য নয়, সুন্দরের আহ্বানটি প্রধান, তা প্রকাশে এবং বয়নে, মানুষের আখ্যানরূপে, 'মানুষের জন্য'। ব্যবহারিক মানুষ হিসেবে শুধু নন নজরুল, কবির 'এমবডিমেন্ট'-এ, কল্পনামনীষায়। ঝলকে ওঠে

www.chinnofoundation.org

তার প্রলয়ছন্দ, সমাজ গুঁড়িয়ে যায় সঙ্গে—সেরূপ ভাষায়-ছন্দে-রূপকল্পে-মেটাফরে-ইমেজে প্রবলতায় প্রকাশ। কোন্ বলয়ের তিনি, কোন্ ধারার তিনি—তা থাকে না, পাঠে পৌঁছান সুন্দরের বার্তাবহ হয়ে। এটি একটি দিক, অন্যদিকে এর ভেতরের টেক্সট্-এ অনুসরিত সমাজ ও ইতিহাস, কীভাবে বিধৃত! কারণ সে পর্যায়ে নজরুল অনেক ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক। প্রখরতায় উপনিবেশ-শক্তির বিরুদ্ধে শুধু নন, বেরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন সক্কলকে। সে বেরিয়ে আনার ক্ষেত্রটি তুমুলভাবে শুধু বাইরের নয়, ভেতরের জড়তা থেকে, কূপমণ্ডূকতা থেকে, অন্ধতা থেকে। সেটি ব্যক্তির আলোকশিখার জন্য। আর সমাজের শোষণ, শৃঙ্খলা, অমুক্তির—পদানত যা কিছু তার বিপক্ষে। সমাজকে এক অর্থে পুনর্গঠনের, পরিবর্তনের, নবপ্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা আর সেখানে ব্যক্তির গড়নটি মুখ্য। এ কাজে জাতি গঠন, সমস্ত ভেদ উৎপাটন, নিজস্বতার উদ্বোধন, জরা-গ্লানিকে অস্বীকার করে এগুনো। এ লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার, ভেতরের ঐক্যের লক্ষ্যে কাজ করেন নজরুল। নজরুলের এ কাজই ছিল তার 'নিষ্পাপ' সমাজকেন্দ্র। সেটির জন্য তার ক্ষেদ-উষ্মা-অভিমান-নৈরাজ্য ভাবনায় কুণ্ঠা-অকুণ্ঠার দ্বন্দ্বে জ্বলেছে। এতে করে তার 'সুন্দর' বিচলিত হয়েছে, অনেক সময় ছাপিয়ে উঠেছে অন্য কিছু, হাহাকার বা হৃতোচ্ছ্বাস হয়েছে ক্রোধজড়ানো উন্মত্তায় উল্লম্ফিত। সুন্দরের ব্যাপকতা ও গভীরতা এক স্তরে আটকেও গেছে, বলা যায়। কিন্তু সেটি তো তার পরাজয় নয়! সে চেতনাটিতে কী ছিল—তাই পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার বিষয়। কারণ, দুর্বল বা অগভীর শিল্পের কাছে নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা আরও গভীর। আবার কবিতাধারার পথরেখায় ওই নৈরাজ্যের ভেতরেই আশ্চর্য প্রকাশ (expression)—যা বাংলা কবিতার চিরায়ত চেতনাকে ভেঙে দিল, কবিতা হয়ে উঠল দুর্বার, লক্ষ্য-নির্দিষ্ট, স্বয়ম্ভূ, সার্বভৌম দৃকপাতে কঠিন, বজ্রসম। সমর্পন ছেড়ে সে হয়ে উঠল ব্যক্তিত্ব-মুখরিত, জাতীয়তা-সন্ধানী, উপনিবেশমুক্তিময় ব্যক্তির তপ্ত উদ্ভাসন। যেন এক পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত ঘটে ব্যক্তির। আরও গভীর পরিচয়ে এ ব্যক্তি বাঙালি, স্বদেশীশক্তিসন্ধানী, জাতিত্ব-জাগরিত। তাতেই কবিতা ভাষা বদলালো, অ-শনি শক্তি অর্জন করল, বিদ্রোহের দগ্ধতায় নিজেরে পুড়িয়ে বলতে চাইল সামষ্টিক মুক্তির কথা, নিজে সমষ্টিতে যুক্ত হলো, আত্মপরিচয়ে এক মুক্তময় আকাঙ্ক্ষা ছড়ালো। সাহিত্যের ভেতরে এ প্রয়োগ, তার ভাষায় সে প্রকোপ, উচ্চারিত হলো :

তবু শত সূর্যের জ্বালাময় রোষ
গমকে শিরায় গমগম
ভয়ে রক্ত-পাগল স্রোত পিশাচেরও
শিরদাঁড়া করে চন্‌চন্

www.culmofoundation.org

কিংবা,

চোখের জলে ডুবলে গর্ব শার্দুলও হয় বেদ-পাঠক,
প্রেম মানে না খুন-খাদক।

কবিতারীতিটি এখানে ধরা যায় না, পদ্ধতি-প্রণালী আকর্ষণীয় নয়, কিন্তু এর রোমান্টিক-প্রবাহ অনস্বীকার্য। যার ভেতরে 'রোষ', 'রক্ত পাগল স্রোত' ধ্বনিতাণ্ডবে প্রতিবেশিত। লোকপ্রবণ ও বোহেমিয়সত্তার উত্তরাধিকার নজরুল রোমান্টিক ভাবনাটিকে সমস্ত প্রাকার ভেঙে নিবিড় সততায় 'সুন্দরে' পর্যবসিত করান। সেখানে নিছক লোকশিক্ষা নয়, লোকশিক্ষার ভাপে পরিবেশিতও নয়; দুর্মর কারা ভাঙার জাগরণ, প্রচল আচরণকে অস্বীকার এবং বিপরীতে সম্মুখগামী ও মিলিয়ে ফেলা চিত্তের ঐক্যবিশ্বাসলগ্ন করা, এক পরিপূরক বিশ্ব নির্মাণ করা—যেখানে সামষ্টিক 'শিরদাঁড়া করে চন্‌চন্‌'। এতে বিষয়টি রক্ষা পায় নির্ধারিত ভাষায়। শব্দে তার রূপ তোলপাড়। শব্দকে নজরুল গড়েছেন, পিটিয়েছেন—এনেছেন গণ-কাতারে, লগ্নি করেছেন। কবি শব্দে তার ইচ্ছানিরপেক্ষ ও অভিপ্রেত প্রবণতার তুঙ্গ মাত্রাটি বহন করতে চান। পূর্ণ সততায়, নিবিড় অভীপ্সায়, অপরিমেয় বিশ্বাসে সেটি পরিস্রুত হয়। এটিই মহান করে কবিকে। নজরুলে সে ঘটনাটি বিস্ময়কর, উল্লেখ করেছি তাঁর বোহেমিয় সত্তার স্বরূপ, যেখানে সবকিছু ছিন্ন কিন্তু নিরঙ্কুশ আচ্ছন্ন মানুষ ও জীবন। এতে লেটোদলের নজরুল, পার্সী-প্রভাবিত গজল রাগলয়ের নজরুল অনেকভাবেই বেঁধে ফেলেন লোকায়ত চিরায়ত অনিবার্য মানবময় রূপজগতকে। সে রোমান্টিকতায় উচ্চলয় শব্দ হ্রেষা সম্বিৎ নিয়ে আসে, গঠিত তার ঝংকৃত তেজোদীপ্ত ধ্বনিতরঙ্গ। এতে বলয়-চিহ্নিত থাকেন না নজরুল, তার সুন্দর বা ব্যবহারিক আখ্যান পেরিয়ে যায় অন্যতর। তাতে যুগবাণী প্রকাশিত, তার স্তরে স্তরে প্রশ্নোত্তীর্ণ সৃষ্টি-বেদনা সঙ্গতি পায়। এতে তাঁর পেছন ফেরা বা সমর্পিত আত্মদান থাকে না এতোটুকু বরং সমস্ত ভক্তি-আর্তির বিপরীতে বিদ্রোহের স্বাক্ষর অমলিন আখ্যা পেতে থাকে, বিদ্রোহও বিশেষ থাকে না নির্বিশেষ এবং একচ্ছত্র পরিণয়ে আবদ্ধ হয়। এগুলোরও পূর্বাপর বিশ্লেষণ আছে। কারণ, আধুনিক বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সমাজ-সংশ্লিষ্টতা কবির বিধৃত মনের একটি স্তরের পুনর্নির্মিত কাঠামো। সেটির ভেতরে তার রোমান্টিক প্রবণতাটি গৃহীত। বিশ শতকের প্রথমার্ধের সমাজে নজরুলই সেটি ব্যাপক মাত্রায় গ্রহণ করেন। সেক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান বা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবিক হয়ে ওঠা আর তা উপনিবেশ ও আগ্রাসন শোষণের বিরুদ্ধে মেধা সঞ্চালন অপ্রতিরোধ্য—সেখানেই সমাজ-সংশ্লেষ দুর্বার, ব্যত্যয় কিছু করার থাকে না—তাঁর মেধার গড়নই সে সংশ্রবটি গড়ে দেয়, তাই হয়ে যায় তার কল্পনামনীষা বা একাত্মতা। লোকদস্তুর বা বোহেমান অবয়বটি 'কবি' আর তৎ-শব্দ বিপুল প্রভায়

www.chinnofoundation.org

অধিনায়কত্ব দান। নজরুল উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তি কবিতা কি-না তার চেয়ে বড় সে পংক্তির ভেতরের প্রণোদনা-প্রবাহ, পরিচ্ছেদ, ধ্বনিব্যঞ্জনা, লয়-পরাকাষ্ঠা, ছন্দদ্রোহ, প্রেরণা-প্রবণতা প্রভৃতি। সেটি কোনো কালের নয়, কবিতা চিন্তার পূর্বাপর স্বরূপ ও বিষয় অবলুপ্ত এবং উদ্দিষ্ট সমাজের ভেতরের সামষ্টিক শক্তির সত্তাময় দৃষ্টিকোণ তৈরি—সে রচনা প্রগতির পক্ষে বা গণমানুষ ও নির্বিচারে মানুষ-মানবতার জন্যে। সে মানুষ দ্বন্দ্বাত্মক লয়ে উৎকীর্ণ। সম্ভাব্য লোকস্বরূপে যাবতীয় আনন্দে ভেতরের বৃত্তির উৎসারণে জারিত। এক্ষেত্রে যেটি আবহমান-নিরুদ্ধ তাই ধরা পড়ে। ফারসি বা ইরানীয় সংস্কৃতি বা দোভাষী পুঁথির পুনঃরূপ স্বতঃস্ফূর্ত–সেটির জন্য যে নাট্যচরিত্র তাও হার্দিক রসবোধে সিদ্ধ–সেখানে মুসলিম বলে নয়, বা শ্যামাসঙ্গীতের হিন্দুত্ববাদীতা নয়–তার নিজস্ব লোকায়ত সংস্কৃতির উদার ও সমন্বয়ী জীবনভাবনা থেকে কবি তা গ্রহণ করেন। সেখানে নজরুল প্রতিভার গুণে অপ্রতিরোধ্য। তাঁর কবিতা তাই সঙ্কলের। সে দায় থেকেই তিনি বিদ্রোহী এবং প্রবলভাবে রোমাঞ্চিত। সে রোমাঞ্চের ভেতরে ওইরূপ শব্দ ও ইঙ্গিত প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে নজরুল সমস্ত স্বার্থের ঊর্ধ্বে, ধর্মবুদ্ধি বা প্রথাগত অনুশাসনের বিরুদ্ধে শব্দকে প্রয়োগ করেছেন, রোমাঞ্চ-এর সূক্ষ্ম প্রবণতায় উৎসবমুখরিত হয়েছেন, গিয়েছেন সে অনুষঙ্গি আস্থা ও প্রেরণার দিকে। তাতেই তিনি পেরিয়ে যান আঁধারের পথ, জয়কেতনের ভেতর দিয়ে আশার বাণী উচ্চারণ করেন। সেটি হয়তো কবিতা বা কবিতার মর্মে ইতিহাস উচ্চতা পায় না কিন্তু একপ্রকার মাত্রায় শব্দশিহরণে সম্ভাব্যতার পথ নিরূপণ করে। সে পথে নজরুলীয় প্রতিভা দোর্দণ্ড হয়ে ওঠে, বিষয়-নির্বাচনে নিশার স্বপন ভেঙে যায়, যাবতীয় প্রথাকে অস্বীকার করতে চায়, ভাবনাটিতে এক ধরনের ঐক্যবিন্দু নির্মাণ করে, সহমর্মিতার সঙ্গ পেয়ে বসে। যে বন্ধুর পথে নজরুল আঘাত করেন, সেটি সমর্পণকে অস্বীকার করে, সংগোপনকে অস্বীকার করে, জীবনের সত্যতার স্বপ্নকে সত্যিকাররূপে তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে নজরুল একচ্ছত্র ও আপসহীন।

৩

পরের প্রস্তাবনা ব্যাপকরূপে জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি, কিংবা তার দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত। বিশশতকের প্রথম পাদে ইত্যাকার প্রসববেদনা বাড়ে–এই ভারতবর্ষে। উপনিবেশমুক্তির আকাঙ্ক্ষা উত্তুঙ্গ। পরিবেশটি এমন জরুরি, এখনই এর নায্যটি আদায়ের উদ্দামতা লক্ষ্যস্থির। নজরুল তার স্বভাবে যথারীতি একীকৃত। রাজনীতি তখনও গণভাবে পৌঁছয়নি, সেটি পৌঁছানোর প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়, বিপুলভাবে যিনি প্রত্যয়ী–ওইসব অবস্থানে, সাম্য-অভেদবর্ণজাতি-সমাজগতিতে অবিচল আস্থা। মিলে যায় এসব অভীপ্সাসমূহ। তৃতীয় দশকে

www.shimcfoundation.org

নজরুল সার্বভৌম-বিদ্রোহী। আপস বা নতজানু তো ননই তার বাইরে সবার ওপরে মানুষ। সে মানুষের জন্যই স্বরাজ-টরাজ বা রাজনীতি বা অন্যকিছু। প্রত্যক্ষ ও দৃঢ়প্রত্যয়ী দীপ্ত নজরুল উত্তপ্ত। নেমে আসছে রাষ্ট্রীয় খড়্গ। নিরাপোষ-এর জন্য, 'অন্যায়' উক্তির জন্য, অবনত না হওয়ার জন্যে। নজরুল কবিতার সে অসংযমের শিল্পটির প্রয়োগ ঘটালেন। ওই স্বভাবজরূপে। ভেতরে অসাম্প্রদায়িকতার গভীরে। একইসঙ্গে নিজ ধর্ম-জাতির অনিবার্যতা আদায়। কী প্রবল ও উন্মাদ ঐক্যরূপটি তিনি কামনা করেন। যারা পিছিয়ে তাদের এগিয়ে নিতে চান, মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হাতাশা কাতর জাতিকে জাগাতে চান– ওই ঐতিহ্যে-ইতিহাসে-পুরাণে। সেটির ঘোষণামতো কাজ করার জন্য মুসলমানদের এগুনো ছাড়া ব্যত্যয় কী? বিদ্রোহের স্বর ও সুরটি তাঁর ব্যক্তিত্বেই আছে। সেটির বিষয়-নিরপেক্ষ প্রয়োগের জন্য লেখেন নাট্যকাব্যিক আবহে, কবিতার ছন্দে, বলয়মান প্রবাহে এগিয়ে চলেন। সেজন্য ভাষা বা প্রকরণটি গুরুত্বপূর্ণ। আরও বলা চলে, কবিতার বাইরের এ প্রকরণ বৈশ্বিক প্রবাহটি দরকার। নজরুল সর্বাত্মক আর ওইরূপ প্রয়োজনে পাল্টে যেতে থাকে কবিতার রূপ-ঐশ্বর্য। আর অনুগমন নয়, একেবারে ঝড়ো ও দমকা রূপে কখনো তা অস্ত্র, নয়তো উপদেশ-আদেশ-উপদেশ বৈকি; সেটিতে পেরিয়ে যায় তাবৎ বাংলা অলঙ্কার-ভাষার প্রচল আর প্রকাশভঙ্গির পুরাতন-আনতছন্দ। বেরিয়ে আসে মুক্তছন্দ, 'কারার ওই লৌহকপাট/ ভেঙে ফেল কররে লোপাট' অন্ত্যমিত্রে তবে হরদম-দুর্দম ছন্দে। এটির কারণ, প্রখর মেধার মাত্রা। আর একইভাবে তা গৃহীত ওই কালভেলায়, কালবিন্যাসে। সেটিতে প্রতিষ্ঠা আর নিষ্ঠা মানুষ, মানবিকতা, সাম্য, সর্বোপরি জনকল্যাণ, বিপুল আন্তরিক ও নিরন্তর সুন্দর মানুষ। ফিরে আসে এ 'সুন্দর', এক একরকমে। গল্পে-কবিতায়-গানে-কথায়। সে সুন্দরের ভেতর দিয়ে যে শিল্পের সারাৎসার রচিত হয়, বয়ন হয়– তা দুর্বার কিন্তু ভেতরে কাঁচা রোমান্টিক। সেটির মাত্রা দুর্বিনীত ও অভিমানিনী। কাব্যসুন্দরে কী আছে? যদি ফেরৎ যাই *অগ্নি-বীণা* ও অন্য কাব্যে, কী তার আঁকিবুকি, ধূম-ধাড়াক্কা যেন। ধূমকেতু : 'আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুন মহাবিপ্লব হেতু/ এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!' রণ-ভেরী : 'ওরে আয়!/ ঐ মহা-সিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়–' এছাড়া মোহর্‌রম : 'নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া,–' এসব কোন্ সুন্দর? এই নজরুলই পরে লেখেন : শেষ প্রার্থনা : 'সে যে চাতকই জানে তার মেঘ এত কি,/ যাচে ঘন ঘন বরিষণ কেন কেতকী!' যুগান্তরের গান : 'বলো ভাই মাভৈ মাভৈ,/ নবযুগ এলো ঐ' এমন রকমে কোন্ সুন্দর বিরাজমান? এই যে বিচিত্রতা, তার অভিনব প্রয়াস তাতে যে সুন্দর নিঃসন্দেহে তা 'মানুষ', অনুরাগের মানুষ, প্রাণের মানুষ– সেখানে জাত-ধর্ম, ধনী-দরিদ্র, শ্রেণি-বর্ণ অভেদ। সেজন্য এ

www.ohimefoundation.org

সুন্দর প্রভূত– প্রয়োজনে-প্ররোচনায় এবং রাগে-উন্মনায়। কবিতার কথায় সে প্রতাপ পদার্থময়, ছায়াসুনিবিড়, তিনকাল ছড়ানো– মর্মে ইতিহাস ও কালজ্ঞান বিধৃত। বিশ শতকের শুরুতে নজরুলের চোখে তাই ছিল। সেটি হয়তো প্রয়োগে বা নানাবিধ প্রবাহে বদলে গেছে, কিন্তু হয়নি এতোটুকু মলিন, পড়েনি দিশেহারার মুখে, সুন্দরের সে মাত্রা খণ্ডিতও নয়। মানে-অভিমানে, সুন্দর-অসুন্দরে, যাপিত চিৎকারে দুরন্ত, রকমে তা দুর্বারও। কেউ বলেন কবিতা তার হারিয়ে গেছে– পায়নি সুন্দরের শান্তি। সে তো বিচার্য ওই স্বভাবে, কবিস্বভাবে, মনোচিন্তায়। যে নজরুল যেমনটায় দারিদ্র্যকে মহান বলেন, 'উপাড়ি ফেলিতে' চান মহাবিশ্ব, আবার ষোড়শীর হৃদি সরসিজ প্রেম খোঁজেন–সেটির সুন্দর কেমন, তার প্রকৃতি কেমন আর তা কোন্ প্রণোদনায় উৎসারিত সেটি বিচার্য। সেখানে মেধার বলয়টি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত, কীভাবে তা অনিরুদ্ধতায় দাঁড়ায়, ছুঁয়ে যায় বিচিত্র কণারাশি– তার কেমনরূপে অপরিশোধ্য, জানা আবশ্যক। এ আবশ্যকরূপে নজরুল সকলের হয়ে ওঠেন, সবার কাছে পৌঁছান, পণ্ডিতদের নিকট অপাত্র হন– অগ্রহণীয়তার প্রশ্ন আসে; কিন্তু অশেষ নজরুল কীভাবে প্রতিষ্ঠা পায় তা বিশশতকী কাব্যপ্রবাহে বিচার্য করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে মানুষ ও তার মানসীরূপ অর্গলমুক্ত হয়– ওইরূপ বিশ্বাসে, আকুল করা শব্দ বন্ধনে, প্রাচুর্যময় তেজদর্শিতায়, অপার মুক্তিতে, আলস্য ছাড়ানো উল্লাসে, হাহাকারের ভেতরে পুষ্পবৃষ্টির আহ্বানে– ওই কবিতায় নিঃসৃত পংক্তিতে, নির্ধারিত চরণবিন্যাসে, গভীর গাণ্ডীবের তরে– নজরুল একক প্রভাবে কবিতার কাজে নিজে নিয়োজিত। কবিতা তো তখন কেজো, ভেঙেছে সে সুর-ছন্দ-অলঙ্কার-লয় ইত্যাকার সব। তাতে তিনি ঋজু ও দৃঢ়। সেটি তাঁর কবিতা উতরোল, কল্লোলিত, নিনাদ-আশ্রিত। এটিই তাঁর রোদনরূপ, আঁখির জল। আবার বিপরীতে সে রূপেরই আরেকটি অবয়ব গঠিত হয় 'নৈরাজ্য'– এবম্বিধ ভেতরে বিদ্রোহ, অকরুণ বিদ্রোহ। সেটি প্রচল ভাঙার জন্য, অর্গল মুক্তির জন্য, প্রথাকে অস্বীকার করার জন্য, সংস্কারমুক্তির জন্য, আচরিত-নিরুদ্ধ যা-কিছু তা গুঁড়িয়ে দেওয়ান জন্য। তবে সেটি তাঁর বিক্ষিপ্ত কিছু নয়, লেটোর দলের নজরুল তো বাঁশি আর মেঠোগান নিয়েই এসেছিলেন কিন্তু ক্রমশ তার ভেতরের জীবন, ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক বিষয়-আশয়– তৎপ্রবাহে দৃশ্যমান সমাজ তাকে আর একটি ডাইমেনশান-এ দাঁড় করায়। চঞ্চলমনের কাঠামোটির ক্রম-স্তরান্যাস ঘটতে থাকে, সেখানে সমাজ দায়ের ভিত্তি স্থাপন পায়, 'উপনিবেশ'-কাঠামোটির পরিচয় ও বেদনা তাকে মুখর করে, সেটি অপ্রতিরোধ্য তেজে বিলোপ-প্রত্যয় দায়ে পরিণত হয়– এক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের বা সংঘতাতেও অবিশ্বাস জাগে ('স্বরাজ-টরাজ মানি না')। অতঃপর কলম তুলে তারই দৃষ্টিমুখ অবিরল পাল্টায়, দুর্মর পরিবর্তন, নির্বিশেষ জীবনের প্রত্যয় চিহ্নিত, প্রান্তিক মানুষের জয়-উল্লাসে

www.chinnofoundation.org

ব্রতী, সাধারণের কাতারে নিজেকে সেঁধিয়ে দেওয়া, নিজেকে তুলে আনা, নির্মল জীবনের আহ্বানে সকলকে জাগিয়ে তোলা, নৈর্ব্যক্তিক চাওয়ায় অভিষিক্ত করা। অন্যায়-অযৌক্তিক কিছু নয়, ন্যায় ও সত্যের ধারায় প্লাবন-প্রতিষ্ঠা করা। এমতে লোটর নজরুল বদলে যায়, কবির মুখ পাল্টায়, কবিকৃতি অর্জন করে নির্ধারিত সময়ের প্রত্যয়সমূহ, সমাজের ভেতরের গহীন কষ্টসমূহ, উতরোল মুখরিত হয় বৈষম্য-বিরোধী প্রবণতাসমূহ, তপ্ত হয়ে ওঠে কোমল-কঠিন মুখ, পরিখা পায় অভাবিত নন্দনের, দাঁড়ায় এক অভিমুখ সেখানে তিনি বলেন :

পরাধীন বলে নাই তোমাদের
সত্য-তেজের নিষ্ঠা কি!
অপমান সয়ে মুখ পেতে নেবে বিষ্ঠা ছি?
মরি লাজে, লাজে মরি!
এক হাতে তোরে 'পয়জার' মারে
আর হাতে ক্ষীর সর ধরি!
অপমান সে যে অপমান!
জাগো জাগো ওরে হতমান!

এরূপ শব্দরাজি ও মিলিত স্বর ওই সময়ে এলো নতুনতায়, অসমর্পণে, অনমিতরূপে। কেজোরূপে, ব্যবহারিক বদান্যতায়, বিশেষ মানুষের হয়ে– সে মানুষ 'হতমান'– প্রান্তিকতায় আছড়ানো, ব্রাত্যদাহ্যদাহে পীড়িত। তাকে জাগিয়ে তোলা, সমঅধিকারের সমভিব্যহার রচনা করা, সে লক্ষ্যে প্রতাপের অগ্নিশ্বাস তৈরি ('দ্রিম্ দ্রিম্ তানা দ্রিম্ দ্রিম্ ঘন রণ– কাড়া– নাকাড়ায়!/ শের– নর হাঁকড়ায়'), শব্দ-ছন্দ লয়ে অভিপ্রেত দল গঠিত। এভাবে কালের ভাষা নতুনে পৌঁছায়, সেকালের ভাষার শক্তিতে তৈরি হয়ে চলে নতুন প্রাণনা, বিশ্বাসে ধারণ করে অনেক যাথার্থ্য, অলঙ্কারে পরিব্যাপ্ত ঘটে নতুন দূরবনগন্ধবাহী দ্যোতনা। এটি আমাদের ভাষার কাব্যবিদুষী রূপবিভা, যেটি নজরুলে সর্বোচ্চ ব্যবহারে প্রকাশ্যতা পেল। যেটি বলা দরকার, এরূপ 'একচ্ছত্র প্রত্যয়'– ওই কবিভাষায় সেটি কায়েমী হয়ে উঠল। কবিতার এ রূপ বিরল-বিরান কিন্তু নজরুল তাতে ফলিয়ে তোলেন সোনালী শস্যমালা। সে শস্যমালায় অনেক রকম রূপ আর প্রকাশ আমরা পেতে থাকি, রোম্যান্টিকতার তুমুল প্রসাদও তাতে জেগে ওঠে, যুক্ত হয় অনেক মানুষের নিনাদ-স্বর-উতরোল আকাঙ্ক্ষা আর দ্রোহ-সাম্যবারতা। বিশ শতকের প্রথমপাদের এ সংহার রূপ আমাদের জন্য যেন অভিপ্রেত হয়ে উঠল– ওইরূপ শব্দদ্রোহে, আর রূপকাঠামোতেও তার সোৎসার মাত্রা অনিবার্যতায় প্রগাঢ়তায় হলো উত্তীর্ণ।

তবে কি কাব্য এইটি চেয়েছিল? আর তাতে ওই প্রশ্ন কবিতা হওয়া বা না-হওয়া? সেটি সময়বীণার তারে বাধা পড়লে, রোম্যান্টিকতার সর্বোচ্চ রাগে বিচ্ছুরিত হলে

www.chirantonfoundation.org

নজরুল তো ব্যর্থ হন না বৈকি! কারণ, বলা গেছে যে লেটোর দলে তিনি ছিলেন, যে কবিদস্তুরে তার মেধা তৈরি হয়েছিল, যে কারণে ত্রিশে-চল্লিশে প্রচুর গান লেখেন তিনি, আর বাঁশের বাঁশি ও রণতূর্য এক করে তাঁর যে কবিকণ্ঠের বিনির্মাণ– সেখানে তার সামগ্রিক রূপটি কী! বস্তুত কবিই যে তিনি তা তো সর্বান্তরে দ্বিধাহীন। সে সামগ্রিক অবয়বে নজরুল তুলে নিয়েছিলেন তার জীবনের সামগ্রিক গরল– উন্মনা মন হয়ে উঠেছিল রোষানলের অগ্নিবীণা মুখরিত– সেখানে তার কবিপ্রতিভা বিলীন নয়, তা হয়ে উঠেছে তৎকালিক প্রবাহে আরও মর্মরপ্রোথিত ও বিদ্যমান কর্মকাণ্ডধৃত অখণ্ড মানসআখ্যানে। সেখানে বাঙালি ও বাংলাদেশ একটি চেতনায় যুক্ত হয়েছে। প্রচণ্ড যা কিছু সেখান থেকে বেরিয়ে সে হতে পেরেছে আধুনিক। আর উৎসারিত আধুনিকতায় ভেঙে গেছে তাবৎ অনাচার-বিভেদ-বৈষম্য ও উপনিবেশী আচারসমূহ। কবিতাই তা পেরেছে। আরও উচ্চ-বিশ্বাসে বলা যায়, নজরুলের কবিতাই তা পালন ও বরণ বরমাল্যে সম্পন্ন করেছে। তাতে দুটো বিষয় সম্পন্ন হয়েছে : এক. কাব্য পেয়েছে নতুন দিশা দুই. সমাজ ও ইতিহাস তাতে গভীরতায় প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে। এর বাইরে আরও যেটি তা হলো, মানবিকতা-মানুষ-দেশ প্রবল প্রতাপে অর্জন করেছে একটি উচ্চমাপের সংজ্ঞার্থ। নজরুল কবিতার প্রতাপে একচ্ছত্র প্রত্যয়েই তা করতে করতে সক্ষম হন। সেটি সর্বকালের জন্য আমাদের এবং এদেশের পরম প্রাপ্তি।

৪.

এর পরেও নজরুল তার কবিতায় বর্ণ-শ্রেণিভেদ-জাতিত্ব-জাতীয়তা-অসাম্প্রদায়িকতার আবহ উপনিবেশকালে প্রত্যন্তে ছড়িয়ে দেন। সে কারণে তার কবিতা আমাদের কাছে এক বিশেষরূপে আসে– যেখানে মুসলমান চেতনার স্বাতন্ত্র্য, ফারসি প্রতিমার অপরূপ প্রয়োগ নিশ্ছিদ্র হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে নজরুল এক প্রভূত প্রতাপে আসীন হন বাংলা কবিতায়। সেখানে স্বধর্মের মানুষকে তিনি নিজের পরিচয়ে, আত্মমর্যাদার অভিপ্রায়ে, নজরুল প্রকাশ করতে সংকল্পবদ্ধ হন। এ সংকল্পবদ্ধতা তাঁর কবিতায় প্রবলভাবে সক্রিয়। শুধু বাস্তবানুগ প্রত্যয়ে তা কবিতায় বিধৃত সেটি নয় বরং রোম্যান্টিক প্রেমচেতনা ও মানবতার দ্যোতনায় তা গৃহীত। কবির সে চেতনাটি গৃহীত হয়েছে অতি রোম্যান্টিক, পরিশোধিত বা পরিশোধনোত্তর ভাবনাবলয়ে। এক্ষেত্রে জাতিক ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পরিশোধনোত্তর রোম্যান্টিক সত্তা স্ফটিকস্বচ্ছ হয়, অতিসংবেদনায় সমাজধৃত অসঙ্গতি দোর্দণ্ডতা পায়, মননস্তরে কায়েম হয় প্রত্যক্ষ সংলাপ, সৃষ্টিশীল আন্তর অনুকরণে মানবতার সৌন্দর্য সান্নিধ্য স্পন্দ্যমান হয়ে ওঠে, ক্রম-অভিজ্ঞতা দ্বিতীয়

www.chinnofoundation.org

সত্তায় রূপায়িত হয়ে গঠন করে ভিন্নতর উপমানচিত্র। নজরুলের এ উপমানচিত্র আত্মশক্তিজাত, আত্মপরিচয়ধৃত– ওই সমাজপ্রবাহসঞ্জাত :

যাত্রীরা রাত্তিরে হতে এল খেয়া পার,
বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার?
প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে!
ঝন্‌ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে!

আবুবকর উস্‌মান উমর আলি হায়দর
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মঝি মাল্লা,
দাঁড়ি-মুখে সারি-গান – লা শরিক আল্লাহ!

এরূপ প্রকাশপ্রতিমা বাংলা কবিতায় নতুন, ছন্দের ঝংকার, অন্তর্ভুত ভাবপ্রবাহ, বিচ্ছুরিত ধ্বনিপ্রয়াস প্রভূত হয়ে ওঠার ক্ষেত্র রচনা করে। প্রতীক-বীক্ষণটি কবিকরোটিতে অস্তিত্বসঞ্জাত, ঐতিহ্যনির্মাণ ও পুনরুদ্ধারে সংরক্ত, এটি কেবল স্মৃতিচারণা নয় বরং অতীতের সঙ্গে বর্তমান সময়খণ্ডের সম্বন্ধ ও পরম্পরাসূত্র নির্ধারণ প্রয়াস। কবি এর ভেতর দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন স্বঐতিহ্যে, চিনিয়ে দেন নিজস্বতায়, পূর্ব-পরিচয়ের ও বিশ্বাসের মৌলকেন্দ্রে। আশ্চর্য এ বয়নপ্রয়াস, আর একীকৃত করার সামর্থ্য– চিত্রকল্পে 'ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া' প্রলয়েরি আহ্বানের সঙ্গে উন্মত্ত। তাতে প্রেরণা চার আদর্শবাহী খলিফা, তাঁরা পুরাণময়, পৌরাণিক ব্যঞ্জনায় গ্রথিত– সেখানে ধেয়ে আসে উপভোগপ্রত্যাশী গান– কিন্তু তা গৎবাহী নয়– তীক্ষ্মতায় যুৎসই লয়ে 'লা শরিক আল্লাহ'তে স্থির বিশ্বাস– সবকিছু একাকার কিন্তু লয়ে-পদবিন্যাসে-ইমেজপ্রকল্পে অবিসম্বাদিত। কারণ, মুসলমানদের আন্তর প্রেরণা ও শক্তি সেখানে পরিস্রুত। স্বভাবজ লোকজ কণ্ঠসুর সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে চমৎকার ছন্দে প্রতিষ্ঠিত। চিরপ্রণয়ের এ অবভাসে আপাত মুসলিম সম্প্রদায়ের 'সেন্টিমেন্ট' মনে হলেও তা নয়, তুমুলভাবে তাতে অলক্ষ্যে অবচেতন অবগাহনে প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত কবির প্রাকৃত সুর– যা ওই সমাজ ও কালখণ্ডে এবং পরবর্তীতে নিরবচ্ছিন্ন প্রবহমান। কবিতার এমন প্রতাপে জাত-পাত-কুল বাতিল হয়, 'দৈবনির্দেশ' অমান্য হয়, অসমর্পণ মন গড়ে ওঠে– ভেতরে বাইরে প্রকাশ্যে, আর অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে কবি। এ কবিতার শক্তিটি নান্দনিক হয়ে ওঠে পূর্ণ রোম্যান্টিকতায় ও একান্ত আবেগ-অনুরাগের সততায়। সেখানে তার চেতন-অবচেতন অভিজ্ঞতা ও দায়বোধ নান্দনিকতার সৌকর্যে চিহ্নিত। আর তাতে আবেগময়তার সঙ্গে যুক্ত কালখণ্ডের অভিজ্ঞতা। আবেগসত্তার যে ব্যস্টি-অভিজ্ঞতা তা সামষ্টিক মানসে (প্রবহমান সমাজঅংশে) পরিণত হয় এবং তাতেই এক প্যারাডাইম বা পরিকল্পনা গড়ে ওঠে– এখানে উপর্যুক্ত উদাহরণটিই বোধ করি তার প্রকৃত প্রমাণ। প্রসঙ্গত

www.chinnofoundation.org

এটির প্রকাশরূপ সামূহিক চেতন ও অবচেতনে যেমনই হোক দুটো কাজই তাতে আছে : এক. অসাধারণ কূটাভাস যা ব্যঞ্জনায় 'সামষ্টিক মানব নৈর্ব্যক্তিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ জীবনমুখী অস্তিত্বকে' অনুসন্ধান করে দুই. শেকড়সন্ধানী অন্তর্লীন আকরণ নির্ভার নিঃশঙ্ক শরীরীরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। বিরুদ্ধ প্রকৃতির বাইরে সংগ্রামমুখর সহজাত এ যাত্রা। সেখানে নজরুল সহজাত। তার প্রবৃত্তিও তাতেই নিপতিত।

প্রসঙ্গত, ফিরে আসি বিশ শতকের প্রথমার্থের উপনিবেশ-সমাজে। যে বিরুদ্ধ-সমাজ নজরুলকে ভাষা দিয়েছে, নজরুলীয় করে তুলেছে– সেখানে তার দায় সমস্ত বিভেদের অবসান, সাম্প্রদায়িক-সংস্কার উৎপাটন, শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করা আর নিজে বিশল্যকরণীরূপে তাঁর দস্তুর-প্রকাশ : 'আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া'। সেটি সম্পন্নতায় তার চুরমার অভিব্যক্তি। আমাদের পাওনা ও লাভ-লোকসানও তারই মধ্যে। মুসলিম হয়ে মুসলিম অনুষঙ্গ রচনা করা, তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পুনর্নির্মাণ করা– নজরুল অনতি-পশ্চাৎ মুসলমান, 'অসংস্কৃতি'র মুসলমানকুলকে জাগিয়ে তোলেন, চিনিয়ে দেন সমৃদ্ধির প্রেরণাদায়িনীদের, পাশাপাশি এ উক্তিও ছিল হিন্দুর যা আছে যে গৌরব আছে তা থেকে মুসলমানও পিছিয়ে নেই– সে জাগরণ প্রয়াসটি তুলে আনা, আর একত্রিত করে, উভয়ের ঐক্য কামনা করে, সম-ঐশ্বর্য-ইতিহাস-পুরাণ বিবেচনায় এনে বৃটিশ-বিরোধী হয়ে ওঠা– এ তাঁর সামগ্রিক কাজ। কবি নজরুলের এ প্রয়াস ওই সময়ের অভিপ্রেত দায়ে, তাঁর কবিতাই সেখানে অস্ত্র, প্রভূত প্রতাপ তাতেই বিধৃত। মূল ভাবনাটি এমন, হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে উপনিবেশ অবসান, বৃটিশ-সমাপ্তির সংবাদ আনা, 'লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট'- সেখানে অভেদ ধর্ম-বর্ণ-জাতি। এ সংস্কার থেকে বেরুনো তো কঠিন, কিন্তু নজরুল স্বাধীনতার স্বার্থে আপসহীন, কুণ্ঠাহীন। সে লক্ষ্যেই বিভেদ অপসারণ, কাঠিন্যকে জয়শ্রী দেওয়া। শুধু বৃটিশ নয়, 'স্বরাজ-টরাজ মানি না'– নিজেদের পার্টিজান হওয়া থেকে বিদ্রূপে বেরিয়ে আত্মসমালোচনায় মুখর, শাসন বদলায় শোষক বদলায় না, কখনো এদেশী বা ভিনদেশী শোষকরূপে থেকেই যায়। সুতরাং সমাজ পাল্টাও, মানুষের ভাগ্য-উন্নয়নে প্রান্তিক মানুষকে কাজে লাগাও। এক কর ধনী-গরিব-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। নজরুলের প্রত্যয়গুলি কবিতা-প্রতাপে তাই, সেটিই করতে সক্ষম হয়েছে। কবিত্ব-আরাধ্যও লাভ করে এমনরূপে পূর্ণপ্রসিদ্ধ।

এভাবে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে তার কবিতার প্রতাপরূপটি বাংলা কবিতার ধারায় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কবিতা কতোটা কবিতা? প্রশ্নটি এ আলোচনায় আগেও এসেছে। বলে নিতে চাই পূর্বোক্ত প্রায় একই জবাবে *অগ্নি-বীণা* (১৯২২)য় মুসলিম স্বাতন্ত্র্য বোধটি প্রতিষ্ঠার কারণ ও এর পূর্বাপর ব্যাখ্যা।

www.chinnofoundation.org

সেটি লালন-পালন করা নয়, মসৃণভাবে তার চর্চা করা নয়, 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়া'; 'ঝমাঝম', 'হরদম', 'তু কামাল কিয়া' উক্তিতে-সংলাপে-নাটকে দুর্দাম প্রকাশ করা– তাতে ভেঙে যায় কবিতার পেলবতা ও মনোলোভা গুণ, গূঢ় কূটাভাস, কবিতার মর্ম ও কালোত্তর ধর্ম। সেটি কবি নজরুলের উদ্বেগের ব্যাপার নয়, পরিস্রুত চেতন অভিজ্ঞতা যেমনটি দরকার তা গ্রহণ করে, অবচেতন প্রজ্ঞাও সে প্রশ্রয় দিয়ে বানায় 'বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির'– হতে পারে তা পরম্পরাহীন, স্ফটিক আলোকচ্ছটা, বর্ণবিভাহীন প্রত্যক্ষ আদেশ-নির্দেশ। কিন্তু সেটিই তো সময়খণ্ডের ফোকাল পয়েন্ট। লোকজীবনের প্রবাহে সংগ্রাম ও দ্বন্দ্ব আন্তর আকরণে বিচ্ছুরিত, নজরুল অভিজ্ঞতায় ও মননে এক উত্তপ্ত পরিবাহী সংরক্ত নির্দেশ দ্বারা তাড়িত হন। সেটি মর্মে ও মননে প্রোথিত ছিল। সেটি প্রকৃত কবিচেতনার ধারা। সেটিই ক্রম-বিকাশমান সমাজস্তর দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে পরম্পরাহী রাগীস্বরে পরিণত হয়েছে। বেপরোয়া ছন্দে তার প্রতিভার দায় যেমন মিটিয়েছে তেমনি সমাজের কাঙ্ক্ষিত রূপরেখা, মানবতাবাদকে নিঃস্বার্থ-নির্ভার স্বরে তুলে ধরতে সক্ষম হন। সেটিই নজরুলের কবিপ্রতিভা। আর সেটিই বিশ শতকী উপনিবেশ শৃঙ্খল মুক্তির জন্য নির্ধারিত সমাজ দায়, কবিতায় তা পূরিত– ফলে তা বোপরোয়া ও কোলাজধর্মী-পারম্পর্যহীন। নিশ্চয়ই তা ওইকালের সময়খণ্ডের দায়। আর সে লক্ষ্যে কবি ও কবিতার দায়ে পরিমাপ্য।

৫.

উপর্যুক্তরূপে বিশ শতকের তৃতীয় দশকের গোড়ায় যে কবিতা-প্রতাপ নজরুলকে বা তার কবিসত্তাকে আত্মস্থ করল–সেটি কথাকারের নজরুলে আরও অপিণামদর্শীময় বলা চলে। পারেননি কোনো গল্পের চরিত্র বানাতে। ক্ষীণ পারসরে ছাড়া নজরুল এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ। কেন? তাও ওই সময়খণ্ডের দায়ে আটকান। অভিমানিনী-উন্মনা-চাঞ্চল্য আছে ওইসব গল্পে, তা একান্ত নিজের। সেখানে পেরোতে পারেন না, সহজে। বৈশ্বিক প্রতাপটি ও তখন প্রকাশিত, জীবনের ভেতরে-বাইরের রঙ অভিমানে, দারিদ্র্যে, বিরহে বিপুল। কথাকার হিসেবেও তার রূপ প্রকাশিত হয়নি। উন্মনা-অভিমানী নজরুল হ্রস্ব ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তার গল্পে-উপন্যাসে দায় ও প্রত্যক্ষতাও থাকে, নির্ধারিত প্রকরণে তা আটকায়নি। ব্যর্থতার কারণও তার ওই প্রকরণের মধ্যে নিহিত। যা হোক, সেটি অন্য বিষয়। এখানে কবিতার প্রতাপটি আলোচনার মুখ্য। প্রেমের গানে নজরুল জনপ্রিয়– সেটি চতুর্থ দশকে। কিন্তু তৃতীয় দশকের প্রথম পাদের কোলাজে 'কামাল' থেকে শুরু করে সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির সবকিছু গ্রহণ করেছেন। সেটি কবিতাধারাকে অপরিহার্য করে তোলে। তাতেই তাঁর সার্থকতা।

www.chinnofoundation.org

নজরুল 'অপাপবিদ্ধভাবে' ওই প্রত্যয়ে তা সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। সেখানে দ্রোহ বলি, প্রেম বলি, ভেদ বলি, সাম্য বা মানবতা বলি সবকিছুর ঘটেছে প্রবল উদ্‌গীরণ। তাতে তিনি সবকিছুকে ছাপিয়ে আমাদের হয়ে ওঠেন, কালের কালোত্তরের হন। সেভাবেই সর্বকালের প্রাচুর্যময়তাও পান। এ লেখাটি শুধু তারই জীবনপৃষ্ঠার ক্ষুদ্র-অংশের (কবি উন্মেষপর্বের প্রধানত *অগ্নি-বীণা*) একটি অভিক্ষেপমাত্র।

www.chinnofoundation.org

আবুল হোসেনের কবিপ্রসিদ্ধি

পরিণত মৃত্যু, কোনো কষ্ট না দিলেও কিছু জানা বেদনা বারবার ফিরে ফিরে আসে। মহান কবিতাররথের কবি আবুল হোসেনের চলে যাওয়ার পরিবেশটি তেমনই বলা যায়। অনেক পড়াশোনা ছিল তাঁর। পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতাও তীব্র ও গভীর। কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে কবিতাই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। বিভিন্ন ইন্টারভিউয়ে বলেছেন কবিতা নিয়ে, কবিতার শৈলি নিয়ে অনেক কথা। কী কথা? বাংলা কবিতাধারা সম্পর্কে, কবিতার ভাষা সম্পর্কে, কবিতার কৌশল সম্পর্কে আর এখন কারা কীভাবে লিখছেন– তাঁর সময়ে তার সমসাময়িকরা কীভাবে লিখতেন ইত্যাদি। মন্তব্য শুনেছি; সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, সুভাস মুখোপাধ্যায়, সমর সেন সম্পর্কে। বলেছেন শামসুর রাহমান, সিকান্দার আবু জাফর, হাসান হাফিজুর রহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্ পর্যন্ত। দেখার ও জানার অভিজ্ঞতার পাতায় তুলে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ– কে নয়! এক বিরাট বটবৃক্ষ, মহীরুহ তিনি। কতো যে অভিজ্ঞতা, তার 'আমার আপন ভুবন' সিরিজ স্মৃতিকথা সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয়। দেশভাগের স্মৃতি কতো মর্মন্তুদ– তা তার চোখেই যেন পাঠকরা দেখে ফেলেন। ওইরূপ মানবিক সমস্যার বিষয় নিয়ে তিনি সকলকেই অনুভূতিগ্রাহ্য করে ফেলেন।

২.

চল্লিশের মেধাবী—প্রাচুর্যময় কবি আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪)। রবীন্দ্র-নজরুল সান্নিধ্যধন্য, বাংলাদেশের কবিতার প্রত্যুষ-লগ্নের কবি তিনি। দীর্ঘকবিতা পরিক্রমায় তিনি নিজস্ব ভাষারীতিতে সমকালকে নবায়ন করেছেন, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। পুরোদস্তুর নাগরিক। 'ফুসফুসে সীলমোহর', 'থ্যাতলানো থাম', 'ট্রাম-মোটর', 'পোড়া চামড়া', 'বেয়নেট' এমন চলতিশব্দ দিয়ে প্রথম বিপ্লব ঘটান কবি। ফ্রি-ভার্সের সার্থক প্রয়োগ করেছেন তিনি। কবিতাকে নামিয়ে এনেছেন দৈনন্দিন ব্যবহার্যের মুখে। পূর্ব-পাকিস্তানি কবিতার প্রস্তুতি-ভিতে, নতুন সৃষ্টিতে; তারুণ্যের প্রেরণা নিয়ে তাঁর বীজবপন—অতঃপর অগ্রসর ও উত্তরণ। অনুভূতির স্তরে একালের রাজনীতি, বাস্তবতা স্বীকারে আসে : 'যায় যায়, সব যায়/ ধর্ম, সত্য, নীতির কঙ্কাল আজ ধুলোয় লুটোয়।/ মানুষের বেশে ঘুরে বেড়ায় হায়েনা সারাদেশে'—এরূপ ভাষ্যে তিনি সাবলীল এবং মার্জিত। রবীন্দ্র প্রশংসাধন্য *নব-বসন্ত* (১৯৪০) কলকাতায় ছাপা হয়, এন্টিক কাগজে। আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসুসহ অনেকের সাহচর্য তাঁর আধুনিক রুচি গঠনে সাহায়তা করেছে।

www.chinnofoundation.org

কবিতাচর্চায় তিনি গতানুগতিক নন, নিজেই বলেছেন : 'আবেগ হচ্ছে কবিতার প্রথম উপকরণ। হৃদয়ে আবেগের তোড় না থাকলে কখনো কবিতা হয় না। কিন্তু সেই আবেগ যাতে কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে না পারে সে সম্পর্কে কবিকে সবসময় সাবধান থাকতে হয়। সেখানেই তার শিল্পকর্ম। আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতা লিখি না... আমি সেন্টিমেন্টের বিরোধী নই, সেন্টিমেন্টালিটির বিরোধী। তাকে সত্যিই ভীষণ ভয় পাই।' উত্তীর্ণ এবং স্বকাল অবলম্বি আবুল হোসেন সম্পর্কে কবি আবদুল কাদির বলেছেন :

> আবুল হোসেনের কবিতায় যে স্বকীয়তা সেটা বেশি প্রকাশ পেয়েছে তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিরস সংলাপে'। আপনারা এই বই-এর অনেক কবিতা, যেমন 'বাংলার বাঘ', ফজলুল হককে নিয়ে লেখা, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শাহাদত হোসেন মারা যাওয়ার পর লেখা 'জনৈক কবি নাট্যকারের মৃত্যুতে' কিংবা নজরুল ইসলামের ছবি দেখে' এ সব কবিতা অনেকেই পড়েছেন। কী চমৎকার এসব কবিতা! এই বইতে অনেকগুলো গদ্যকবিতাও আছে। এগুলোতে তিনি এমন একটা ভঙ্গি দিয়েছেন, এমন একটা ভাবের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন, যা আমাদের সাহিত্যে দেখা যায় না, আমাদের কবিতায় দেখা যায় না এবং পশ্চিমবঙ্গের অনেক কবিতার ক্ষেত্রেও দেখা যায় না।

কবি ছুঁয়েছেন আধুনিক কাব্য আঙ্গিকের ব্যতিক্রমী কিছু। বলতে গেলে, বাঙালি মুসলমানের বাংলা কাব্যচর্চার আধুনিকতার ঊষালগ্নটি দুর্দান্তরূপে স্পর্শ করেছেন তিনি। প্রকৃতি বিচ্ছুরিত রোম্যান্টিক রং কবির বিশ্বাস ও শিল্পোৎকর্ষের সঙ্গে যেন এক রথে মিলেছে। তাঁর শব্দ ও চরণ ঋজুরেখ :

সুলেমান, রিচার্ড, ক্রুসেড
জেরুজালেম
ঘুম ঘুম ঘুম
তবুতো আজও স্বপ্ন দেখি
তবুতো হৃদয় করে আহও টন টন
তবুতো শোণিতে জাগে অনিরুদ্ধ দুর্বার প্লাবন
তবুও তবুও।

মূলধারা-অনুবর্তী কবিতার মতো আবুল হোসেন ছন্দ বা আঙ্গিকের প্রথানুগ পরিচর্যা করেননি, ফলে তাঁর কবিতার পাঠক বেশি নয়—মুক্তছন্দ ব্যবহার করেন, অন্ত্যমিল-মধ্যমিল রাখেন, অনুপ্রাস ব্যবহার করেন। আমরা জানি, সফল গদ্যকবি সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)। কিন্তু তাঁর মতো বেপরোয়া ছন্দ ভাঙ্গেননি আবুল হোসেন, প্রথাবদ্ধ ছন্দের ভেতরেই নিজস্ব কারুকাজ সম্পন্ন করেছেন। *বিরস সংলাপ* (১৯৬৯) (১৯৪০ থেকে ১৯৬৯ সময়ে লেখা), *হাওয়া, তোমার কি দুঃসাহস*

www.chinnofoundation.org

(১৯৮২), *দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে* (১৯৮৫), *Selected Poems of Abul Hussain* (১৯৮৬), *এখনও সময় আছে* (১৯৮৬), *নির্বাচিত কবিতা* (১৯৯৭), *রাজ রাজড়া* (১৯৯৭), *আর কিসের অপেক্ষা* (২০০০), *রাজকাহিনী* (২০০৪) আবুল হোসেনের কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অনুবাদ কবিতা : *ইকবালের কবিতা* (১৯৫২), *আমার জন্মভূমি* (১৯৭৮), *অন্য ক্ষেতের ফসল* (১৯৯০)। আবুল হোসানের *কবিতাসমগ্র* বেরিয়েছে ২০১০ সালে।

২.

'Abul Hussain, like Ali Ahsan, is well-read in both Yeats and Frost. The former has translated some Yeats in to Bengali, but has not sought to capture the grandure and enchantment of Yeats imagery- an effect which the great Irish poet achieves so effortlessly... —সে অর্থে বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে আবুল হোসেন প্রথম আধুনিক ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, আহসান হাবীবের কবিতাগ্রন্থের আগেই *নব-বসন্ত* বের হয়, রবীন্দ্রনাথকে তা উৎসর্গীত, 'প্রিয় কবির তালিকায় রবীন্দ্রনাথ নেই, কিন্তু রবীন্দ্র প্রভাব তাঁর লেখায়' বিশেষ করে *নব-বসন্তে*। ত্রিশোত্তর কবিগণই প্রিয় ও প্রভাবিত তাঁর লেখায়, পাশ্চাত্যের ইয়েটস্-ফ্রস্টও। স্মর্তব্য, পূর্ব-বাংলার এ মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলিম কবি কবিতাকে উৎসে ফেরালেন, পূর্ণতর আধুনিক করে। 'আধুনিক কাল নিঃসন্দেহে রোম্যান্টিসিজমের পরিপন্থী'—স্বপ্নে ডোবার কাজ একালের কবিদের নয়, কারণ :

> আমরা কি বেঁচে আছি? এই কি জীবন।
> বন্ধ ঘরে কানামাছি এ জীবন নিরূপায় খেলা
> নির্মম আঘাতে ক্ষতবিক্ষত শরীর।
> ("শেষ যুক্তি", *বিরস সংলাপ*)

তাঁর কবিতায় ঘিরে থাকে স্বকাল, সমাজ। ব্যক্তিমনন প্রগাঢ়, ব্যক্তিতেই বিশ্লেষণভাবাপন্ন আবুল হোসেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিস্তর, ব্যক্তিত্বে স্থির, সিদ্ধান্ত স্বকালবিদ্ধ—প্রেম-প্রণয় নির্দ্বন্দ্ব। অভিজ্ঞতা সীমিত মনে হয়, বীক্ষণও সে মতেই প্রতিষ্ঠিত। ক্রমবিকশিত, স্থিতধী আয়ত্ত পরিসর, নিঃসন্দেহে আহসান হাবীবের মতো অক্রিয় বা শাশ্বত-প্রকৃতিকাতর মৃদুমগ্ন নন। ব্যক্তিত্বমণ্ডিত, মূল্যবোধের দ্যুতিতে ভাস্বর, আহসান হাবীবের মধ্যবিত্ত বয়ান থেকে তুমুল পার্থক্য প্রকাশিত। অপরদিকে সৈয়দ আলী আহসান থেকে পূর্ণায়ত পৃথক। আবুল হোসেনের এ ব্যক্তিত্বটি ত্রিশের কবিদের চর্চা বা ইয়েটস-ফ্রস্ট প্রভাবে—নিরন্তর যা তাঁকে মননে ঋদ্ধি দিয়েছে—সুযোগ করে দিয়ে পরীক্ষার ব্যাকরণে নিমজ্জনে :

> আজও

www.chinnofoundation.org

দিনের রাতের যত হোঁচট এড়িয়ে
ছুটির মেলার ভিড়ে আঁচল ওড়ানো ছবি দেখে
বুকের বিকেল ভরে সিনেমার গানে
বউ-এর ছেলের কান্না ভুলে মাঝে মাঝে
সিগারেট ধরিয়েনি গলির দোকানে—
এর চেয়ে আশ্চর্য কী আছে?

'সারারাত খেটে চিত্রকল্প ঘেঁটে/ উপমার আলোজ্বলা পথে গেছি হেঁটে'—অলঙ্কার ব্যবহারেও একই রকম সচেতনতায় পংক্তির বিনির্মাণ চলেছে। কার্যত *বিরস সংলাপ*ই কবির প্রকরণ-নির্ভর গ্রন্থ, পরের কাব্যগ্রন্থে বোধ করি তারই অনুবর্তন পরিলক্ষিত :

আমার চারপাশে মরা, আধমরা,
মানুষের কি পাহাড়, ইলেকট্রিক কাঁটা তার,
ওপড়ানো গাছ, ধ্বসে পড়া দেয়াল, পাজর ভাঙা
রাস্তায় ছড়ানো ছিটকানো ঝড়,

কিংবা,

হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস,
সংস্কারের দড়ি ছিঁড়ে
তুই ঝাঁপ দিয়েছিলে
নতুন পথে চাওনি ফিরে
... ...
ধরিয়ে দিলে রক্তের নেশা
তোমার পথই পথ আমারও

প্রতীক, চিত্রকল্প ছাড়াও বাক্যবিন্যাসে, distortion, inversion-এ আবুল হোসেন ব্যতিক্রমী, ত্রিশোত্তর কবিকুলের পরিবাহী। 'পিরামিড', 'মমি', 'মূষিক', 'হাওয়া', 'ঘোড়সওয়ার', 'স্বগত'—প্রভূতমাত্রায় আধুনিক অলঙ্কারে ভূষিত ও ব্যঞ্জিত। পূর্ণাঙ্গ সচেতন অর্থেই তা কাব্যপংক্তিতে বিরাজিত। কবিতার ছন্দের পরীক্ষাতেও একই ভাষ্য প্রযোজ্য। বাঙালি মুসলমানের হাতে এমন কাব্য-পরিচর্যা একদিকে যেমন সাহসী অন্যদিকে তেমনি অভিনব। *নব-বসন্তে*র রোমান্টিক রঙে কবি এখনও প্রীতিময় ও স্বতঃধার।

৩.

আবুল হোসেন বিশ্বসাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের কবিতা সম্পর্কে তার স্বকীয় চিন্তা ছিল। বাংলা একাডেমি থেকে বের হওয়া তার অনুবাদ *অন্য ক্ষেতের ফসল* সম্পর্কে কিছু কথা বলা যায়। অন্যরকম পরিচর্যার চাপ আছে

www.chinnofoundation.org

গ্রন্থটিতে। তিনি বলেছেন : 'বিদেশী কবিতা পড়তে গিয়ে যখন কোন কবিতা ভালো লেগেছে এবং মনে হয়েছে ওটা তর্জমা করে দেখা যায়, তখন সে কাজে হাত দিয়েছি। এই বইয়ের কবি ও কবিতাগুলো নির্বাচনের সূত্র এটাই। সেজন্যেই এই বইতে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে উর্দু এবং আভর ভাষার কবিতা ঢুকে গেছে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্য এস মিশেছে। ইংরেজ, মার্কিনী, ককেশীয়, পাকিস্তানী, সাদা-কালো ও তামাটে বসেছেন একই টেবিলে। এঁদের দেশ, বাষা, পরিবেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং ব্যবস্থা ভিন্ন।' খুব চমৎকার এই গ্রন্থটিতে রয়েছেন উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস, মুহম্মদ ইকবাল, রবার্ট ফ্রস্ট, এজরা পাউন্ড, টমাস স্টার্নস এলিয়ট, ল্যাংস্টন হিউজ, জন বারিম্যান, রসুল হামজটিফ। একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথার পর কিছু কবিতার নান্দনিক অনুবাদ করেছেন আবুল হোসেন। এ অনুবাদে কবির কবিত্ব চিহ্নিত। কবিভাষা নির্বাচনে নিজস্বরীতিই প্রয়োগ করেছেন, ইয়েটস এতে করে হয়ে উঠেছেন এদেশীয়, প্রাচ্যীয়– আধুনিক। একটু পরীক্ষা করে নিই, ইয়েটস-এর "For Anne Gregory" থেকে :

Never shall a young man,
Thrown into dispair
By those great honey-coloured
Ramparts at your ear,
Love you for yourself alone
And not your yellow hair.

এমন পংক্তির দুর্দান্ত অনুবাদ করেছেন আবুল হোসেন। আটপৌরে ভাষায়, নিরাভরণ ছন্দে তার প্রকাশরূপ এ গভীর এবং মহৎ প্রণয়বাঞ্ছিত :

তোমার কানের পাশে ঐ মধু-রঙের বিশাল দেয়ালগুলোয়
হতাশ যুবক কক্ষোনো ভালো-
বাসবে না তোমাকেই,
তোমার হলদে চুল নয়,
কেবল তোমার জন্যেই।

এমনি ইংরেজি কবিতায় এলিয়টের অনুবাদও বেশ আকর্ষণীয়। "জানালার ধারে সকাল"-কবিতার শেষ স্তবক থেকে তুলে ধরছি :

কুয়াশার বাদামি ঢেউগুলো সড়কের তলা থেকে
বাঙাচোরা মুখগুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে আমার দিকে
আর ছিঁড়ে আনে কাদাভর্তি স্কার্টপরা এক পথচারীর
অকারণ হাসি, যা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে
ছাদের কাছাকাছি এসে মিলিয়ে যায়।

www.chinnofoundation.org

মূলের কাব্য কাছাকাছি কিন্তু পুরোটাই আমাদের ঐতিহ্য ধরে উপভোগ করা যায়। এক স্বতন্ত্র বাকরীতি– যেটি *বিরস সংলাপ* কিংবা *হাওয়া তোমার কি দুঃসাহসের* মধ্যেও মেলে।

৪.

বাংলাদেশের কবিতায় আবুল হোসেন আদ্যন্ত আধুনিক। সে রীতিটি একপ্রকার নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। কবিতাকে ফর্মাল নয়, মানুষের নিকটে, প্রাত্যহিকতার করিডোরে পৌঁছে দিয়েছেন। সেজন্য শব্দ হয়েছে গভীর এবং বাকপ্রতীমায় তৈরি হয়েছে বাড়তি মাত্রা। 'বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রথম আধুনিক যে রীতিটি *নববসন্ত* দিয়ে শুরু হয়েছিল ত কোনোসময় সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়নি, দ্বিধান্বিতও নয়। হয়তো তিনি প্রভাবের দাপট আনতে পারেননি, পরের কবিদের চিন্তায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থৈর্য নিয়ে নিজের বিশ্বাসেই অটল ছিলেন। দীর্ঘ জীবনের যে জার্নি তাতে তার সম্মুখ প্রতীক্ষা ছিল– এ প্রজন্মের কবিদের নিয়ে। সে অভিজ্ঞতাটুকু অভিনব কিছু নয়, প্রত্যেককের চর্চার ভেতরেই তা আছে– সেটি অনেকেই এগিয়ে নিয়েছেন। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ এবং তার পরবর্তী অনেকেই। কবিতা তো পেছনের জিনিস নয়, মননের ভেতর দিয়ে চিরনবীনের পথ অবমুক্ত করবে, সম্মুখে এগুবো। সেটি তাঁর লেখায়ই আছে, অনুসরণীয় হবেন তিনি এভাবেই।

www.chinnofoundation.org

শামসুর রাহমান : বিচারবোধের স্বরূপে

কবিতা ও কবিতার বিচার যেমন স্থিরপাঠ নয় তেমনি বিচার করা যায় না তার স্থিরপাঠসূত্রও। সময়ের ভেতর দিয়ে তা পাল্টায়। স্পর্শ করে যায় চলমান দেশ-কাল প্রতিশ্রুত ব্যক্তির দ্বান্দ্বিক ভাবনাবিশ্বকে (thinking complex)। বিশ শতকের নিও-ক্রিটিসিজম সাহিত্যের তত্ত্বপাঠে দেখা যায় কবিতার বহুদর্শী ভাবনা, শব্দের নির্বাচনী সার্বভৌমত্ব, কল্পনার সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞার নৈর্ব্যক্তিক বিচারচিন্তা। এই তত্ত্ব, গত দশকে সাহিত্য সমালোচনার রীতি পদ্ধতিকে অনেকদূর সম্প্রসারণ করে দেয় এবং তার কিছু জ্ঞানও জনসম্মুখে প্রকাশ করে। এ পর্যায়ে নিও-ক্রিটিসিজম তত্ত্বটি আরও গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এর ভেতরেই আমাদের চলমান সৃজ্যমান ও মননশীল জগত আয়ুধ হয়ে ওঠে। এমনটি আমাদের ঘটমান বর্তমান টেক-বিশ্বেও যোগাযোগরীতিতে কায়েমী হয়ে উঠেছে। শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) ও তার কবিতার এ বিষয়ক চিন্তাসূত্র নিয়ে এখানে কিছু তুলে ধরা যেতে পারে।

২.

বক্ষ্যমান ইতিহাসের স্বরূপ ও বিচারবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা দিয়ে পাঠকের সামনে আনা যেতে পারে। কবিতাটির নাম "সেই বেতো ঘোড়াটা"। এটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থে আছে। কবিতাটির কিছু অংশের উদ্ধৃতি :

আস্তাবলে ফিকে অন্ধকার, ঝুলছে নিষ্কম্প স্তব্ধতা,
আর সেই বেতো ঘোড়াটা অনেকক্ষণ থেকে ঝিমোচ্ছে
নিঃশব্দ কোনো আফিমখোরের মতো,
... ...
আস্তাবলের সেই বেতো ঘোড়াটা নিমিষে
তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে উঠলো, আশ্চর্য এক ফুল হয়ে
জন্ম নিলো তার ইচ্ছা, শিরায় শিরায়
সঞ্চারিত হলো সে ফুলের সৌরভ।
চকিতে নোংরা নর্দমা হয়ে উঠলো অপরূপ সরোবর,
খড়-কুটো, ছেঁড়া ন্যাকড়া, থ্যাঁৎলানো ইঁদুর, ফুলের তোড়া মণিরত্ন হয়ে
ঝলসে ওঠের ওর চোখে, আর সে নিজে উড়ে গেলো
মেঘপুঞ্জে, নক্ষত্রগুচ্ছে, শূন্যের নীলিমায়।

'বেতো ঘোড়া' কে? কেন সে বাতগ্রস্ত, অসুস্থ? কল্পনার উৎসবে এই রঙীন বোতো ঘোড়া প্রকৃতঅর্থে কীসের প্রতীক! প্রশ্নটিকে নব্য-বাস্তববাদী তাত্ত্বিক আই. এ. রিচার্ডস কথিত সৃষ্টিশীল রহস্য ধারণা। যেখানে কবি সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসিত, কল্পনা

www.chirnfoundation.org

তার সার্বভৌমক্ষম। রোম্যান্টিক বোধের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে কবি 'বেতো ঘোড়া'টিকে ইতিহাসের স্বরূপে চিহ্নিত করেন। বাস্তব ইতিহাস তাকে গ্রহণ করে দূরাশ্রয়ে। এইটি যুগবোধের নিরিখে পরিচর্যায়িত। 'ঘোড়া' একটি সামন্তসজ্জা, ধন-মান-গর্বে সে আভিজাত্যময় কিন্তু সে আভিজাত্য লুপ্ত, রোগগ্রস্ত, বিনাশধৃত। তাই কল্পিত ঘোড়াটি বাতরোগগ্রস্ত– 'বেতো ঘোড়া'। এই ইতিহাসের স্বরূপ চিহ্নিত হয়, কবিতার কল্পনায়, কল্পোক্তিতে; লুপ্ত অধ্যায়কে চিহ্নিত করে। সমাজ-ধর্ম-দর্শন মিলিয়ে কবির স্বচ্ছন্দ কল্পনা তুলে আনে পরিত্যক্ত, রুগ্ন, অহম-খচিত বোতো ঘোড়াটিকে অবলম্বন করে। এখানে এই ঘোড়ার প্রাণী-সৌন্দর্য, নান্দনিকতা, বিরাটত্ব, অহম্প্রয়াস এক উজ্জ্বল অতীতে টিকে থাকলেও এখন তা রুগ্ন-ভগ্ন-অসুস্থ। সে কারণে তার আস্তাবল ফিকে, অন্ধকারময়, দুর্বিষহ– নিস্তব্ধও (নেশাগ্রস্ত আফিমখোরের ন্যায়)। একপ্রকার ঝিমুনিও তাতে বিদ্যমান। এই ঘোড়াকে এভাবে কল্পোক্তিময় করে একটি তথ্য পাঠকের কাছে অবমুক্ততা পায়। ঘোড়া সুস্থ নয়। কিন্তু অসুস্থ ঘোড়ার ঘোড়া-নামাঙ্কনে কী আরও কোনো কারণ থেকে যায়? আমাদের নির্জ্ঞানস্তরে 'ঘোড়া' কোনো যৌন-জুগুপ্সারূপেও চিহ্নিত কি-না! সে তো একটি ইমেজ– আবেগোদ্দীপক প্রবাহের রঙীন রূপকল্প। প্যারাডাইমও বটে। অতীত থেকে সে বেরিয়ে পড়ে। অবক্ষয়িত বাস্তবতা থেকে সে পরিগণন পায় অন্য উপলক্ষ্যে। তার ঘোর কেটে যায়। কেশর ফুলে ওঠে। যৌবন-প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। বহুস্তরে ধৃত হয় তার অর্থ। বেতো ঘোড়া কল্পনার প্রলুব্ধতায় হয়ে ওঠে মেঘপুঞ্জ, নক্ষত্রগুচ্ছ। সে উড়তে থাকে জ্যোৎস্নায়, শূন্যের নীলিমায়। আশ্চর্য এ আকাশবিহারী শূন্যতার কল্পনা। কিন্তু এ কি নিছকই রোম্যান্টিকতা? তা নয়। দুটো বিষয় যেমন নৈতিক ও মানবিক ধারণার পরিচর্যায় প্রলুব্ধ এই কবি। সেখানে আবেগ এক অমোঘ শক্তিপিণ্ড। ভাষার ভেতরে যা শৃঙ্খলিত। অনেকরকম প্রয়োজনে যা আয়ুধরূপে সমুপস্থিত। এটি নিও-রিয়ালিস্টদের এক ধরনের ব্যাখ্যা। যেখানে আবেগ বা ইমোটিভনেসই মুখ্য।

৩.

অন্য কবি থমাস স্টার্নস এলিয়ট ও ইমেজিস্টপ্রবণ কবিগণ কবিতায় আলাদা আখ্যার কথা বলেন। এঁরাও নিও-রিয়ালিস্ট প্রবণতার। মহৎ কবিতায় তাঁরা নিরাবেগের কথা বলেন। যেটি এলিয়টীয়– গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, 'অবজেকটিভ কোরিলোটভ' বা বিষয়-সংকেত (বহিরাশ্রয় সংশ্লেষণ পদ্ধতি)– যেখানে যে 'বিশেষ আবেগে' কবিতা স্বয়ম্প্রকাশিত, তা হলো উপমা-চিত্রকল্পের বস্তু বা পবিবেশগত সংকেত– যা স্নায়বিক অনুভূতির মাত্রা হিসেবে পুনর্গঠিত। 'Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; It is not

www.chinafoundation.org

the exprision of personality, but an escape from personality. But, of course only those who have personality and emotions know what it means want to escape from these things.' কবিতার এ রূপটিও আমরা শামসুর রাহমানে পাই। বিচারবোধের ভিত্তিতে কবিতা মেদহীন, কঠিন আর পৌরুষদীপ্ত হয়ে ওঠে। পুরাণ তখন নতুন তাৎপর্যবহ :

পিতা আমি, তাই সন্তানের আসন্ন বিলয় জেনে
শোকবিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ পাখির মতন দিশেহারা;
শিল্পী আমি, তাই তরুণের সাহসের ভস্ম আজ
মৃত্যুঞ্জয় নান্দনিক সঞ্চয় আমার।

ডেডেলাস বিরুদ্ধ সময়কে, অন্ধ-তমসাকে, ইন্দ্রিয়জ স্পন্দনে স্তম্ভিত সত্যে প্রকাশ করেন। এ আখ্যান-কথন কাঠিন্যময়, অনেকান্ত-প্রান্তস্পর্ধী। ডেডেলাসের সমস্ত কষ্ট যেন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে। একাত্ম হয়ে যায়। এ রীতিতে ভয়াবহতা আবেগময় হয় না, কঠিনতা পায়। আবেগময়তা নিঃশেষিত হয় প্যারাডাইমে। গভীর গভীরতম ভীতির জন্য ভাষা পৌঁছয় নিজ্ঞানস্তরে, যেখানে প্রচুর রহস্য আর আকাঙ্ক্ষার প্রত্নচোখ নির্বাসিত। অতলে শেকড়ের এই যোগাযোগ সম্পন্ন করতেই প্রতীকী ইমেজ এক সূত্র খুঁজে পায়। স্মর্তব্য, আবেগের বিপরীতে বুদ্ধি ও মেধার যুক্ততার পারম্পর্য নির্ণয়ে এ রীতি উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে 'ইকারুশের আকাশ' অভিধায় পাঠসূত্র হয়েছে। নিশ্চয়ই এর ভেতরে চলমান সমাজবাস্তবতার সূত্রও আছে। যেভাবে *দ্য ওয়াস্ট ল্যান্ড*-এর পংক্তিমালায় বিশ্বযুদ্ধের বাস্তবতার ক্ষরিত রূপ নির্ণীত বা উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস-এ মিথ পুনর্নির্মিত আর তত্ত্বে কিং ফিশার লেখেন *মিথলজি*– যেখানে জন্ম-মৃত্যু বা পুনর্জন্মের বয়ান সাধারণীকৃত– তা তো শামসুর রাহমানেও পরিতুষ্টতা পায়। রাহমানের মিথ যেমনটা টেলিমেকাস, হ্যামলেট, আফ্রোদিতি, নূহের জাহাজ, এ্যাকিলিস অভিধায় কার্যপ্রাপ্ত। ইকারুশ ও ডেডেলাস এ সময়ে পুনর্নবায়িত। সম-ভাবে 'নিষেধ' বা 'অমান্যতা' এক কূটাভাসে বন্দী। বস্তুত কবি মিথ বা ইমেজ গড়েন তার প্রতিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতায় নির্মিত সৃষ্টিশীল আবেগের আকরের ভেতরে। একাত্তর-উত্তর সময়ে রাহমানের স্বপ্নভঙ্গ, অবক্ষয়, বিনাশী চিন্তা কিংবা ব্যক্তিগত ক্লেশ-ক্লান্তি অনেকভাবে গড়ে দেয় তার কৃতি : 'হরিৎ প্রান্তরে জেব্রার মতো ধাবমান বাতাস', 'প্যারিসের আকাশে ভায়োলিন হাতে উড়ন্ত ইহুদী' কিংবা নিম্নোক্ত পংক্তিমালা :

ওরা ঘুমিয়ে আছে, ওদের ঘুমোতে দাও।
ওদের কবরে এখন গজিয়ে উঠেছে ঘাস,
যেমন যুবকের বুকে ঘন রোমরাজি।
ওরা ঘুমিয়ে আছে আমরা জেগে থাকবো ব'লে।

www.chinnopoundation.org

স্বল্পবাক্যে, প্রত্যক্ষত, অবধারিত, স্পষ্ট, দৃঢ়। নিও-ক্রিটিকদের যে ধারা আমাদের কবিতায় তিরিশ থেকে শুরু হয়েছিল, তা-ই রাহমানে আরও প্রকটিত ও অভিব্যক্তময়। চেতনার দ্বন্দ্বময় ধারাটি প্রবহমান ও সময়-ক্ষেপনে উতরোল। নিও-ক্রিটিক ধারার লক্ষণসমূহ এলিয়টিয়, এখানে আছে : স্বগত ভাষণ-একক সংলাপ-মনোলগ ('আমি'), ধ্রুববাক্য ('এ-শহর টুরিস্টের কাছে পাতে শীর্ণ হাত যখন তখন,/ এ-শহর তালিমারা জামা পরে, নগ্ন হাঁটে খোঁড়ায় ভীষণ', উল্লেখপরায়ণ, উল্লম্ফন প্রভৃতি।

৪.

রাহমানের কবিতা যে নব্য-বাস্তববাদী তত্ত্বের আলোয় চকিত চিনে নিচ্ছিলাম– সেখানে আরও অনেক জ্ঞানতত্ত্ব যুক্ত করা সম্ভব। বিশ শতকের উত্তর-উপনিবেশ চিন্তা, নারীবাদী চিন্তা, মার্কসবাদী ধারণা, অস্তিত্ববাদী-প্রতীকবাদী ধারণা প্রভৃতিতে। তবে এসব ধারণা একটির ভেতরেই বহুমুখী রূপ রচনা করেছে। উত্তর-উপনিবেশ চিন্তায় কলোনি বা উপনিবেশ-উত্তর ধারণাটি যখন ব্যাপকভাবে রাহমানের কবিতায় আসে তখন অপরতা বা স্যবলটার্ন চিন্তা, যেখানে শ্রেণিচেতনা, উগ্র-শ্রেণিবিচ্যুতি, ভাষার মুক্ত এলাকা (free play) সৃজন নিয়ে কাজের সুযোগ থাকে। এবং তাতে করে কবিতা পায় ভিন্ন টেক্সট। উপর্যুক্ত দুটি সমালোচনায় ['emotive', 'objective co-relative']-এর বাইরেও শামসুর রাহমান তার কবিতায় যে সামাজিক-রাজনৈতিক সীমানাসমূহ নির্দিষ্ট, তাও যুগোপযোগী জ্ঞানচর্চায় অবহেলিত গৌণ নয়। প্রসঙ্গত উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তায় *বন্দী শিবির থেকে* কাব্যে সংযোগ করেন ভিন্ন মাত্রা। শুধু এই একটি কবিতাগ্রন্থই নয়, *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা* কিংবা *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়*-এ কর্তৃত্বের বিপরীতে উঠে আসে সাধারণ মানুষের মর্যাদা। আর মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই শুধু নয় রাষ্ট্রীয় অধিকারের বলয়ে নিয়ে আসেন দৃঢ়প্রত্যয়। বর্ণ-শ্রেণি-বিত্তের অর্থজ্ঞাপক ধারণা ভাষা-চিহ্নে মুক্তএলাকা নির্ধারণপূর্বক উগ্র শ্রেণিচ্যুতি ঘটিয়ে দ্বৈত-বৈপরীত্যে আনে নতুন অর্থে। সেখানে 'নূর হোসেন' হয়ে ওঠে গণ-জনতার প্রতীভূশক্তি। বাংলাদেশ নূর হোসেনের একক চেতনায় সমস্ত মানুষকে এক হয়। যেভাবে আসাদের শার্ট, সফেদ পাঞ্জাবী জনতার সারিতে উঠে আসে : 'গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সুর্যাস্তের/ জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট/ উড়ছে হাওয়ায় নিলীমায়।' কর্তৃত্বের এমন সংঘশক্তি পরিবর্তিত চেতনায় অবহেলিত মানুষের প্রেম, আবেগ হয়ে ওঠে সৃজনশীল। সৃষ্টি হয় নতুন চেতনাকাঠামো (paradigmic)। শামসুর রাহমানের কবিতার সাহিত্য-সমালোচনা চিন্তার মার্কসবাদ, নারীবাদ তত্ত্বের ধারণাও একই প্রবণতায় চিন্তাসূত্র রচনা করে।

www.chinnofoundation.org

‘বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে’ কিংবা ‘স্বাধীনতা তুমি’ কবিতার ভেতরেও পুনর্গঠিত হয় মিখাইল বাখতিনকথিত ‘কার্নিভাল চেতনা’। শোষণ বা কর্তৃত্বের বিপরীতে নিম্নবর্গীয় জনতার শ্রেণিভিত্তি প্রতিষ্ঠার উৎসবে গড়ে ওঠে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংস্কৃতির ভিত্তি। শ্রমজীবীর শ্রেণিমর্যাদার বিচ্যুতির মতো নারীরও ঘটে স্থানচ্যুতি। সূর্য পুরুষ হলে নারী চাঁদ, আলো যদি হয় পুরুষ অন্ধকার নারী, পুরুষের স্থান উপরে হলে নারীর নীচে– এমন ভাষিক যুগ্মবৈপরীত্যে নারী অবহেলিত। নারী পুরুষের সহজাত হয়ে ওঠে পুরুষ কর্তৃত্ব থেকে। কেট মিলেট বা সিমন দ্য বোভেয়ারের তত্ত্বে নারীর মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবোধটি ব্যাপকভাবে সাহিত্যে আসে। আর সেটি রাহমানের কবিতাতেও যুক্ত করে স্বতন্ত্র স্বর। নারীর বিচ্যুতির, শ্রেণিমর্যাদার প্রশ্নটি তৈরি হয়, বিভিন্ন ইমেজের প্রতীকায়নে।

৫.

এভাবে শামসুর রাহমানকে সাম্প্রতিক সাহিত্যতত্ত্বের বিবিধ মাত্রায় বোঝাপড়ার সুযোগ আছে। এখানে চকিত কিছু আলোচনার সূত্রপাত মাত্র। কিন্তু ষাটের কবি শামসুর রাহমান, আমাদের সম্মুখে ক্রমশ ক্রম-বলয়িত যে উপত্যকায় প্রকাশিত, তা কবিতার জন্য, কবিতার ভেতর দিয়ে এদেশের ভাষা-সংস্কৃতিকে চর্চিত করবার জন্য; এক উপভোগ্য সামষ্টিক জীবনধারায় আয়ুধরূপে অভিষিক্ত, বলা যায়। তবে সেটি শুধু ‘প্রধান কবি’র অভিধায় নয়, এ ভূখণ্ডের মাটিবর্তী মানুষের দ্বন্দ্ব ও অনিবার্যতার কর্ম-প্রকল্পনার গুণে অধিক উচ্চতায় অভিনন্দিত। সেখানে তিনি সর্বার্থে নবীন, চিরনতুন। প্রজন্মান্তরেও উপভোগ্য। এইরূপেই তিনি আটকান, আমাদের ইতিহাসের স্বরূপে এবং বিচারবোধের সারসত্যে। ##

www.chinofoundation.org

কাদরীর কবিতা

শহীদ কাদরী মারা গেলেন মাসখানেক আগে। 'ঈশ্বর পরিত্যক্ত' প্রবাসে কাটিয়েছেন অনেকটা সময়। কিন্তু সে কৃত্রিম সময় ফেলে শেষ পর্যন্ত দেশের মৃত্তিকাকেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতো করেই এদেশের নাগরিক সমাজ তাঁকে অভিবাদিত করেছে। কিন্তু তাঁর অভিবাদন মহাকালের পীঠে সমুত্থিত মাত্র চারখানা কবিতার বই দিয়ে। এ চারখানা পুস্তকেই যেন তিনি ঢেলে দিয়েছেন প্রণীত জীবন। আর তাতেই পূর্ণাঙ্গ স্বর প্রতিধ্বনিত। গৃহীত জীবনের সব বারতা প্রতিষ্ঠিত। কবিতা সম্পর্কে প্রিয় টি. এস. এলিয়ট বলেছিলেন : 'Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion, it is not the expression of personality, but an escape from personality. But, of course, only those who have personality and emotions know what it means to want to escape from these things.' এই 'escape' কে কীভাবে ধারণ করেন কবি– কী তাঁর প্রত্যয়! শহীদ কাদরী সম্পর্কে এলিয়ট-ধৃত সংজ্ঞা একদম যেন মিলে যায়, আনখাগ্র যখন তিনি খুব দুঃসময়ে আমাদের কবিতাসমাজে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পদপাত ঋজু এবং শক্ত, ভীষণভাবে তা গভীরেও প্রোথিত। আধুনিকতার অনেক রঙ তিনি গ্রহণ করেছেন– নির্বিবাদে, নিঃসংকোচে। সে কারণেই তাঁর 'Rhythmical language, figures of speech, stories and dramatic situations, and so on...' পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছে কবিতায়। *উত্তরাধিকার* (১৯৬৭), *তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা* (১৯৭৪), *কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই* (১৯৭৮) আর *আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দিও* (২০০৯)– কাব্যগ্রন্থে তিনি ষাটের কবিতার নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। প্রশ্ন আসে এই প্রেরণার উৎস কী? 'Vivid and recognizable impression of some natural scene or natural object–a register, rendered as accurately as the poet could manage, of the impression he himself had received through his senses, or had imagined.'—এ লক্ষ্যেই শহীদ কাদরীর অপার মুগ্ধতা।

২.

কবিতার ট্র্যাডিশন কী? ষাটের দশকে একখানা *ক্লেদজ কুসুম* বা *নরকে একটি ঋতু* কাউকে কবি হিসেবে তৈরি করেনি কিন্তু প্রেরণার উৎসে ছিল। বাংলা ভাষার ইমেজ সৃষ্টিতে উজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু কোন ইমেজ? 'সুগোল তিমির মতো আকাশের পেটে/ বিদ্ধ হলো বিদ্যুতের উড়ন্ত বল্লম/ বজ্র শিলাসহ বৃষ্টি বৃষ্টি : শ্রুতিকে বধির করে/ গর্জে ওঠে যেন অবিরল করাতকলের চাকা/ লক্ষ লেদ

www.chinnefoundation.org

মেশিনের আর্ত-অফুরন্ত আবর্তন'। অর্থটি কী দাঁড়াল? প্রথমেই শহুরে বৃষ্টির বিপুল আয়োজন দৃশ্যমান হয়। তাতে কোনো দেবদূতের (ইস্রাফিলের) ইঙ্গিত আছে। তার সিঙ্গারে ঘটে চলেছে চাক্ষুষ এ বর্ষণ। অতঃপর মুসলিম মিথে ভরে ওঠে লক্ষ্যনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক যুক্তি। তারপর কল্পনার প্রবাহে নির্বস্তুক বৃষ্টিকে নাগরিক বস্তু-উপাদানে 'করাতকলের চাকা' কিংবা 'লেদ মেশিনের আবর্তনে' বসিয়ে দেন। ওতেই লুক্কায়িত আছে বৃষ্টির শব্দের ঘ্রাণ চকিত হয়। সিনেসথেসিয়া-প্রতীম ইমেজে আরও যুক্ত হয় শ্রুতিগ্রাহ্য ইমেজের সঙ্গে দৃশ্যগ্রাহ্য ইমেজের যাতায়াত। তখন তুমুল টেরসা বৃষ্টি হানা দেয় মোটরের বনেটে– তা ময়ূরের মতো বর্ণাভাময়, বেসামাল করে দেয় ঝলমলে এভিন্যুকে। ক্রমশ 'Accumulation of detail' এবং 'By the sharpness of selected detail'-এ কবিতার ছন্দে আলাদা চরণে বলেন :

ত্রাস আর উৎকণ্ঠায় হঠাৎ চমকে
দ্যাখে, – জল
অবিরল
জল, জল, জল
তীব্র, হিংস্র
খল

'জলে'র চরিত্রটি এভাবে ধরা পড়ে। কিন্তু জল কী করে খল হলো? তার নান্দনিক ব্যাখ্যা আছে 'By the sharpness of selected detail'-এ। বিদ্রূপের ভেতরে শেষ স্তবকে এসে দেখা যায় নগরের সব কর্ণধার পালিয়ে গেলে সে নিজেই সমুত্থিত 'প্রভু'তে পরিণত হয়। নূহের প্রত্ন-প্রতীমায় সে শহরেই সমাসীন। কিন্তু কোন শহর? "বৃষ্টি, বৃষ্টি" অসামান্য কবিতাটিতে যে বিবরণে শহর অঙ্কিত হয়েছে– তা তুচ্ছতা ও দৈনন্দিনতায় ভরা। শুধু বস্তু নয় ব্যক্তি তথা রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও আছেন। সেটি যাই হোক, স্ফীত শহর, অমানবিক শহর, বৃষ্টি যে শহরকে শাসায় শ্রুতিমধুরতার পরিবর্তে কর্কশ লেদ-কলের শব্দে– সেখানে যখন মোসাহেবরা পালিয়ে যায় তখন বিপরীতে লক্ষ্মীছাড়া-উন্মূলদের রাজত্বই প্রধান হয়। এসব সত্য অক্ষরপ্রসব পাশ্চাত্য অভিধাব্যঞ্জিত– কিন্তু কিছুতেই তা আরোপিত নয়। ইলেকট্রিক তার বা বুড়োসুড়ো সাইনবোর্ড দৃশ্যমান ইমেজে অবক্ষয়ের অর্থকে প্রাণ দেয়। কবির অন্য কবিতা, বেশ পরে লেখা "বালকেরা জানে শুধু"– দুর্দান্ত এ কবিতায় দার্শনিক বুদ্ধির খেলা রয়েছে। লাল-নীল-সবুজ মার্বেল, মূর্খ বালক, আর সাজানো পরী বিপরীতে তারাই হয়ে যায় নিয়মের জালের পারমাণবিক বোমাসদৃশ্য ডিম। পূর্ণ নাগরিক অভিপ্রায়টি বিশেষ প্রবণতায় শহীদ কাদরীর কবিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিত্বটি চরণবন্দী হলে স্বীয় ঐতিহ্য ও অর্জিত পরম্পরা অবলম্বনপূর্বক নাগরিক উপাদান স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত হয়। মর্ম-

www.chinnofoundation.org

উদ্ধারে অনির্বচনীয়তায় যেটি মেলে তা হলো মূর্খ বালকের স্মৃতিময় মার্বেল– যে কি-না সুদূরের প্রপিতামহ, তার অন্য রূপ ভৌতিক রূপবন্ধে আবদ্ধ– এই লিংক চরম বাস্তবতায় পরমাণু বোমার নৃশংসতাকে ইঙ্গিত করলো। এই বৈপরীত্য কবিতায় আলাদা ব্যক্তিত্বে প্রকাশিত। জ্যোৎস্না কিংবা বৃষ্টি ঠিক সদর্থকতা থেকেই কদর্থতায় পৌঁছায়। "ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায়" কবিতাটিতে 'ব্ল্যাক আউট অমান্য করে তুমি দিগন্তে জ্বেলে দিলে/ বিদ্রোহী পূর্ণিমা।''তুমি' নামক স্বদেশ poetical work-এর ভেতর দিয়ে ভিন্নতর বিস্তৃতি পায়। স্বদেশ আর রাষ্ট্র ('রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট্ রাইট্ লেফ্‌ট্') সমার্থবাহী নয়। তিনি তাঁর ব্যাখ্যা দেন : 'তোমার উন্মুক্ত প্রান্তরে/ কাতারে কাতারে কত অচেনা শিবির, কুচকাওয়াজের ধ্বনি, যার আড়ালে তুমি অবিচল, অটুট, চিরকাল।' এই প্রবণতাটিতে লক্ষণীয়– ক) বিশ্বময় নাগরিক জীবনচিত্রের যে সমারোহ তা কৃত্রিম ও শৃঙ্খলার শেকলে আটকানো, খ) প্রত্ন-স্মৃতি, অকৃত্রিম জীবনস্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে পরিবর্তিত সভ্যতা– যা নাগরিকতার ভেতর দিয়েই প্রতিশ্রুত, গ) কুণ্ডলীকৃত জীবন তো মানবসত্য নয়– তাতে আছে পিস্তল-খুনোখুনি আর দূরে ঠেলে দেওয়া– সেখানে জ্যোৎস্নাও ঘোলাটে, বৃষ্টিও করাতকলের আওয়াজ, ঘ) ক্ষমতা-সন্ত্রাস-জরা-শোক পরাস্ত হতে পারে প্রিয়তমার প্রেম তথা মানবসত্যের কাছে। এ বিষয়গুলো কবি বিশুদ্ধতার ভেতর দিয়ে চরণে গেঁথে দিতে সক্ষম হন। তাতে প্রকাশ্য নয় বরং অপ্রকাশ্য ইঙ্গিতময়তাই 'ভালো কবিতা'র জন্ম দেয়। "যুদ্ধোত্তর রবিবার" কিংবা "পাখিরা সিগন্যাল দেয়" অন্যরকম কবিতা হলেও এর মেসেজ প্রায় একই। কিন্তু শব্দার্থের সৃজনকৌশলে এর কৃত্য আলাদা। উদ্ধৃতি :

ক) চেকপোস্টের কাছে দীর্ঘ কিউ– নতমুখে দেহ-তল্লাশির পর
দোকান খুলবে কেউ, আপিস পাড়ায় যাবে কিম্বা ফিরবে ঘর।
মাথার ওপরে শুধু ক'টা পাখি উপেক্ষা করছে সব মানা
অসম্ভব স্বাধীনতায় আকাশে উড্ডীন দেখি
আইডেন্‌টিটি কার্ডহীন ডানা ॥

খ) এয়ারগান ঝুলিয়ে কাঁধে কুচকাওয়াজের মনোরম ভঙ্গীতে
দুপুর বেলাকে যেন নিষ্প্রদীপ মহড়ার নিরালোকে দিয়ে ঘিরে
ছেলেরা খেলছে রবিবারে; সুপুষ্ট শজীর মতো তাদের
সতেজ শরীর থেকে ছলকে পড়ছে কৈশোর, মাঠে, ঘাসে,
গাছ থেকে পালাচ্ছে পাখিরা। কণ্ঠের অন্ধকার থেকে
উড়ে গেলো কয়েক স্কোয়াড্রন মিগ-১৭'র ঝাঁক।

শব্দকে কোনো নির্ধারিত ঐতিহ্যে আটকে রাখেন না কবি। নাগরিক বৈশিষ্ট্য বোধে বিস্তার হয়ে জটিল-তরল কিংবা সহজ-কঠিন সীমার ঊর্ধ্বে নতুন অভিমুখ প্রতিশ্রুত করেন। 'চেকপোস্ট', 'এয়ারগান', 'স্কোয়াড্রন মিগ' শুধু এই নাগরিক কণ্ঠ নয়,

www.chinnofoundation.org

পরিশুদ্ধ অনুভবের পরত বিকিরিত করে ওই শব্দসমূহ সামগ্রিকতায় মিশে যায়। স্বীয় অর্থ বহন করে। ইমেজ পুনর্গঠিত করে। বোধের সীমাকে অধিকতর বিছিয়ে দেয়। সর্বরকম প্রথাকে দূরে ঠেলে নতুন সারার্থ খোঁজে। পাখির ডানা যখন আইডেনটিটি কার্ডের পরিচয়ে ওড়ে– তখন তার সীমানা বা শৃঙ্খলা নির্ধারিত, সেটি বিপ্রতীপ বর্ণ পায়– পাখি স্বভাবের বিপরীতে পরাধীনতা বা কৃত্রিমতায় আবক্ষ– সেই পরিবেশটিতে মানুষের পরিণতি কী? পাখি-স্বভাবের 'ডিসটর্সন' দিয়ে চেকপোস্টের কিউ, দেহতল্লাসির পর নিজের দোকান খোলার পারমিট– ব্যক্তিসর্বস্বতার প্রতীকী সাদৃশ্য– কিন্তু তা আরোপিত নয় বরং স্বতশ্চল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পূর্ণিমাময়। ডানায় আরোপিত হয়েছে নাগরিক নীতি– যা তথাকথিত ও আধুনিক। চেতনের ওপর অচেতন আরোপটি 'প্যাথেটিক ফ্যালাসি' পর্যায়ের। কিন্তু কবিতার জন্য শহীদ কাদরীর হাতে গড়ে উঠেছে বিচিত্র সব প্রাত্যহিক উপাদান। সেখানে ছলকে পড়া কৈশোর সুপুষ্ট সজীর মতো অপরিমেয়-অতুল্য কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে যায় পাখিরা। এভাবে কবিতার প্রাসাদ মুখরিত প্রত্ন-ময়দান গড়ে তোলেন কবি। এটি ভিন্নতর। কালখণ্ডেও নতুন। স্মর্তব্য করি জীবনানন্দকে : 'প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনাপ্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট হয়– এমন একটা অপরূপ সঙ্গতি পায় যা তাঁর কবিতায়ই সম্ভব– অন্য কারু কবিতায় নয়।' কবি-প্রবণতায় কাঠের অন্ধকার আর স্কোয়াড্রন মিগ-১৭ ইমেজিক সাদৃশ্যে ঘিরে ফেলে– তারপর চেতনার আরও বিস্তারণ ঘটে। এই প্রবণতা অভিজ্ঞ ও আস্বাদময়। "প্রেমিকের গান" কবিতাটি পুরোটা পড়ে দেখতে চাই, তাতেও শহীদ কাদরীর অন্তর্দৃষ্টির অনুবাদটি চোখে পড়বে :

ধনুকের মতো টংকার দিল টাকা
তোমার উষ্ণ, লাল কিংখাবে ঢাকা
উজ্জ্বল মুখ যেনবা পয়সা সোনালি রূপালি তামা

পরপর দেখি বেজে চলে যায় নিত্য
পরিবর্তিত তোমার মুখের সারি
দেখেও দেখি না চিনি তবু বিদেশিনী

প্লাটিনাম সে কি দস্তা কিংবা তামা
নাকি সে নকল তারা
মঞ্চের কালো পর্দার পর রূপার চুমকি তুমি

মনে হয় যেন বার্মা টিকের নতুন পালিশ,
সেগুন কাঠের ওয়ার্ডরোব
গিলে খাবে বুঝি পৃথিবীর সব

www.chimofoundation.org

সোনালী, রূপালি শাড়ি
ওগো কি সূক্ষ্ম তোমার চিকন ক্ষুধা
স্যাটিন কিংবা শীফন ব্যতীত সোনামুখ যেন তামা

ভয়াল, হিংস্র তোমার মুখের সারি
লৌহ কঠিন বিশাল উদর খোলা যেন সিন্দুক
ভরে দেবো সোনাদানা ॥

বিষয়টিতে প্রেথিত ভাবনা টাকা-অর্থ-পণ্যে এঁটে নেওয়া। অতঃপর সেই কবিভাবনা লক্ষ্যরূপ প্রতিভার সংযোগে ঋজু মননের উত্তাপে গ্রহণীয়তা পায়। কীভাবে? আহৃত প্রচুর উপমা ও ইমেজগুচ্ছে। কিন্তু তা তৈরিতে নাগরিক সীবনসমূহ নতুন অর্থের উজ্জ্বলতা নিয়ে ইন্দ্রিয়সম্পাত রচনা করে। তাতে পেটি-বুর্জোয়া সমাজের চিত্রায়ণ গুরুতর ভাবনায় প্রশ্রয় পায়। আর জানান দেয় কৃত্রিম কঙ্কালে অলঙ্কারের সংবাদ। সেখানে পণ্যায়িত নারীর সচিত্রতা বিষয় হলে– যে শব্দার্থে তা আটকায় তা পদার্থময় এবং এই পদার্থময়তা ইমেজগ্রাহ্যতা পেলে তার দার্শনিক পাদপীঠ গড়ে ওঠে। কবিতার ভিত্তিটি ওতেই ধরা পড়ে। তবে প্রত্ন-ধারণায় 'সিন্দুক', 'কিংখাব' সনাতনী হলেও ঐতিহ্যানুগ এবং দূরাভিসারী বর্ণিল উৎসব। সে উৎসবের গাত্রে শাশ্বত নারীর আগুনরূপ গুঞ্জনময় থাকে। চির অভিপ্রায়ে তারা সোনার অলঙ্কারে সৌন্দর্যময় ও লাবণ্যমুখরিত। নহবতখানার আওয়াজে চিরসুগন্ধীময়, যৌনআবেদনে ভারাতুর। জীবনানন্দের সুচেতনা, সুরঞ্জনা কিংবা বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতী এরা কারা! শহীদ কাদরী সেই নারীদের মুখের সারি অবলোকন করেন– তাদের আলঙ্কারিক রূপ, জমানো অর্থ, সিন্দুকময় সোনাদানা সবই আবার ফিরে আনতে চান কিন্তু তা তো আর আগের মতো নেই। সেই পৌরাণিক-প্রত্নমুখ তো এখন শীফন-স্যাটিনে আটকানো, মুখবর্ণও এখন তামাটে। ধ্বস নেমেছে শরীরে-মনে। সেই কিংখাবী-ঐতিহ্য নাগরিক ছায়ার কৃত্রিমতায় ভয়াল ও হিংস্র। কবি সেই বিবরণী অঙ্কন করেন, ব্যর্থ মনুষ্যত্বের কষ্টকে কিছু উপাদানে তুলে আনেন কিন্তু কী তার দাম সে প্রশ্নটি করেন না– গোপনেই রেখে দেন। ওয়ার্ডরোবের আড়ালেই তা থাকে। সেই তো চির প্রেমিকের গান। শহীদ কাদরী এই চিরায়ত সুধা তার কবিতায় বুনে দেন। "পরস্পরের দিকে" কবিতাতেও অন্যরকম রসায়ন গড়ে ওঠে প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে। প্রথম স্তবকেই সূচনা, উভয়ে অন্ধকারে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে, নীরিক্ষণে ব্যস্ত। গভীর আলোড়ন গড়ে উঠতে চায়, কিন্তু পরিবেশ তো অন্ধকারময়। প্যাঁচার তীব্রতায় তার স্বরূপ স্পষ্ট হয়। কিন্তু এক পর্যায়ে এসব প্রতিকূলতা পরিবর্তিত হয়, রূপান্তর পায় ইন্দ্রধনুতে (বস্তুত মানাত্মার শর্ত বলে কথা), ক্ষত-ক্লেদ-খণ্ড খণ্ড

www.chinmofoundation.org

দৃশ্য বা জ্বলন্ত চাঁদ সব আসলে খেয়ে ফেলে আমাদের অনেককালের প্রেম, সংবর্তের ভেতরে এখন মগ্ন উৎসব– তাতে সবকিছুই হয় কিন্তু স্থায়ী তৃষ্ণাটুকু পাওয়া যায় না। হাজার করাঘাতেও তা মরমে পশে না। এরকম 'বিশেষ কুশল' জানা গেলে শহীদ কাদরী যা চেয়েছেন– তা পাননি। হারানোর বা লাভ করার গরিমা নয়, মননের মহৎ চরিতার্থটুকু পাওয়ার জন্যই তো এতো মন-নির্মন দ্বন্দ্ব। সেইটিই কবি স্থির ও স্পষ্টতার প্রত্যয়ী ও কাম্য করেছেন।

৩.

আরও কিছু কবিতা পড়ে তার রুচি-বুদ্ধির সংক্রমণটি অনুধাবন করা যাক। এ প্রয়োজনে শরণ নেওয়া যেতে পারে দার্শনিক আই. এ. রিচার্ডস-এর *Four Kinds of Meaning*-এর Sense, Feeling, Tone and Intention... 'Finally apart from what he says (sense), his attitude to what he is talking about (feeling), and his attitude to his listener (tone), there is the speaker's intention, his aim (conscious or un conscious)- the effect he is endeavouring to promote. খুঁজতে চাই, গহণ কোণের সম্বিৎ। *কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই* থেকে "আজ সারাদিন" কবিতাটি কানে নিই, অতঃপর মুকুরে যুক্ত করি ইন্‌টেনশান : কবির 'আমি' আমার হয়ে যুক্ত হয়ে 'বাতাসে', 'পাখি'তে (শালিক), 'বৃষ্টি'তে 'অপরাধী' হয়ে একসময় সে পৌঁছে যায় নদীতে– সেখানে সে এক 'প্রোটোটাইপে'র সন্ধান পায়– 'প্রাচীন বুড়ি'-রূপী তার রূপ। সেখানে গড়ে ওঠে অসংখ্যা পুচ্ছ ধ্বনি। ধেয়ে আসে বাজনা। সে বাজনা কীসের বা কার? সে নৌকোর পাল খোলে, স্টীমারকে তীরে ভেড়ায় আর আত্মস্থ করে প্রেম, স্মৃতি, শস্য, শয্যা, গৃহ। কেন্দ্রীয়ভাবে এর সবটুকু নিয়ন্ত্রণ করে 'শালিক'। প্রবণতাটি এরকম :

ঐ শালিকের ভেতর উনুনের আভা, মশলার ঘ্রাণ।
তোমার চিবুক, রুটি ও লালচে চুলের গন্ধ,
ঐ বৃষ্টির ফোঁচার মধ্যে পাতা আছে তোমার
বারান্দার চেয়ারগুলো
তাহলে তোমার কাছে গিয়ে আর কি হবে।

আজ সারাদিন একজোড়া শালিক
গোয়েন্দা পুলিশের মতো
বাতাস একটা বুনো একরোখা মোষের মতো
আমাকে ধাওয়া করে বেড়ালো এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত

আমি অনেকদিন পর একজন হা–ঘরে
উদ্বাস্তু হ'য়ে চরকির মতো গোটা শহর ঘুরে বেড়ালাম।

www.chirnofoundation.org

কিন্তু কবি মুগ্ধতার প্রতিপাদ্য কী? যা তার সেন্স গড়ে দেয়। শালিক কেন গোয়েন্দার মতো রূপ নেয়, শালিককে এমন প্রতিপাদ্য করার প্রয়োজনইবা কোথায়! তাতে এক অন্তঃসারপ্রবণ বালক একাকীত্বে ভোগে, সারা শহরে তার কেউ নেই। বিষয়টিকে শহীদ কাদরী অভিজাত করে তোলেন না কিন্তু চিত্রিত করেন পূর্ণ আসঞ্জনরস কাম্য করে। ফলে, প্রচুর কর্কশ, ক্রান্তিময়, ক্লিন্ন, দুর্ভাগ্যময় এসেন্স পংক্তির খোপরে ডুকরে মরে বারবার। ওইরূপ শব্দের (উনুনের আভা, লালচে চুল, পিরিচ-পেয়ালা) উত্তাপে তাতেই আলোর গরিমা সুলভ হয়। এই আলোটি কবির নিজস্ব। তীব্রতায় ভরা। কৌমার্যে ব্রতশীল। সেটি বেয়ে চলেছে বক্ষ্যমান কবিতায় অনেক আলো-বাতাস ছুঁয়ে– বন্দী-ব্যক্তির পেছনে। কে এই বন্দী? কেন সে বন্দী? সে প্রত্ন প্রাচুর্যময়, সনাতনী বাদ্য বাজায়, বহুকালের হয়ে ভালোবাসার কথা বলে, প্রোটোটাইপ-অভিজ্ঞানে সে মুখর। এই সমরেশ সন্তপ্ততা ব্যক্তিকে ঘিরে ধরে। প্রত্যঙ্গগুলো আমাদের কবিতায় ওভাবে ছিল না। এখন এলো। কিন্তু কেন? বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় প্রদাহ আর অন্যদিকে উন্মূল পৃথিবীর অংশ এ দেশ আরও অধিক ব্যাকুল নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংশ্রবে। একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্ব অনুগত অপশক্তি অন্যদিকে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ায় আমাদের সমাজস্তরে গড়ে ওঠা কপর্দকহীন ব্যক্তি। তবে শুদ্ধতা বা পরিশীলনও গড়ে ওঠে ওর ভেতরেই। তাইতো চিত্রল যে নাগরিক অভিপ্রায়গুলো শহীদ কাদরীর হাতে ধরা দেয়– তা স্মৃতিময় প্রীতিময় কিংবা দাহকর আবার দার্ঢ্যপ্রবণও। প্রকৃতি তাই সহজাত হয়েও কৃত্রিম বিদ্রূপময়। একপ্রকার সঙ্গীহীন কিন্তু সংশ্রবপ্রবণ নয়। কালকে তিনি ধরলেন। কালের রং ও রেখায় যে তুচ্ছ তুচ্ছ স্মৃতিপ্রবাল, ঝিনুকের নীরবে সহা যে বেদনা তা সৌধপ্রতীম দাঁড় করালেন। যা কণ্টকিত তাই বললেন। কণ্টকময় আভায় অভিপ্রেত যা তাতেই প্রাবল্য দিলেন। ফলে স্পষ্ট লিখতে পারলেন :

উপত্যকার উজ্জ্বল আভাস,
বিদেশের ফুটপাথে বর্ণোজ্জ্বল দোকানের বৈভব,
মধ্যরাত পেরুনো আলো-জ্বলা কাফের জটলা,
সান্টাক্লোজের মতো এভিনিউর দু'ধারে
তুষারমোড়া শাদা- বৃক্ষের সারি
নিত্য নতুন ছাঁদের জামা– জুতো,
রেস্তোরাঁর কাঁচের ওপারে ব'সে থাকা বেদনার স্ফুরিত অধর
আর মানুষের বাসনার মতো ঊর্ধ্বগামী
স্কাইস্ক্রেপারের কাতার–

www.chinnofoundation.org

ছন্দে তুলে নেন ক্রিয়াশীল আবেগের চক্ষু, তাতে নাগরিক সীবন-কাঠামো গড়ে ওঠে অবলীলায় রস্‌কিন-কথিত 'প্যাথেটিক ফ্যালাসি'র অন্য রূপ গড়ে তোলেন কবি। সান্তাক্লোজ বা স্কাইস্ক্রেপারের কাতার যথাক্রমে মানববাসনা আর শাদা বৃক্ষের ইমেজে লীন হতে চাইলে নগরের কিম্ভূত স্থানসমূহ মানবিক পদচারণায় শামিল হয়। তবে এক্ষণে মনে করি, প্রতিপাদ্য এ কবির হাতে এখানে আমাদের কবিতাধারায় এক অভিনবত্ব যুক্ত হয়েছে। সেটি কী? দুটো বিষয় এখানে অনুমান করা যায়, এক. তৎকালীন সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারায় যে নাগরিক শব্দসমূহের উৎসারণ ঘটলো তাকে গ্রহণীয় অনুভবে অবমুক্ত করা, দুই. কবিতার অক্ষরসমুদ্রে আলঙ্কারিক অনুষঙ্গ যেমন প্রতীক, ইমেজ, বাকপ্রতীমার সৃজনশৈলিও গড়ে উঠেছে নাগরিক প্রতিপাদ্যকে উৎসমুখ করে। উপর্যুক্ত উদাহরণে প্রভূতরূপে এ প্রত্যয়-সংবেদ রচিত হয়েছে। কবিতা কেন? যে শব্দ বা প্রবণতায় চরণ বিন্যস্ত হয় তাই কি কবিতা! তা নয়। শহীদ কাদরী কবির অভিপ্রায়ে কবিতাশব্দের উৎসারণে কাব্য রচনা করেছেন। সেখানে নাগরিক শব্দসমূহ নিছক কালেকশন নয়। লক্ষ্যনির্দিষ্ট কালেকটিভও নন তিনি। শব্দকুশলী শিল্পী হিসেবেই তিনি কবিতার শব্দকে আয়ত্ব করেছেন। কল্পনার জগতে নতুন অভিযোজনা যে শব্দগুচ্ছ সেটির কারণেই তিনি অভিনব। বাক্যবন্ধে যে ঝংকার, অনুপ্রাসের অনুসন্ধান কিংবা শব্দ ঘষে শব্দকর্ষণ জীবিতার অনুরুদ্ধ শব্দদায় কম নয়। সংযম, অব্যয়, চিত্রানুলব্ধ বোধ "বাংলা কবিতার ধারা" কবিতাটিতে লক্ষণীয় :

কে যেন চীৎকার করছে প্রাণপণে 'গোলাপ। গোলাপ!'
ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়ছে তার সুমসৃণ লালা,
'প্রেম, প্রেম' বলে এক চশমা-পরা চিকণ যুবক
সাইকেল-রিকশায় চেপে মাঝরাতে ফিরছে বাড়িতে,
'নীলিমা, নিসর্গ, নারী'– সম্মিলিত মুখের ফেনায়
পরস্পর বদলে নিল স্থানকাল, দিবস শর্বরী হলো
সফেন পদ্মের মতো সূর্য উঠলো ফুটে গোধূলির রাঙা হ্রদে
এবং স্বপ্নের অভ্যন্তরে কবিদের নিঃসঙ্গ করুণ গণ্ডদেশে
মহিলার মতো ছদ্মবেশ জাঁদরেল নপুংসক এক
ছুঁড়ে মারলো সুতীক্ষ্ণ চুম্বন।

স্তবকগুচ্ছটিতে 'গোলাপ' আর 'প্রেম' গৎবাঁধা ধারণার চূড়া থেকে অবমুক্ত হয়েছে। 'নীলিমা', 'নিসর্গ', 'নারী'ও চিরায়ত প্রত্নস্বরূপ থেকে বেরিয়ে আসছে। এ পরিবর্তনটি কী স্টান্ট? কিংবা ত্রিশোত্তর কবিতার অনুকরণশীল 'প্রেতাত্মা'র পুনর্ভিবাদন? নাকি বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাস্তবতার বৈশ্বিক করুণার প্রতিফলন? তবে যাই হোক, বিভাগোত্তর পূর্ব-বাংলার সামাজ ক্রমবিকাশের ধারণাটি এতে অস্পষ্ট নয়।

www.chinnofoundation.org

ক্ষরিত, অবক্ষয়, বিচ্ছিন্নতা, ব্যক্তিতন্ত্র, ব্যক্তিমুখিতার বিচ্ছিন্নতা নিছক তো সমাজের ফেনারাশি নয়, ঢুকে গেছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আর তার প্রতিক্রিয়া কিংবা ব্যক্তিমনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্বে কেন্দ্র-প্রান্ত বিরোধ ও প্রবণতা-সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। 'চুম্বন' বিশেষায়িত [সুতীক্ষ্ণ] হলে তার কর্মক্ষমতার পরিধিও 'নপুংশক' পর্যন্ত। সেও বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। এভাবে কবিতাটির আরও কিছু শব্দ চিরন্তন মহিমা পাল্টায়। সেটি ওই পংক্তিমালার ভেতরেও পরিষ্কার ইঙ্গিত করেন। কারণ কী? কবির চাহিদা মানুষ ও মনুষ্যত্বের প্রতি। তার স্মৃতি ও সম্মান ওই দক্ষতায় উচ্চমার্গীয়। কিন্তু এক অপরিসর ও বেপথু– দুর্বল পরিত্যক্ত কণ্ঠ নিঃসৃত সমাজের ছায়াপাত অবচেতনরূপেই কবির কাছে ধরা পড়ে। সেটি প্রকাশের অনির্বচনীয় ভাষাও তৈরি হয়। সেজন্য এক বিচিত্রময় প্রবাল দ্বীপ তিনি রচে ফেলেন। এ দ্বীপে হুইসিল, পার্ক, ট্রেঞ্জ, ব্ল্যাক আউট, রেডিওগ্রাম, কর্কশ গলা, শিশ্নশৃঙ্গ, উল্টানো চাঁদ, সমকাম, মাঝরাতের ডায়াল, সোনালী মাছি, বেসিন, উল্লুক, বোদলেয়ার প্রেরিত এক শিশে সুরা, রঙ্গমঞ্চের বাতি, দিকভ্রান্ত গ্রাম্যজন, প্যারট্রুপার স্বীয় অর্থানুকূল্য অর্জন করলে– এমন পরিপ্রেক্ষিত আলোকে বোধের প্রসারতা ও কাব্য-চিন্তন কাঠামোটি তৈরি হয়, নতুন ভূগোল তা পর্যাপ্ততা পায়। প্রাসঙ্গিকভাবে বিশ শতকের সাহিত্যধারার কবি ও কবিতাচিন্তক আর্নল্ড, এলিয়ট, ইয়েটস, বোদলেয়ার, লোরকা, র‍্যাবো অনুসৃত হয়। বক্ষ্যমান উদাহরণমালায় নাগরিক অনুসিদ্ধান্তসমূহ কীভাবে এলো বা তা করায়ত্ত হওয়ারই বা দিগবলয় কী– সেটি কিছু উদ্ধৃতির নিষ্পত্তিতে আনলে পাই : 'who among us has not dreamt, in moments of ambition, of the miracle of a poetic prose, musical without rhythm and rhyme, supple and staccato enough to adapt to the lyrical stirrings of the soul, the undulations of dreams, and sudden leaps of consciousness.' (Baudelaire) 'my poems represent, on the whole, the main movement of the mind of the last quarter of the century, and thus they will probably have their day as people become conscious to themselves of what that movement of mind is, and interested in the literary productions which reflect it'. (Arnold), 'The poem is known for its obscure nature- its slippage between satire and prophecy, its abrupt changes of speaker, location, and time. This structural complexity is one of the reasons that the poem has become a touchstone of modern literature.' (Eliot)

এসব প্রস্তাবে ভিক্টোরীয় যুগের শেষার্ধ কিংবা বিশশতকী কবিতাচিন্তার সারাৎসার নিয়ে আমাদের কবিতা কী পায়– তার একটা তাত্ত্বিক সংযুক্তি অনুমেয় করা অসম্ভব নয়। যদিও জানা যে, এ বাংলার ভূমি-মাটির সংস্কারের সংশ্রব আর নগর-নাগরিক ভাবনার বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা এ ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য নয়, সমাজ-আর্থনীতিও

www.chinnofoundation.org

ওইরকম যুক্তিই প্রতিষ্ঠা করে। তবুও বিভাগোত্তর পর্বে একপ্রকার সে বীজ রোপিত হওয়ার সূত্র গড়ে ওঠে। তার গ্রহণ-বিবর্ধন যেমনই হোক শহীদ কাদরীর মাধ্যমে উৎস ও উৎসারণ দুটোই সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। অবচেতন দৃষ্টিকোণেই সে সন্দর্ভ মূল্যতা পায়। কারণ, কাদরীর ঢাকা অন্যদের মতো অভিজ্ঞতা বা বিবরণধর্মী ও স্বীকারোক্তিমূলক নয়। সেটি প্রেমপ্রবর, ধ্যাননিষ্ঠ স্বরূপ অন্বেষা। সৌন্দর্য স্মারকটি সেখানে যে গঠনতা পায় তা 'মহান' শব্দকে বিচ্যুত করে, খোলস অবমুক্ত করে, ঝুলন্ত আবেশকে বিশেষ দিগবলয়ে অভিষিক্ত করবার প্রয়াস। মিনিংটা তাতে অন্য রকম। গ্রহণচ্ছেও নতুন– কারণ কেউ সে নান্দনিকতাকে অস্বীকার করে না। বরং রহস্যজাল ভেদ করে উপভোগ্য আকস্মিকতায় পরিতৃপ্ত হয়। তাতেই নগর-সিভিলাইজেশনের ইতিহাস ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট উপকরণ-উপাদান অর্থদ্যোতনায় আকৃষ্ট হয়। কাদরী এক্ষেত্রে আবার নিরাবেগি নন, ট্যাডিশান ব্যতিরেকও নন– বরং অনুরক্ত ও সমাহিত। "এই সব অক্ষর" কবিতাটি পড়া যায় :

আমি এখন তোমার নাম লিখবো,
আমি এখন তোমার নাম লিখবো,

তোমার নাম লেখার জন্য আমি
নিসর্গের কাছ থেকে ধার করছি বর্ণমালা–
আগুন, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, ঝড়– আর,
সভ্যতার কাছ থেকে– একটি ছুরি
– এই সব অক্ষর দিয়ে তোমার নাম আমি লিখছি, তোমার নাম :
অগ্নিময় বৃষ্টিতে তুমি ঠাণ্ডা, হিম, সোনালী ছুরি প্রিয়তমা।

একপ্রকার সেন্টিমেন্টের স্তূপ– তাতে জড়ো হয় 'a sensation produced in one modality when a stimulus is applied to another modality, as when the hearing of a certain sound induces the visualization of a certain color'– প্রিয়তমা তীব্রতর ইন্দ্রিয়বাচক বাকপ্রতিমা– তাকে সৃষ্টির জন্য স্বভাবতই মনের অনেক আয়োজন থাকে। সেজন্যই কিছু প্রত্নশব্দকে সামনে আনেন কবি– অধিক অর্থদ্যোতক করার জন্য। শব্দগুলোর পৌরাণিক মাত্রাগুণও আছে। 'আগুন', 'বৃষ্টি', 'বিদ্যুৎ', 'ঝড়' এ দিয়ে যে প্রিয়তম তৈরি হবে তা অন্য কবিগণ নানাভাবে রসায়ন করেছেন, ত্রিশোত্তর কবিরা বিশেষ করে। কিন্তু কাদরী নাগরিক নৈঃশব্দ্যতায় সভ্যতার শরণাপন্ন হবেন– ঠিক তার রীতিতে। যেমনটা তাঁর কবিতায় প্রধান প্রতিপাদ্য। সভ্যতার ব্যারোমিটার লৌহযুগের অবদান রক্ষা করে প্রিয়তমা অন্যরকম হলো। সভ্যতা তো মানববিশ্বের শব্দার্থ, সার্থক কিছু। কিন্তু কবির কাছে সবটুকু মেনেই পরিশুদ্ধতার বয়নে প্রিয়তমা বিশেষভাবে সংবাদময় হলো। আগুন-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ-ঝড় তাকে ম্লান-হিম-অনুত্তীর্ণ-অস্বাভাবিক করলো,

www.chintafoundation.org

স্ফূর্ততা কমিয়ে দিল, হয়তো 'পণ্য' বানিয়ে কৃত্রিম করে দিল। প্রিয়তমার সবই আছে, মন নেই, হৃদয়হীন-কঠিন, নিভন্ত। সিনেসথিসিয়ার আলাদা একটি স্বরূপ অঙ্কন করেন কবি। তাতে সার্থকতা কোথায়! অবিশ্বাস বা আরোপ না হলে, ইমেজের রঙ প্রসারিত হলে, দেদীপ্যমানতা বাড়লে সভ্যতার যে উত্তরাধিকার প্রিয়তমা অর্জন করে– সেটি গরল ইমেজ। যা 'সোনালী' আভাযুক্ত– সোনালী ছুরির ন্যায়। তবে কবিতার সত্য এরূপে গড়ে উঠলে সমাজের রোরুদ্যমান রূপও তাতে পরোক্ষ পরিবাহিত হয়। কবির শতাধিক কবিতায় তা-ই হয়েছে। যার নাম তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ থেকে গ্রহণ করেছেন। 'বৃষ্টি', 'জ্যোৎস্না', বিভিন্ন ফুল, নগরের বিভিন্ন ঝলমল বস্তু উপাদান কিংবা কলোনিয়াল বস্তু ধারণা বা আমদানীকৃত উপাচার। এ বিষয়গুলো স্বতঃস্ফূর্ত, শৃঙ্খলিত– এবং কাব্যগন্ধময় ইমেজে পর্যবসিত। এবম্প্রকারে যে মেসেজ অভিব্যঞ্জিত সেখানে বাকপ্রতিমায় বিচিত্রতা তৈরি হয়েছে এবং একইসঙ্গে গড়ে উঠেছে নগর ও নাগরিক ইমেজ-কাঠামো। মাত্র চারটি কাব্যগ্রন্থে এমন কাব্যশক্তিই নজরে আসে। যা ষাটোত্তর কবিতায় তাঁর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত এবং অনুজ্ঞাবহ ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। যে তরঙ্গে অনেকেই এখন প্রবাহিত এবং নবায়িত।

৪.

শহীদ কাদরীর জুঁই-চামেলী আসলে চিত্রকর সালভাদর দালির 'দ্য পারসিসটেন্স অব মোমোরি' (১৯৩১)– যেখানে সুররয়িালিস্টিক ইমেজ নম্ররূপে বিস্তৃতি পায়। 'জুঁই চামেলি, চন্দ্রমল্লিকা, ওরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে,/ প্রিয়জনদের মতো ওরা কেউ নরমাংসভুক নয়/ বন্ধুদের দৃষ্টির মতো ওরা কেউ তলোয়ারের/ পৃষ্ঠপোষক নয়'– এসব ডিটারমিনিস্ট নয়, বহুরূপে নম্র ও বিস্তৃতিপ্রবণ। কাদরীর এমন আধুনিক অভিপ্রায় আমাদের কবিতার জন্য একপ্রকার নতুন অভিমুখ। অনেকক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ লক্ষণীয়। এজন্য একপ্রকার আস্থানুগ কৌমার্যপ্রবণ ব্যক্তিত্বও সুলক্ষণারূপে আছে– যা জাগতিক প্রাপ্তিহীন কিন্তু প্রবলভাবে জাগতিক। ফলে বলায় বা ক্রিয়ায় তা নিরঙ্কুশ এবং এ ভাষার জমিনে তা দৃঢ়তর ধ্রুব আখ্যান। এ আধুনিকমনস্কতার বলয়টিতে তিনি কাঙ্ক্ষিত থাকবেন সর্বদা, সন্দেহ নেই। তবে সব কবিতাই যে তাতে মহতার্থ পায় তা নয় কিন্তু ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে প্রাপ্ত বর্ণমালা কিংবা এই বুর্জোয়াপ্রবণতার জুগুপ্সার ঢাকা শহর– এবং তার হয়ে ওঠার মুহূর্ত, জনবসতি, জনতার প্রবণতা নির্মেদরূপে কবিতায় বসতি পায়। সেটি আরোপ নয়, প্রাকৃতিকভাবে আস্থায় ও নিশ্চিন্ততায় প্রতিষ্ঠিত। এবং আনন্দদায়ীও। জীবনবাদীতার স্বরূপ এখানে মৌলিক। এখন দালি বা এলিয়ট, সুধীন্দ্রনাথ একটা প্রবাহ; করণকৌশলের অভিমুখ– সেটি কাব্যকর্মের প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠা করতে

www.chinnofoundation.org

দ্বিধাহীনভাবে সক্ষম। সেইটিই শহীদ কাদরীর সর্ব বিশেষণের উৎসমুখ। আমাদের পাঠচিন্তনও সে প্রয়োজনেই সৃজিত।

www.chinnofoundation.org

আবুল হাসান : স্বর্গোদ্যানের নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক

'যাকে আমরা মানুষের নীল দীর্ঘশ্বাসের কবি বলে জানি, তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন মোমবাতি। যারা দুরন্ত ঝড়ের মতো আসেন আর তারা দ্রুত ধাবমান অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো নিভে যান। ... শেলী, কীটস, রিস্তোসির্নেনস্কি, সুকান্ত ভট্টাচার্য, আবুল হাসান কারোরই বয়স ত্রিশোর্ধ্ব নয়। পৃথিবীর অকালপ্রয়াত কবিদের তালিকায় কবি আবুল হাসানের নামও স্থান পেয়েছে।' আবুল হাসানের জন্ম ১৯৪৭র আগস্ট মাসে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার বর্ণিগ্রামে। শৈশব তার কবিতায় বড় স্থান দখল করে আছে। ঢাকার বিভিন্ন দৈনিকে লেখালেখি শুরু, ১৯৬৬ পর্যন্ত লিখতেন আবুল হোসেন নামে, পরে অগ্রজ কবির নামবিভ্রাট এড়ানোর জন্য রফিক আজাদের উপদেশ ধারণ করে আবুল হাসান নামাঙ্কিত হন। 'আর কী আশ্চর্য, নাম বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে তার কবিতাও গেল বদলে। পুরানোর খোলস থেকে বেরিয়ে এলো নতুন। কবিতার জ্বলজ্বলে প্রান্তরের দিকে তাঁর যাত্রা শুরু হলো।' (শামসুর রাহমান) 'গণবাংলা নামের একটি সংবাদপত্রের সাহিত্য-সাময়িকীতে সংশ্লিষ্ট ছিল কিছুকাল, বোধ হয় শহীদ কাদরীর সহকারী হয়ে, একটু রাত করে আসত আমার কাছে, লেখার জন্যে। শহীদ কাদরীর সমভিব্যহারেও কোনো কোনো রাতে আসত। কাজ করেছিল আরো কোনো কোনো সংবাদপত্রে– সবই অল্পদিনের জন্যে। আমার নৈশ কলেজের অফিসকক্ষেও হাসান হানা দিত মাঝে মাঝে। সবান্ধব, কখনো একা। কতোনা রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছি আমরা... (আবদুল মান্নান সৈয়দ)। আবুল হাসান কবিতা ছাড়াও কিছু ছোটগল্প লিখেছেন। নয়টি গল্প নিয়ে আবুল হাসানের *গল্পসংগ্রহ* ১৯৯০-এ প্রকাশিত হয়। অপ্রকাশিত প্রায় সব কবিতাই মৃত্যুর পরে পুস্তক আকারে বেরিয়েছে। ১৯৭০-এ রোগ ধরা পড়ার পর নানা সময়ে অসুস্থতা এবং ১৯৭৫ সালের ২৬ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যু। মৃত্যুর পর আবুল হাসান বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদক লাভ করেন।

২.

আমাদের কবিতায় 'নিঃসঙ্গতার আইকন' আবুল হাসান। ১৯৬৫-১৯৭৫ পর্যন্ত আবুল হাসান সাংবাদিক ও লেখকরূপে ঢাকায় বসবাস করেন। তখন কবিখ্যাতি কবিসমাজের (শহীদ কাদরী, নির্মলেন্দু গুণ, রফিক আজাদ প্রমুখ) নজরে আসে। আবুল হাসান স্বল্প সময়ে বাংলাদেশের কবিতায় আধুনিক রূপরীতির রচয়িতাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। শামসুর রাহমান বলেন : 'এই কবির জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কবিতায় ভরপুর ছিল। যেন হাওয়ায়, ধুলোয়, গাছের পাতায়, পাখির

www.shimcfoundation.org

ডানায়, নদীর জলে, দিনের কোলাহলে, রাত্রির নিস্তব্ধতায় তিনি কবিতা পেয়ে যেতেন।' তাঁর কবিতায় আত্মপ্রেম, নৈঃসঙ্গ্যবোধ, বিচ্ছিন্নতা কিংবা স্মৃতিকাতর বেদনার্ত আত্মা দিব্যত্ব অর্জন করে। কবিতাশরীরে অন্তহীন স্বপ্নচারিতা প্রবিষ্ট। স্বপ্নকাতরতায় মগ্ন কবিমন বাউল-বীক্ষণে প্রকাশিত, "পাখি হয়ে যায় প্রাণ" থেকে:

দূরে বসে প্রবাহের অন্তর্গত আমি, তাই নিজেরই অচেনা নিজে
কেবল দিব্যতাদুষ্ট শোনিতের ভারা ভারা স্বপ্ন বোঝাই মাঠে দেখি,
সেখানেও বসে আছে বৃক্ষের মতোন একা একজন লোক,
যাকে ঘিরে বিশজন দেবদূত গাইছে কেবলি
শতজীবনের শত কুহেলী ও কুয়াশার গান!

পাখি হয়ে যায় প্রাণ ঐ কুহেলী মাঠের প্রান্তরে হে দেবদূত!

"আবুল হাসান" নামটি নিয়ে রচনাসমগ্র (প্র.প্র. ১৯৯৪) তে তাঁর প্রথম কবিতা, কাব্যের নাম *রাজা যায় রাজা আসে* (১৯৭৩)। ভূমিকাটি শামসুর রাহমানের। উপর্যুক্ত পংক্তিমালায় বৃক্ষ=একা একজন লোক, দেখেন কবি নিজেই ('আমি') যিনি প্রশ্নশীল এবং 'অনিচ্ছুক দাস'। যেখানে ভালোবাসা খুব কাঙ্ক্ষিত কিন্তু তা অনেক দূর। কবির সময়খণ্ডে দৃঢ় অপরূপ সুন্দর, শুভপ্রদ। কবিতার-কাঠামোতে তা কালোত্তীর্ণ, পেরোয় শতজীবন কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজপ্রবাহে সে 'নিম্নমানের মানুষ'। যে সময়ে আবুল হাসান সমাজ-মানুষের কাছাকাছি, তখন বাবা হয়ে গেছেন ব্যর্থ মানুষ, এ মধ্যবিত্ত পরিবারের নিজে নিরুদ্দিষ্ট বড় ভাইয়ের মতো, আর দীর্ঘশ্বাসের সিদ্ধান্তে 'মানুষ চাঁদে গেল, আমি ভালোবাসা পেলুম/ পৃথিবীতে তবু হানাহানি থামলোনা!'– এ অর্থে আবুল হাসান প্রভূতরূপে ঘন সুন্দর নিরঙ্কুশ সত্যে দাঁড়াতে চান। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রসংঘ, রাজনীতিক প্রতিহত হয়ে চলে বৃষ্টিতে, দুঃখময়ী মাতৃভাষায়, প্রিয়ার চুম্বনে, মায়ের বাগানে, চামেলীর গন্ধে। *রাজা যায় রাজা আসে* কাব্যে সিদ্ধান্ত আসে "শান্তিকল্যাণ"-এর, ঠিক হয়ে যায় "নিঃসন্দেহ গন্তব্য"-র দিকচিহ্ন। এ কাব্যে প্রেমিক কবি, নৈঃসঙ্গ্য-পীড়িত-ক্লান্ত-দীর্ণ ("ক্লান্ত কিশোর তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখায়")। কবিভাষাটি আবেগময়। কিন্তু নিজের দার্শনিক দৃঢ়তা অর্জিত, ব্যক্তিত্বমগ্ন। পূর্বজের প্রভাব মেলে, ষাটে পাশ্চাত্যচিন্তার ধারা স্থিত হয়ে যাচ্ছিল—সেটি এদেশের নির্মল প্রকৃতিতে এক ধরনের বাস্তবতার ভেতর দিয়েই গ্রহণ হতে থাকে, আবুল হাসান নিকট বন্ধুদের ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠলেও নিজ পথে স্বচিন্তা ধারণ করে এগুতে থাকেন। শহীদ কাদরীকে উৎসর্গিত কবিতা "গাছগুলো", রফিক আজাদকে "অগ্নি দহন বুনো দহন", আবদুল মান্নান সৈয়দকে "শিকড়ে টান পড়তেই" আর নির্মলেন্দুর হাতে *যে তুমি হরণ করো* দিয়ে দিলেন কিন্তু নিজ শক্তিটুকুতে যে অনন্য তা বুঝিয়ে দেন। 'সর্বৈব মন্বন্তরের

www.chinnofoundation.org

মধ্যে বসেও আবুল হাসান, ষাটের দশকের সবচেয়ে স্বপ্নপীড়িত কবি, স্বপ্ন দেখেছেন পূর্ণতার, পরিতৃপ্তির, স্বাস্থ্যের ও সম্পন্নতার। এ এক দুর্লভ ক্ষমতা, যে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন ষাটের অনেক কবি। (আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ)

যে তুমি হরণ করো (১৯৭৪) কাব্যে আবেগ সংলগ্ন মেধায় আরও নান্দনিক, কবিভাষা নির্মিত। অভিজ্ঞতা প্রাচুর্যময় আত্মপ্রেম যুক্ত দেশপ্রেমে, রিল্‌কীয় রক্তক্ষরণের প্রাবল্য-মিশ্রিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মারী-মন্বন্তর অতিক্রমী পথভ্রষ্ট মানুষ—শেষপর্যন্ত জয়ীই সে :

উদিত দুঃখের দেশ তাই বলি হে কবিতা, দুধভাত তুমি ফিরে এসো,
সূর্য হোক শিশিরের ভোর, মাতৃস্তন্য হোক শিশুর শহর!...
এইভাবে নতজানু হতে চাই ফলভারনত বৃক্ষের শস্যের শোভায় দিনভর
তোমার ভেতর ফের বালকের মতো ঢের অতীতের হাওয়া
খেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চাই।

এর ভেতরে বিচ্ছিন্ন নয় ব্যক্তিসত্তা, বেড়ে ওঠে তাপিত বিষণ্নতা, অমোঘ অনুতাপ। কবির শব্দ-প্রতীক-উপমানচিত্র অধ্যাত্ম বিষণ্ন আভায় সৌকর্যমণ্ডিত। "কবির ভাসমান মৃতদেহ", "কুরুক্ষেত্র আলাপ", "গোলাপের নীচে নিহত হে কবি কিশোর", "নিঃসঙ্গতা", "নির্বিকার মানুষ", "ভুবন ডাঙায় যাবো" কাব্যের আকর্ষণীয় কবিতাগুলোর অন্যতম। তীক্ষ্ণ প্রতীকী আর দার্শনিক অভিপ্রেত পংক্তি 'একটি ভিক্ষুক হাসতে থাকবে ভিক্ষুনীর অর্ধকোল জুড়ে', 'দেখেছি দুঃখের চেয়ে সুখ আরো বেশী দুঃখময়'। তবে এ কাব্যে নারী-'প্রণয়' অপরূপ মাত্রা লাভ করেছে। 'আমি'-'তুমি'র পৌরাণিক আক্ষেপ-আস্বাদ চিরতরে ব্যঞ্জনা লাভ করে। কবি প্রেম-ব্যবচ্ছেদ বয়ে এনেছে কষ্টকাতরতা, অকৃত্রিম জন্ম-সৃষ্টির ভ্রমণময় অরূপ আলাপন, অশরীরী আদ্যোপান্ত জীবনরেখার ভেতরের ক্লান্তিধ্বনি। এরূপ আখ্যানের অবচেতন দ্বন্দ্বময় প্রকাশরূপ আবুল হাসানে উন্নত মানের স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ রচনা করতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রত্যাদেশে আনন্দের বৈপরীত্য থাকলেও তা নির্মল-শান্ত সুখকর, কারণ কেন্দ্রের সৃজন তো নারীর—যা বসুন্ধরাময় এবং ততোধিক যৌবনময় :

(ক) আর ঐ যে অমৃত ঝর্ণা, ওকে কারা বুকে এনে অতটা স্বর্গীয় শব্দে
স্রোতস্বিনী ডাকে!

(খ) আর সেই রমণীকে দেখে ফেলে একটি আদিম কালো রাত!
আর সেই রমণীকে দেখে ফেলে নগ্ন মহিলা আর নগ্ন যুবতী!
আর সেই রমণীকে দাঁতে দাঁতে দীর্ঘতর করে তোলে তীব্র দংশন!

(গ) সমস্ত সতীর গাত্রে লাথি মেরে
সমস্ত সৃষ্টির পাতও ভেঙে-চুরে

www.chitrofoundation.org

এসো হোক তোমাতে আমাতে
এসো ভয় নেই।

(ঘ) আজো শীতরাতে তুমি কুয়াশায় ক্ষুধিত চাঁদের মতো বাঁকা কটিদেশ,
হায় তুমি, হায় অবিরাম রাতে ভেসে আসা উষ্ণ ছিপ নৌকা আমার!

কবির এ নির্ভার কথন, কল্পোক্তির অনুধ্যান নিশ্চিত করে মধ্যবিত্ত সত্তার 'অন্ধকার' অবয়বটি। সে লক্ষ্যে উপমান চিত্র উপমেয়, রূপকল্প, ইমেজ ইঙ্গিত পরিস্রুত হতে থাকে। যৌনতা আর জীবন রঙ অভিন্ন, অবসাদ-ক্লান্তি আর আনন্দও অভ্রান্ত, কিন্তু প্রশ্ন এ ব্যক্তির জীবন এমন কেন? এর শেষ ঠিকানাই বা কি? যে অকৃত্রিম প্রকৃতি ও নিসর্গে তার জন্ম, জন্মের পরে হারাতে বসে মাতৃকোল-বাগান-বাবা-ভাই পরে উত্তীর্ণ বয়সে প্রেমিকা, প্রেম আর অসুখময় সুখ। সেখানে সমাজ-রাষ্ট্র আরও বিঁধে দেয় নানারকম কষ্টতিলক। মুক্তি কী? কবির চিহ্নিত সময়ে কবিভাষার এ রূপরেখাটি আরও ঊর্ধ্বগামী হয়ে পড়ে *পৃথক পালঙ্ক* (১৯৭৫)-এ এসে। 'উপনিষদ' হয় উপলক্ষ। 'মধ্যরাতে ঝাউকান্না কেঁদে বলে, শান্তি হোক, ওরে শান্তি হোক'—শান্তির বারতা শিল্পিত হয়ে ওঠে। মৃত্যুঞ্জয় রূপ পরিগৃহীত "নচিকেতা"য় :

মারী ও বন্যায় যার মৃত্যু হয় হোক। আমি মরি নাই—শোনো
লেবুর কুঞ্জের শস্যে সংগৃহীত লেবুর আত্মার জিভে জিভ রেখে
শিশু যে আস্বাদ আর নারী যে গভীর স্বাদ
সংগোপন শিহরণ পায়—আমি তাই।

শ্রেষ্ঠ এ কাব্যটিতে পূর্ণতা আসে কবির। সিম্ফোনিতে পূর্ণ প্রশান্তময়, বৃক্ষ-পক্ষী আবার ফিরে আসে—তবে তা পুরনো অর্থে নয়, শ্রেয়ো-তাড়নায়। সৌম্য তার রূপ। জেগে ওঠার প্রত্যয়। উঁচু মাপে ব্যাপক মহাজাগতিক অভীক্ষাটির উদ্ভাসন ঘটে :

শুধু এই নষ্ট জমি তোমাতে তোলেনা ধর্ম,
শস্যক্ষেত, বৃক্ষভূমি, মাটি ও মৃত্তিকা আজ
মরিতেছে অবক্ষয়ে ঘুণ ধরিতেছে।

অথবা,

বৃষ্টির ফোঁটাকে মনে হয় তোমার পায়ের পাতার শব্দ,
পাতার শব্দকে মনে হয় তোমার গাড়ীর আওয়াজ;
আমি চক্ষু সজাগ করি, কান উৎকর্ণ, ইন্দ্রিয় অটুট,
তুমি আসছো না, তুমি আসছো না—
তোমার কত হাজার বছর লাগবে আসতে?

বা,

তুমি যখন নৃত্য করো মুদ্রাগুলি কাঁপে

www.chinnofoundation.org

তোমার হাতের মধ্যে তো নয় যেনবা কিংখাবে,
তলোয়ারের মতোন তুমি তোমার দু'হাত তোলো,
চোখের নীচের নগ্নতাকে ছন্দ পেয়ে ভোলো।

আমি তখোন আমারে পোড়া দেশের পাপে মরি।
নিজের কাছে নিজের দেহ তীব্র তুলে ধরি।

এক্ষেত্রে শব্দ-নির্বাচন, নতুন উপমা ও অভিনব চিত্রকল্প নির্মাণে ('গোধূলির মস্তিষ্কে রক্ত', 'জ্যোৎস্নার গাঙচিল', 'দগ্ধ শ্যাওলার মতো ছাইরঙা শার্ট', 'সবুজ রং-এর শীত' ইত্যাদি) দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। নিজের অন্তর্গত চেতনালোকে নির্বাসিত হন তিনি। সেখানে কীর্তিত হন 'ভেজা মাটির বৃষ্টিতে' কিংবা 'পারদমাখা শয্যা'য়। এসবের ভেতরেই জীবন-মৃত্যুর বিপরীতাত্মক প্রান্তকে মেলে ধরতে চান কবি।

৩.

যাই, এখন তোদের শরীরে শস্যের আভা ঝরে পড়ছে যাই...
মৃত্যু আর মৃত্যু আর মৃত্যুর আঁধারে যাই,
বিবর্ণ ঘাসের ঘরে ফিরে যাই, যাই
সেখানে বোনের লাশ, আমার ভাইয়ের লাশ খুঁজে নিতে হবে,
আমি যাই
দেখি কারা দিকে দিকে দীর্ঘ মেঘে ঢাকা পড়ে আছে
দেখি, কোথায় সে জলাভূমি, কোথায় সে ট্রেঞ্চ, নালা,
ইটের নদীর তলদেশ আর
কোথায় সে নীলিমার নক্ষত্রবীথির শান্তি, সবুজ রং-এর শীত, দেখি
কোথায় কাহারা আজ এত উষ্ণ মৃত্যুতে স্থির, নির্যাতিত আলোয়
স্থির

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি-সম্বলিত এ কবিতায় কবি মৃত্যু-পংক্তির রূপময় পরিবেশ রচনা করেন। বিষণ্ণতায় হন দগ্ধ। মৃত্যুচেতনা বিদ্যমান প্রকৃতিরাজিতে স্থির কম্পমান। *পৃথক পালঙ্ক* সে ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ। ত্রিশোত্তর কবিদের প্রভাব হলেও তা হাসানের হাতে অন্য। একটি আলোকিত কবিভাষা এক্ষেত্রে নির্মিত হতে দেখা যায়। কবিকণ্ঠটি পরিষ্কার। আগেই এ কাব্যের প্রথম কবিতা "নচিকেতা"র উদাহরণ এসেছে। তাতে ঘোষিত কবিস্বর। বিনষ্ট বা গলিত জীবনের আরোপিত ক্রন্দনে কাতর নন কিংবা পাশ্চাত্য স্বভাবে জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো (Jean Arthur Rimbaud) বা লোরকার অনুভাবের প্রত্যক্ষ প্রেরণাবন্দি নন। যদিও বলতে শোনা যায় 'লোরকার বিষণ্ণ জন্ম'র কথা। কিন্তু তা ব্যক্তি—পরে দেশের পটচিত্রে, পরিস্রুত বাঙালির ভঙ্গুর পীড়িত সমাজ-কাঠামোয়। আগের কাব্যে যেটি স্পষ্ট নামে

www.chinnifoundation.org

প্রকাশিত "গোলাপের নীচে নিহত হে কবি কিশোর", "কবির ভাসমান মৃতদেহ", "আমি অনেক কষ্টে আছি"। বিষণ্নতা ব্যাপক চিত্রে প্রতিফলিত। উপর্যুক্ত উদাহরণটির মতো অনেক পংক্তিতে তা আইকনে পরিণত। সার্বভৌম এ আনুষ্ঠানিকতাটি পূর্বজ অনেক কবি লালন করলেও গভীর অনুভবের চর্চায় বা বিচিত্র বিষয়বস্তুর ভেতর দিয়ে [মৃত্যু, রোগ, নারীর জৈববস্তু (স্তন, যোনী, জরায়ু), মহামারী, মন্বন্তর] তাকে আধারবন্দী করা অত্যন্ত নতুন। এটি প্রকৃতির বিচিত্র রঙে (বৃষ্টি, বৃক্ষ, নদী, পক্ষী) ব্যাপক। কবির টোটেমব্রতও যেন এ ধর্মটিকে অনেক প্রসারিত করে, যাতে মনুষ্যত্ব-মানবিক সারাৎসার রীতিমাফিক তার আদর্শে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। একই সঙ্গে নারীর সত্তাগত সম্ভাবনা ও অধিকার চেতনাও অপরিস্ফুট নয়। তাবৎ মহিমার প্রকৃতি কাব্য-প্রকরণ ধারণ করলে আবুল হাসান নিজের ভেতরে নির্মাণ-পুলকে বা নবায়িত সৃষ্টিতে পৌঁছুলে তার প্রতাপটুকু বিস্ময়কর বলে স্বীকার করার কিছু থাকে না। কারণ, এ পথের বাঁকে এবার তার নব-প্রতিভার স্তর কায়েম হয়েছে, তার প্রকাশ উদিষ্ট *পৃথক পালঙ্ক*। এ কাব্যের প্রবণতা আত্ম-উৎসারণ। রোগশয্যা, স্মৃতিচিহ্ন, অসুখ, নরকের আগুন, রুগ্নতা, হাসপাতাল, মৃত্যু, এপিটাফ-এর ভেতর থেকে পুরাণের পাখির মতো জেগে ওঠা। আত্মার এ জাগর-আখ্যান চিরজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়ী, জয়শ্রী। 'আমার অনলে আজ জাগো তবে হে জীবন, জয়শ্রী জীবন!', 'মধ্যরাতে ঝাউকান্না কেঁদে বলে, শান্তি হোক, ওরে শান্তি হোক!', 'সমস্ত শান্তি ভেঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে মানুষের মনীষার শেষ বৈনাশিকে!'—এভাবে আত্মাকে অনলে পুড়িয়ে, 'শান্তি'-র চিরজীবিত শিল্পকাঠামো রচনা করেন। এতে প্রকরণবৈশিষ্ট্যও নিরূপিত হয়। পুনরুদ্ধার বা রিভাইভ অনেকটা যীশু-পুরাণে-উপনিষদে প্রজ্বলিত। এ প্রজ্বলনের পথ জাগতিক সকল প্রাণীর শুভপ্রেরণায়। কিন্তু সেটি উজ্জীবিত হওয়ার সরণী সমাজ-বিধৃত অভাব, দুঃখ, বেদনা, গ্লানির ভেতর দিয়ে। কবি দুঃখ-বেদনারও কাব্যময় প্রসিদ্ধি নির্মাণ করেন। স্মৃতিসৌধে বা উদ্ধত-ভীতিকর প্রাণীবাচক বিশেষায়ণে তার শিল্পিত রূপ-কাঠামো রচনা করেন। বাংলার প্রকৃতিতে কিংবা বিধৃত বিবর্তিত সমাজ ও জীবনচেতনায় তার পুনর্বয়ন লাভ ঘটে। সমাজের উপরকাঠামোয় প্রকাশিত যে স্তর তার কারণ হিসেবে ভেতরের কাঠামো ও কার্যকারণ সম্পর্ক, কর্পোরেট বা মার্কেন্টাইল বাণিজ্যের শাসনে নিপতিত ব্যক্তি, যে জন্মেই কুঁকড়ে গেছে, ব্যথাদীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু মন ও মনন, প্রেমবিনাশী ও দুর্বিনীত দ্বন্দ্বে সৃষ্ট ক্ষত আর দুঃখচিহ্নিত প্রহরের গরল নিয়ে তবুও জয়ী জীবিতের শান্ত-সন্ধান প্রচেষ্টায় রত কবির উপলব্ধ প্রকরণ। ছন্দও সে লক্ষ্যেই সচেষ্ট। এ শান্তির ইমেজ রূঢ়-বিদ্রূপাত্মক-বিকৃত-কঠোর কিন্তু শেষাবধি উপনীত শান্তি পারাবারে। তৃতীয় এ কাব্যটিতে পূর্বের কাব্যচিন্তনের সরণী বেয়ে কবি পৌঁছেছেন দুর্লভ শান্তি পারাবারে। যেখানে নিজস্ব

www.chinnofoundation.org

রূপ-ধারণাটি পূর্ণ ও জীবনজয়ী মানুষের সারাৎসাররূপে চিহ্নিত। বিভাগোত্তর কাব্যভাবনায় এর স্বরূপ পার্থিবতার ভেতর দিয়ে লোকোত্তর বিশেষত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়। 'মৃত' মানুষের পুনরুত্থানে যে নবজন্ম তা বৃষ্টি, নদী, সমুদ্র, রৌদ্র কিংবা গোলাপ, কোমল হরিণ রূপকে প্রকাশিত। এ রূপকার্থ কবি-উক্তিতে লোকোত্তররূপে পরিগণিত নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তে :

(ক) আমাকে শোনাতে হবে সেই কবেকার এক সত্যমাথুর :
প্রবাহ নদীর প্রাণ,—নাবিকের দল ফিরে এসো,
আমার দু'পাশে আজ মরা ঢেউ, অভিভূত অন্য বন্দর!

(খ) এ বৃষ্টি কি নবজন্ম?
কিছুই জানিনা শুধু অক্সিজেনের নল নাকে নিয়ে বসে থাকি জাগাতুর!
আর শব্দে টের পাই : একলক্ষ জিরাফ, হলুদ সাপ, সিংহের সবুজ দল
সমস্ত জীবন ভেঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে আমার ভিতরে!

(গ) দেরী হয়ে গেছে বৃক্ষ : পায়ে ধরি :—বলো
আমার ক্ষয়িষ্ণু জমি, কোন মহাদেশে গেলে
ফিরে পাবে সুরেলা সবুজ?

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে পুনরুজ্জীবন ঘোষিত হয় কোন মূল্যবোধে? সত্যমাথুর আবুল হাসান পাপ ও পবিত্রতাকে জৈবিক সত্যসন্ধে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে পুরা-ইতিহাস-পুরাণ মিথস্ক্রিয়ায় সামগ্রিক বিষয়কে রূপময় সৌন্দর্যে ভূষিত করেন। সেখানে সৌন্দর্য কামগন্ধভারাতুর, ললিতলোভনকান্তি :

সৃষ্টি এত সৌন্দর্যপ্রধান! সৌন্দর্য এমন ভীরু এমন কুৎসিত!
সাপ, খেলনা, নর্তকী, নদী ও নারী

অপাপবিদ্ধতায় স্বর্গ-নরকের পৌরাণিক বিশ্বাস কিংবা সমাজসাপেক্ষ বেশ্যালয়, ঘোলামদ, অশ্লীলতা ক্ষ্যাপা দূর্বাশার ক্ষেদে পুড়িয়ে ফেলেন। নৈর্ব্যক্তিক চিন্তনে জগতের বৈভবকে এক ধরনের পার্থিবতা দেন, তার ভেতরেই তুমুল হয়ে ওঠে অপার্থিব আকুলতা। যেটি সময় ও সমাজ-নিরপেক্ষ হয়েই চিরন্তনতা লাভ করে। মরমী বা আধ্যাত্মিক অবিনাশী রূপে যাবতীয় কুৎসিত-কণ্টককে হরণ করে। রচনা করে সেই মর্মজ্ঞান—যা একমাত্র ও অনিঃশেষরূপে মানুষেই সর্বশেষরূপে পরিগণিত।

৪.

'ললিতলোভনকান্তি' কবি আবুল হাসান স্বল্পায়ু ছিলেন। উপর্যুক্ত কাব্যগ্রন্থ ছাড়া তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পর প্রকাশিত হয় *আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা* (১৯৮৫)। অগ্রন্থিত কবিতার মধ্যে আবুল হাসানের শব্দানুসন্ধানী, ছন্দবৈচিত্র্যপিয়াসী কবিসত্তায় উন্মোচিত। তাতে দ্বন্দ্বময়, প্রতিবাদী কিংবা

www.chinmofoundation.org

রমণীমোহন রূপ সার্বিক সমাজকন্দরে প্রকাশলাভ ঘটে। এতে কবির উল্লিখিত তিনটি কাব্যেরই ভাবনাজ্ঞাপক মিশ্রিত উপলব্ধি ব্যঞ্জিত হয়। অগ্রন্থিত কবিতাসমূহের ভেতরে পূর্ণ কবির মুখশ্রী নির্ণীত হতে পারে। এ অংশের মুদ্রিত কবিতাও বেশ সুখপাঠ্য। "লোকটা যখোন নিঃসঙ্গ" (শ্রাবণ ১৩৭৫, মোহাম্মদী), "কত বয়স হলো তাদের" (জুন-আগস্ট ১৯৭০, কণ্ঠস্বর), "যাই" (ডিসেম্বর ১৯৭২, পূর্বদেশ) এমন প্রায় দেড়শ'র মতো কবিতা নানা সময়ে (১৯৮৫ পর্যন্ত) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে গ্রন্থিত "যুগলসন্ধি" (ডিসেম্বর ১৯৭৩, দৈনিক জনপদ) কবিতাটি প্রথম দুটি স্তবক উদ্ধৃত করে কবির কাব্যচূড়া সনাক্ত করা যেতে পারে :

দেখা হলো যদি আমাদের দুর্দিনে
আমি চুম্বনে চাইবো না অমরতা!
আমাদের প্রেম হোক বিষে জর্জর
সর্পচূড়ায় আমরা তো বাঁধি বাসা।

থাকুক দু'চোখে দুর্ভিক্ষের দাহ,
ঝরুক আবার আন্ধার আঁধিব্যাধি
আমাদের প্রেম না পেলো কবির ভাষা
কাব্যচূড়ায় আমরা তো বাঁধি বাসা।

বিন্যস্ত স্তবকে নঞর্থকতা সদর্থে পৌঁছায়। যেখানে সর্পবিষেজর্জর (সর্প=কামব্রতের প্রতীক!) প্রেমের অনল উদ্‌যাপিত হওয়ার সুযোগ পায় কাব্যচূড়ায়। প্রেম ও কাব্য সৌন্দর্যের সদর্থকরূপে প্রকাশ পায় কিন্তু এটিও দুর্দিন-দুর্ভিক্ষের মিথুনজ্বালাব্যতিত নয়। এখানে প্রেম 'নিকষিত হেম'। এটিই আবুল হাসানের মর্মজ্ঞান। আর এভাবেই কাব্যপাঠে এক মহৎ কবিকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এছাড়া আবুল হাসানের *ওরা কয়েকজন* (১৯৭৫) নামে একটি কাব্যনাট্যও মৃত্যুর পর সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়।

www.chintofoundation.org

কবি রুদ্র : আপাদমস্তক 'উপদ্রুত উপকূল'

কবিতার অপরূপত্ব অনেক রকমের। কবির হাতে অনুভবের অপরিহার্য উচ্চারণটুকু শামিল হয় ভাষার প্রতীকে। এই প্রতীকে বহু-বিস্তর স্বপ্ন প্রতিপাদ্য থাকে। পুরাণ-প্রত্ন অবিনাশী হয়ে ওঠে। জ্যাক লাঁকা ভাষার সঙ্গে স্বপ্নমাখা জীবনকে মিলিয়ে মনের অন্দর-সদরের, গোপন-উন্মুক্ততার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। মনের কোণের আয়নাকে কোনো ধ্বনি-প্রতীকে বাইরের প্রতিবেশের সঙ্গে সংযোগ করেছেন। আর তাতে আছে সামগ্রিক চেতনার প্রয়াস। যিনি কবি– তার এ চেতনা কারো কারো কাছে 'অবজেকটিভ কোরিলেটিভ', কারো কাছে বিপরীতে 'ইমোটিভ' বা আবেগোদ্দীপক ভূমিকায় প্রদর্শিত। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করি। টি এস এলিয়টের *The sacread wood* থেকে পড়লে দেখা যায় : 'Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the exprision of personality, but an escape from personality. But, ofcourse only those who have personality and emotions know what it means want to escape from these things. আবেগের বিপরীতে নিরাবেগ প্রস্তাবনায় কবি সৃষ্টির প্রত্যয়কে নির্ধারণ করেছেন। কবিতা মন্ময় আবেগের বিপরীতে তন্ময় ও নৈর্ব্যক্তিক বাস্তব প্রেরণাটি গ্রহণ করে, সেজন্য সে শরীরে বহন করে অনেক রহস্যময় প্রতীক, পুরাণ ও মৌহূর্তিক ইমেজ। ইমেজিস্টরাও এই প্রেরণাটি গ্রহণ করেছেন, 'কঠিন বাস্তব আনার' প্রত্যয়ে। এক ধরনের প্রত্যক্ষতাও তাতে আছে– যেখানে শব্দ নির্ধারিত, নির্বাচিত এবং ঘনত্বে ব্যঞ্জিত। রক্তিম এবং তাণ্ডবময় দ্বন্দ্বাত্মক জীবনের চিহ্নিত প্রদাহ। এরূপ পংক্তিমালায় প্রকরণ সম্পর্কে বলা যায় : 'নিরঙ্কুশ অনিবার্য শব্দ প্রয়োগ করতে হবে; প্রয়োজনবোধে চলতি বাগধারা পরম্পরায় রচনা করতে হবে, ছন্দস্পন্দনের পরম্পরা অনুযায়ী নয়; চিত্রকল্পের বিষয়ে নিবিড় রূপদান...'। বিপরীতে আবেগোদ্দীপক ভাষার পক্ষে আই এ রিচার্ডস তার প্রতিবেশ নিরূপণের ক্ষেত্রে বিষয়-প্রবণতায় ভাষার আবেগী সংশ্লিষ্টতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কল্পসৌন্দর্যই সেখানে মুখ্য। অবচেতন বা নিজ্ঞানসত্তায় স্বপ্ন তথা যৌনবিহার অহং-রূপটি এক কল্পপ্রতিমার ধারণার জন্ম দেয়। কল্পনা বা আবেগই সেখানে মুখ্য। রুদ্রর কবিতাপাঠের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও মূল্যায়নের এমন তাত্ত্বিক ধারণা মনে আসে। কারণ, কবিতা স্থির কোনো প্রকরণ নয়। আর যিনি লেখক, কার্যত কবিতা রচনার পর তার মৃত্যু ঘটে [রোলা বার্থ কথিত 'death of the author']। তখন এক একটি লেখা পাঠকের বিবেচনায় হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র আধার। 'লেখকের মৃত্যু' কথাটি আক্ষরিক হলেও লেখকের দর্পিত মুখ বা বিচূর্ণ সত্তার ক্লেশ তাতে জেগে থাকে– যা পাঠকের কাছে বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে।

www.chinnofoundation.org

উপভোগের আলিঙ্গন মস্তিষ্কভেদে ভিন্ন, চেতনার স্তরও আলাদা– সেখানে লেখকের মৃত্যু পাঠকের নিকট অনেক ভাবেই ঘটতে থাকে। বোধ করি সেটিই লেখকের সাফল্য। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১) কবি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ, দশক বিবেচনায় সময় তার সত্তুর, হিমেল বরকত সম্পাদিত *কবিতাসমগ্র* বেরিয়েছে এ বছরই বইমেলায়, যদিও এর আগেও তাঁর রচনা পাঠক সম্মুখে বেশ প্রতাপের সঙ্গেই এসেছে। সুসম্পাদিত এবং তথ্যনিষ্ঠ বর্তমান গ্রন্থটি রুদ্রর শিল্পপ্রতিভার এক আলোকিত মহার্ঘ্য। রাগী, সাহসী, দুর্মর রুদ্র অকালপ্রয়াত হলেও যে কবিতা-বিস্ময় আমাদের কবিতাঅঙ্গনে প্রদর্শিত হয়েছে– তা চিরসমুজ্জ্বল।

উপদ্রুত উপকূল নামকরণের ভেতরেই রুদ্র কবিতার ভরকেন্দ্রে জুড়ে দেন 'নির্বাসিত' সময়ের আখ্যান। কবিতা 'উপদ্রুত' নয় কিন্তু কবির দৃষ্টিকোণটি গড়ে ওঠে উপদ্রুতকে প্রতিঘাত করে। পক্ষে থাকেন উপদ্রুত মানুষের। প্রান্তিক, বঞ্চিত, অপহৃত, বৈষম্য শব্দগুলো– উপদ্রুতের ব্যানারে খচিত। নামটি লক্ষ্যহীন নয়। কখনো চিন্তাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। বুদ্ধির শাসনে তার কবিতা জমে ওঠে। ইমেজ স্ফটিকস্বচ্ছ হয়। 'বাতাসে লাশের গন্ধ' অপরিচিত হয় না। সকলের কাছে পৌঁছায়। এক সফল বক্তব্যে হাজির হন কবি। পূর্বে এ রকম বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম। পরে সুকান্ত ভট্টাচার্য। বাংলাদেশে রুদ্র নিঃশঙ্ক হয়ে এ প্রকরণটি হাতে নেন। সত্তরের প্রারম্ভ থেকেই একটি নতুন স্বরে চিহ্নিত হন তিনি। আমৃত্যু সেভাবেই সচকিত। রুদ্র যেভাবে তার চেতনার পুনর্গঠন করেন, অর্জন করেন কাঙ্ক্ষিত শক্তি– সে ধারাটি মায়াকোভস্কি, পল এলুয়ার, পাবলো নেরুদার। তাঁর কাছে সামাজিক ইতিহাস, আর্থ ইতিহাস, সমাজের স্তরবিন্যাসতত্ত্ব অধ্যয়নের বিষয় নয়, কিন্তু দৃশ্যমান সমাজের ভেতরেই সে অধ্যয়নটি পেয়ে যার তিনি। কবিতার শক্তি হয়ে ওঠে প্রকাশের শক্তি। পংক্তিগুচ্ছের উত্তাপ মানুষের পক্ষে, 'অপর' (otherness)-এর পক্ষে। কারণ নিয়ে, প্রশ্ন নিয়ে, জিজ্ঞাসা নিয়ে– পংক্তির শক্তি দৃঢ়তর হয়। সভ্যতা ও মানুষ অদ্বিতীয় সত্তা, চেতনার প্রথম স্তরে বিবেচ্য সমাজ, উত্তরিত স্তরে (দ্বিতীয় সত্তায়) প্রশ্নশীল বৈষম্য যে ভিত্তি কাঠামো সরাসরি অস্বীকার, এর পরের স্তরে ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের কেন্দ্র অস্বীকার। ক্রমশ কবিতা হয়ে উঠেছিল মুক্তির পতাকার উদ্ভাস। *উপদ্রুত উপকূল* থেকে *ছোবল* শত কবিতার পংক্তিতে ভর করে তপ্ত নিঃশ্বাস আর উদার উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষা :

এ চোখে ঘুম আসে না। সারারাত আমার ঘুম আসে না–
তন্দ্রার ভেতরে শুনি ধর্ষিতার করুণ চিৎকার,
নদীতে পানার মতো ভেসে থাকা মানুষের পচা লাশ,
মুণ্ডহীন বালিকার কুকুরে খাওয়া বীভৎস শরীর

www.chhotofoundation.org

ভেসে ওঠে চোখের ভেতরে– আমি ঘুমুতে পারি না, আমি
ঘুমুতে পারি না...

এটি কী কবিতা? উপরিউক্ত এলিয়টীয় সংজ্ঞার্থটি মিলিয়ে কী এর অর্থ করা যায়? আবেগ-উদ্দীপনা নাকি আবেগ অস্বীকৃত বুদ্ধির প্রস্রবন এখানে নির্ণীত? আবেগ স্বীকার্য হলে কেন্দ্রে কোনটি? নাকি মিশ্র অবভাস এই কবিতা। এখানে চোখ>ধর্ষিতা>মানুষের পচা লাশ>মুণ্ডুহীন বালিকা অভিন্ন হয়ে উঠেছে। কার পক্ষে? নিশ্চয়ই অভিজাত বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব যাদের নিয়ন্ত্রণে তারা নন। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রান্তিক (peripheral), জনতা (mass)– নিশ্চয়ই সমাজে নিম্নবর্গজাত (sabaltern) বলে অভিহিত। শ্রেণিসমাজ-অর্থনীতির ইতালীয় দার্শনিক আন্তোনীয় গ্রামসী বিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশক তিনি দেখেছেন। অনেক পরে তার শ্রেণিসমাজতত্ত্বের নিম্নবর্গের চেতনা পাঠরূপে গৃহীত হয়। কবিদের চোখের সমাজ তত্ত্বে আটকানো নয়, কবিতাও তত্ত্বের জিনিস নয়– কিন্তু উদ্‌যাপনটি তত্ত্বে সংঘটিত হতে পারে। গ্রামসীর সমাজে অনেক কিছু হচ্ছিল তখন, বিশেষ করে রাজনৈতিক সমাজ-অর্থনীতি-দর্শনের পরিবর্তন। ফলে কবিতার ভেতরে ইমেজ, বাস্তববাদ, প্রতীকবাদ আসে এনলাইটেনমেন্টের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরে রুশ বিপ্লব, উপনিবেশ বা আগ্রাসনের আঘাত, শিক্ষা-সংস্কৃতির পণ্যায়ন, 'যার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে উপনিবেশিক অত্যাচারী ইংরেজের তৈরি শিক্ষাপদ্ধতি। গোলাম বানানোর যন্ত্র। যার উপর প্রয়োগ করা হয়েছে এক হৃদয়হীন আচারের ধর্ম। ধর্ম নয়, ধর্মের পোশাক' [*মানুষের মানচিত্রের* স্বীকারোক্তি]। ইত্যাকার প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার ভেতরে কবিসত্তাটি গড়ে উঠলে, পক্ষপাতিত্ব দ্বারা নিষ্পেষ্ট কী তা? অভিপ্রেত সুন্দর বা সৌন্দর্যের বিভাব কাকে বলে? নিষ্ঠুরতার স্তূপে ক্রন্দন থাকে, অনাচার-উপদ্রব থাকে– তারও প্রকাশ কবিতায় ঘটতে পারে, উপলভ্য সৌন্দর্যের হাতছানি সেখানে অন্য মাত্রার। কষ্ট-ক্লেদ-কান্নার স্বর যতোই পরিচিত হোক, বিশ্বকে ক্রন্দনরত করুক– কবিরা তাকে প্রকাশ করেন তীব্রতার অঙ্কে– সেখানে কী জমে না সৌন্দর্যের বিভাব! কিংবা বিভাগের ভেতরে গড়া রঙ-রূপ অপরকে কী হাতছানি দিয়ে প্রতিক্রিয়া-সাপেক্ষ করে তোলে না। রুদ্রর লাইনগুলো প্রত্যক্ষ। অনেক বেশি জীবিত। প্রভূতমাত্রায় কাছের। বহু মানুষকে বাণীটুকু প্রলুব্ধ করে। তা হয়তো সৌন্দর্য মনে না করি। কিন্তু ধ্বনির শক্তি, নিরঙ্কুশ নিঙড়ানো শব্দার্থ, অর্থের যূথবদ্ধ সংক্ষোভ, চাপল্যময় ছন্দের ভেতরে ক্রোধ, শীলিত সন্ধিৎসা, অপার আক্রোশের সৌন্দর্য, চরণাবদ্ধ রূপলীলার সার্বিক মানুষী প্রবণতা আর জীবনের সন্তপ্ততা কী কবিতা করে তোলেনি? স্পষ্ট উচ্চারণগুলি প্রবলভাবে চাবুক পেটায়, নিকৃষ্ট মৃত্যুর পক্ষে দাঁড়ায়, হাহাকারের ভেতরে তৈরি করে মানবতার পক্ষের অনিন্দ্যময়তার অভিমুখ– 'আমি'

www.chinnofoundation.org

পরিণত হয় 'যৌগিক আমি'তে, অভিন্ন আর্তস্বর কূলপ্লাবী হয়ে ওঠে, এককণ্ঠের স্রোতরেখা রচনা করে। রুদ্র ধারালো হন বলেই, ধার ছুঁয়ে চলে প্রতিটি প্রান্ত, এতে পিছুটান নেই, চেতনাতে সবটুকু নির্দ্বন্দ্ব, সজ্ঞানস্তর থেকে নির্জ্ঞানস্তরটিও একই সাড়ায় সমুপস্থিত হয়ে এক অনুভবের কথা বলে। আবেগের নির্যাসটুকু সমর্পিত হয়, মানুষের পক্ষে। যে মানুষ অপার সম্ভাবনার ও নিঃশেষ সৌন্দর্যের। যারা তা রুদ্ধ করে, হত করে তাদের বিপক্ষে সোচ্চার। উপসংহারে রইলো, সব মানুষের জন্য জয়োল্লাস, সভ্যতা ও সৌন্দর্য এক আখরে লেখা, প্রকৃতির পক্ষের ধ্যানও তাই। যেহেতু, মানুষের সর্বোচ্চ রূপটিতেই প্রকৃতি সজ্জিত, মুখ্য ও প্রতিপাদ্য মানবকুল– তবে তাই সত্য হোক। সে সত্যেই প্রতিষ্ঠিত হোক কবিবাণী। সমস্ত উৎপ্রেক্ষা তাকেই বরমাল্য দিক। কালে-কালোত্তরে তা নিরূপিত এবং সেখানেই একত্রিত থাকা কবির প্রধান দায়– প্রকাশভঙ্গিটিও তাই, প্রকাশের ভেতরের প্রবণতাও তাই। সেই সৌন্দর্যই কবির সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথ, শেলী, কীটসও একই প্রবণতায়। অর্ডসঅর্থের প্রকৃতির কিন্তু বিশেষ অর্থে মানুষের, মানুষ ব্যতিরেকে সবকিছুই 'অপার অন্ধকার'। জীবনানন্দ দাশও 'নক্ষত্রের রূপালী আগুন ভরা রাতে'র ভেতরে মানুষকেই দেখেছেন। বস্তুত, প্রবণতায় তারা ভিন্ন, কিন্তু সৌন্দর্যে, বিভাব রচনায়, কোনো কবিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। রুদ্র থেকে আরেকটি কবিতার উদ্ধৃতি :

বদলে যাচ্ছে এই গ্রামখানি, নদীটির তীর
কপালের নিচে সরল চক্ষু বদলে যাচ্ছে।

কিশোরীর ঝাঁক দল বেঁধে আর খেলতে আসে না।
হাতের ভেতরে মমতার হাত, স্বাতির পৃথিবী
বদলে যাচ্ছে– বদলে যাচ্ছে– বদলে যাচ্ছে।
... ...
আমার গ্রামের নদীটির মতো তোমার দুচোখে
কেন বালুচর জেগে ওঠে স্বাতি, কেন শূন্যতা?
সুস্থতা চাও– কোথায় স্বস্তি, কোথায় সলিল?
এইটুকু মদ গরল পানীয় পারে কি ভেজাতে
পৃথিবীর চেয়ে আরো বড়ো এক পোড়া মরুভূমি?

বদলে যাচ্ছে বদলে যাচ্ছে–
রূপশালী ধান গ্রামটিরে আমি বাঁচাতে পারি না,
আঙুলের ফাঁক গ'লে নেমে যায় বাসনার জল
রাখতে পারি না করপুটে প্রিয় স্বপ্ন আমার।

www.shimfoundation.org

'কাঁচের গেলাশে উপচানো মদ' থেকে কিয়দংশ পড়ে নিলে দেখা যায় চিরপরিচিত নিবিড় গ্রাম। 'গ্রাম'ময় কবিতার ভেতরে চোখের সুখ-স্বপ্নউপাচার নির্মিত পৌরাণিক স্বস্তি, বিন্যস্ত সুখের সীমানায় অমোঘ উৎসবের উল্লাস। মানব থেকে যায় তাতে। কিন্তু 'সরল চক্ষু' আর নেই। নেই স্বস্তিটুকুও। গ্রাস করেছে সুখ, গমন করেছে স্বপ্ন। কারা? নগর। রক্ত তাই এখন 'কাঁচের গেলাশে উপচানো মদ'। 'উপচানো মদে' সব কী পরিশুদ্ধ হবে? ইমেজাশ্রিত কারুণ্য, উপচানো মদ, কবির ক্রুদ্ধতার কেন্দ্র। হতাশা ও ক্ষেদের তরল ভূমি। পাল্টে যাওয়া উপাদানের ক্রম-বিবরণ ক্রমাগত দখলে নেয় তার কষ্টকে। ক্ষরণের 'নার্ভাস ব্রেকডাউন' এই উপচানো মদ। কাঁচের গ্লাশ [গেলাশ]-এ তা আরও মৌলিক ইমেজখণ্ডের নিরলঙ্কার দ্যোতনা। কিন্তু তুমুল আশ্চর্যে পড়ে নিই বিষয়ের বাইরে– এর ভেতরের নির্মল কবিতা। শক্তিটুকু প্রকৃত কবির। যার ভূমি ও মাটির শ্বাস লোকজ, উদ্বেল-আখরসমূহ তুমুল জীবনসাপেক্ষ। ব্যর্থ করপুট, স্বপ্নের স্থবিরত্ব কবির 'নাইটমেয়ার'। ব্যাকুল তাঁর প্রতিটি বাতাস, প্রতিটি নদী, প্রেমিকা স্বাতি আর বাসনামাখা আনন্দ। এটি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে চরণবিচ্ছুরিত অভিজ্ঞানে। *ফিরে চাই স্বর্নগ্রামে* ভূমিসন্তানের অনিঃশেষ কলরোল চিহ্নিত। 'হারাই হরিনপুর', 'একজোড়া অন্ধ পাখি', 'নিখিলের অনন্ত অঙ্গন', 'গহিন গাঙের জল' প্রভৃতি একরকম ভাবনার স্পেলের বিন্যাস। 'আমি' মিশে গেছে উত্তাপ উঁচানো সময়ের স্মরণীয় ময়দানে– সেখানে আনখাগ্র ছুঁয়ে-ছেনে ভরে উঠেছে নিজস্ব আঙ্গিনা। 'লহ এ নগর, ফিরে দাও স্বর্নগ্রাম'– আখ্যান। এ কাব্যটির ভাষাপুটে লোকজ তৃষ্ণার অগ্নি যেন একাকীত্বের ঘরে বাসা বেঁধেছে। একাকী মন ও একক চোখ কখনো দূরবীণে কখনো অনুবীক্ষণে পরিপূর্ণ এক 'অপূর্ববস্তু-নির্মাণ' রচনা করে। উপর্যুক্ত কবিতায় স্বভাব-বর্ণনার ভেতর দিয়ে সৌন্দর্য পুনর্গঠিত হয়, চিত্তের চমক প্রসারিত হয়। কবিচিত্ত ও সমাজচিত্তের অদ্বৈত রূপ চিত্তে নবরস সৃষ্টি করে। প্রকাশপদ্ধতিটিও স্বতন্ত্র। অর্থগৌরবই এখানে মুখ্য। এটি তৈরি হয়েছে ব্যক্তিঅবক্ষয়জাত দর্শনের উপলব্ধি থেকে।

রুদ্রর কবিতার উত্তুঙ্গ অবস্থান *মানুষের মানচিত্র* কাব্যটিতে। কমিটেড এবং তুমুল 'বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত'। সমব্যথী কবি। ঠিক বিপরীত অর্থে অনুমান করি 'অন্তরে রুদ্ধ শক্তির পীড়া'। কবির শক্তি বিদীর্ণ। অর্থ তাৎপর্যময় একটানা বত্রিশটি নামহীন কবিতা, একসুতোয় আটকানো– মানুষের মানচিত্ররূপে। স্বীকারোক্তিসমেত গড়ে ওঠে স্তবকগুচ্ছ। তাতে দানা বাঁধে তুফান দিন :

পাখির নাহান ডাকো। মাঝরাতে ডাক দাও পাখির গলায়।
আমি কি বুঝি না ভাবো? কাতলা মাছের মতো ঘাই মারে বুকে,
ওই ডাক ঘাই মারে রক্তে-মাংশে। ভাবো ঘরে আছি খুব সুখে।

www.chinnofoundation.org

আহারে পোড়া সুখ– তুফানের গাঙ দেখে মাঝি সে পালায়।

নিরহঙ্কার দৃষ্টিপাতে উত্তর-উপনিবেশ চেতনাটি অহঙ্কারী হয়ে ওঠে। শস্য-শ্যামল প্রকৃতি অস্তিত্বে ও জাতীয়তায় গাথা। কবি তাতে বরমাল্য দেন। নিকটতম হন ডায়ালেক্টের ভেতর। ঘনিষ্ঠতায় আত্মার সংলগ্নতায় কাব্যরস বিরল আস্বাদে উপভোগ্য হয়। স্ফূর্তিতে ঢেলে দেয় জন্ম-যৌবনের সবটুকু অপরূপত্ব। এ চেতনা সাতচল্লিশ-পরবর্তী সময়ে ক্রমশ অধিকৃত হয়। রুদ্রর এ অধিকৃতি সবকিছু আত্মস্থ করে। এ আত্মস্থতায় প্রধান হয়ে ওঠে 'অপর' চেতনা। শ্রেণিচেতনাও। বক্ষ্যমান কাব্যে যা উত্তুঙ্গ পর্যায় স্পর্শ করেছে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রে আপন সত্তার স্ব-স্বীকৃতি এবং শ্রেণিচ্যুতির ভেতরে অস্তিত্বের উদ্‌যাপন। প্রান্তিক কে? কেন সে প্রান্তিকরূপে সমাজে শ্রেণিচ্যুত। কর্তৃত্বের বিপরীতে প্রান্তিকের আস্তিত্বিক অভিব্যক্তি বিষয়ীরূপে ধরা পড়ে। তাতে কবিবিভাব হয়ে পড়ে আরও সংহত, ঋজু। বৈষম্য স্থানচ্যুত করে শ্রমজীবী-প্রান্তিককে কর্তৃত্ব প্রদান, তার সংস্কৃতির সরল সুখকে গ্রহণ করার সংকল্প গৃহীত। কারণ, এইটিই প্রকৃত জীবন-সংস্কৃতি। দ্বান্দ্বিক সমাজের অভিমুখটুকুর নেতৃত্ব দেয় এই শ্রমী সমাজ-সংস্কৃতি। প্রথা, ভোগবাদী আচরণ, নিশ্চল স্থবিরত্ব, বুর্জোয়া ভুঁইফোড় সংস্কৃতি উপর-কাঠামোতে চাকচিক্য ও জৌলুস আনলেও মৌলিক স্তরে কোনো সফল সূচক তৈরি করতে সক্ষম নয়। কারণ, প্রথাগত আচরণের বাইরে সচল পরিবর্তনের সে বিরোধী। স্থবিরত্ব কাটিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সম্মিলিত শক্তিকে নেতৃত্ব দিলে কর্তৃত্ব থাকে না, জড়তা ভাঙলে শোষণ ও ক্ষমতার কেন্দ্র ধ্বসে পড়ে। 'ধর্ম আফিমের ন্যায়' তাতেই শোষণের শক্তি দৃঢ়তর হয়। নিশ্চল সমাজে মুষ্টিমেয়ের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক এর বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতায়ন, তার লোকজ সংস্কৃতির অভিপ্রায়ের প্রসার ও স্বীকৃতি, নিশ্চলতাকে অস্বীকার করে দ্বন্দ্বগত অভিমুখে সমাজের প্রকৃত শক্তিকে চারিয়ে দেওয়া, ধর্মকে জীবনবাদী প্রয়াসে ব্যবহারিক জীবনের অংশ করা, প্রকৃত জাতিসত্তার পরিচয়ে বিবর্তনমুখী আচরণের ভেতর দিয়ে স্বপ্ন ও বাস্তবের মোকাবেলা করা, 'অর্ধেক তার করিয়াছে নারী'র অধিকার ও সাম্যতা আনয়নের তত্ত্বটি প্রাচ্যীয় ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। আর সে পক্ষেই সংস্কৃতির দ্বন্দ্বাত্মক অভিমুখ রচনা। কবি সমাজ নিঃশ্বাসটুকু চিনে ফেলেন, গোড়ায়। তাই ভুঁইফোড় নগরে নয়, স্থবির ফ্যাশন দুরস্ত চাকচিক্যে নয়, আরোপিত পণ্য-সংস্কৃতিতে নয়; ফিরতে চান স্বর্নগ্রামে– যেখানে 'পাখির নাহান ডাকো', যেখানে 'মাঝরাতে ডাক দাও পাখির গলায়'। এ ডাক মধুগন্ধে ভরা। নির্মল বায়ু ও প্রশ্বাসে বাঁচা। সম্মিলিত সংস্কৃতিতে বাঁচা। স্থবিরত্ব বা কর্তৃত্বের বিপরীতে দ্বন্দ্বাত্মক অভিমুখে চলা। তাই তো লোকজীবনের দস্তুর। প্রথা, গোষ্ঠীতাকে অস্বীকার করে মানুষের নিরন্তর সম্মুখগামী ঐক্যসূত্রটি চিহ্নিত করা। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিন্নতাই তো জাতির

www.chandrofoundation.org

স্বাতন্ত্র্য। নবায়ণ ও নতুনত্বই তার সার। রুদ্রর কবিতার প্রধান শক্তি জন-সংস্কৃতির মূলে ফেরা, কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে বৈষম্য নয়, সাম্যের দর্শন প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য তার প্রেরণা 'মাঝির ডাক'। যে ডাকে তার অস্থিমজ্জা কেঁপে ওঠে, রক্তমাংসে প্লাবন তোলে। এ জেনুইনিটি কালে কালোত্তরের কথকগণ সৃজন করেছেন। 'মূল', 'শেকড়', 'অস্তিত্ব', 'সত্তা' একটি বন্ধন। পরিচিতি। রুদ্ধদ্বার ভাঙার প্রেরণা। মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার শক্তি। 'উপনিবেশ' একটি মুখস্থ পাঠ। দাসত্ব আর বন্ধ্যাত্বের বন্দীশালা। *মানুষের মানচিত্র* রচনার প্রাক্কালে রুদ্র বলেছেন : 'একটার পর একটা খাঁচা নির্মাণ করেছি আমরা। আবার সে-খাঁচা ভেঙে নোতুন খাঁচা বানিয়েছি। আবার খাঁচা ভেঙেছি– আবার খাঁচা বানিয়েছি। খাঁচার পর খাঁচায় আটকা পড়তে পড়তে, খাঁচার আঘাতে ভাঙতে ভাঙতে, টুকরো টুকরো হয়ে আজ আমরা একা হয়ে গেছি। প্রত্যেকে একা হয়ে গেছি। কী ভংকর এক একাকিত্ব! কী নির্মম এই বাস্তবহীনতা!! কী বেদনাময় এই বিশ্বাসহীনতা!!!' তিনি আরও বলেন : 'আমাদের কৃষকেরা শূন্য পাকস্থলি আর বুকে ক্ষয়কাশ নিয়ে মাঠে যায়। আমাদের নারীরা ক্ষাধায় পীড়িত। হাড্ডিসার। লাবণ্যহীন। আমাদের শ্রমিকেরা স্বাস্থ্যহীন। আমাদের শিশুরা অপুষ্ট, বীভৎস করুন। আমাদের অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধা, অকালমৃত্যু আর দীর্ঘশ্বাসের সমুদ্রে ডুবে আছে। পৃথিবীর যুদ্ধবাজ লোকদের জটিল পরিচালনায়, ষড়যন্ত্রে আর নির্মমতায় আমরা এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা আর চরম অসহায়ত্বের আবর্তে আটকা পড়েছি। কী বেদনাময় এ অনিশ্চয়তা! কী বীভৎস এই ভালোবাসাহীনতা!! কী নির্মম এই স্বপ্নহীনতা!!!' কমিটমেন্টের এই স্বর তার কবিতার নির্মাণ-ভিত্তি। নির্ভার উপমা ও উৎপ্রেক্ষা কিংবা সাধারণ অর্থে শব্দের পর শব্দ তৈরি করছে কাব্যবিভাব। স্বভাবোক্তির প্রচল ধারা তাঁর কবিতায় অক্ষুণ্ন থাকলেও চলমান সময়ের ভেতরে তা পেয়েছে স্বতন্ত্র অর্থগরিমা। কবি-স্বীকারোক্তির ভেতরে বলা আছে :

> *আমি* একা। এই ব্রহ্মাণ্ডের ভেতর একটি বিন্দুর মতো *আমি* একা। *আমার* অন্তর রক্তাক্ত। *আমার* মস্তিষ্ক জর্জরিত। *আমার* শরীর লাবণ্যহীন। *আমার* স্বপ্ন নিয়ন্ত্রিত। *আমার* জিভ কাটা। তবু এক নোতুন পৃথিবীর স্বপ্ন *আমাকে* কাতর করে। *আমাকে* তাড়ায়। [ইটালিকস করা শব্দ আলোচনার প্রয়োজনে]

এই 'আমি' এবং যৌগ 'আমরা' কবিতার রুদ্রকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে? উদ্ধৃতি:

> সোনার খাঁচায় বেঁধে রেখেছে পাখিটি, পায়ে সোনার শিকল।
> আহারে রঙিলা খাঁচা! দেখতে কি অপরূপ পাখির ঘর,
> পাখির আকাশ আজ বাঁধা প'ড়ে আছে ওই খাঁচার ভিতর।
> বুনো গান ভুলে গেছে, শিখেছে নোতুন বুলি, নয় কোলাহল।

www.chinnofoundation.org

প্রতীকময় বন্ধনরজ্জুটি সংসারে আছে, সর্বত্রই আছে। সেটি ভাঙতে হলে, পুনর্নির্মাণ করতে হলে, চিন্তায় আটকাতে হলে, আনন্দময় করতে হলে কোনো শক্তির 'নিয়ন্ত্রণ' চলে কী? তাহলে সভ্যতা কীভাবে নির্মিত হলো। কীভাবেই বা তা সামনে এগুবে! প্রশ্নশীল কবি পুনর্বার ফেরেন প্রশ্নে। তাইতো ক্রোধে গর্জে ওঠেন, সংলাপে গড়েন ভূমি-ভাষা, উত্তপ্ত হয়ে নিজেই যেন পাশে দাঁড়ান জনতার পাশে, তুলে দেন তার ক্ষমতা :

থামা, খানকির পোলা তোর ইলা-বিলা থামা। মানুষের ঢল
দ্যাখ নোনা দইয়ের মতো কূল ভেঙে কেমন গর্জায়ে ওঠে।
কেমন শিমুল দ্যাখ, রক্তজবা কিরকম রাঙা হয়ে ফোটে।
খুনের বদলে খুন, জুলুম চালালে নেবো জুলুমে বদল–

এভাবে দায় ও অধিকার হয়ে ওঠে কবিতা। কবিতার স্বর ও ধরণ পাল্টায়। রুদ্র 'ইশতেহার' তৈরি করে ফেলেন। এ কী নান্দনিক অভিজ্ঞানের জন্য প্রতিবন্ধক! 'art for art's sake' কথাটি চুলোয় যায়! রুদ্র শিল্পের এ তত্ত্বের তোয়াক্কা করেননি। শিল্পকে করেছেন অস্ত্র। বেছে নেন স্বচেতনার ধর্মটি। 'মাইসেলফনেস' হয়ে নন্দনের জগত সৃজন করেন। 'দুর্ভিক্ষ আর দুঃশাসন যার নিভৃত বাসনাগুলো/ দুমড়ে মুচড়ে তছনছ করছে'– এটি কী কবিতার শিল্প? এ প্রশ্নে শরণ নিই নন্দনতাত্ত্বিক বুচারের :

The sting of the pain, the disquiet and unrest arise from the selfish element which in the world of reality clings to these emotions. The pain is expelled when the taint of egoism is removed. [বাস্তব জগতের ভাবের সাথে যে স্বার্থ জড়িত থাকে, তা থেকেই অস্থিরতা, অশান্তি ও বেদনার দংশন তৈরি হয়। সে স্বার্থ বা অহং দোষমুক্ত হলে বেদনাও তিরোহিত হয়]

রুদ্র বেদনার দংশন থেকে মুক্তি পেতেই চেয়েছেন। এতেই তার আনন্দ। 'ক্যাথারসিস' তাই-ই। রসাধারও তাই। এভাবে রুদ্র যে নন্দনলোকের সৃজন ও প্রতিষ্ঠা করেন, সেটি শুধুই তত্ত্ব নয়, ফিরে যাওয়া নয়, প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ফিরে পাওয়া সহজাত প্রকৃতির জন্য আকুতি। সেজন্য পংক্তিমালায় তার ব্যবহার্য রূপ-নিশানা : স্মৃতি, তর্পন, অলৌকিক প্রকৃতি, নস্ট্যালজিয়া, অবসেশান প্রভৃতি। ইত্যাকার উপাদানে তিনি বাংলাদেশের কবিতাধারায় এক স্বতন্ত্র ভূ-ভাগ রচনা করেন। এ ভূখণ্ড নিশ্চয়ই নিজের– সেটি ভাষা ও বিভাবের চিরচাঞ্চল্যে মুদ্রিত। অভিব্যক্তিতেও তুমুল, ক্ষুরধার– প্লাবনমুখিও। এক্ষেত্রে রুদ্র কবিতার শব্দে হয়ে ওঠেন জহুরী, সোচ্চার শব্দধনুকী সৈনিক। এটি আরও সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে শেষদিকের *দিয়েছিলে সকল আকাশ* ও *মৌলিক মুখোশ* কাব্যে। রুদ্রর বদল

www.chinnafoundation.org

ঘটানোর পরিপ্রেক্ষিত এতে আছে কিন্তু তার বিচিত্রপ্রবণতার স্বরূপ নির্ণয় হয় অগ্রন্থিত বিপুল রচনায়।

দুই.

ছোবলের পর বেপরোয়াভাবে চলা রুদ্রর জীবন নানাভাবে কাব্যময়। তাঁর রঙ ও রূপের খেলায় স্বতঃশ্চল। এই স্বতশ্চাঞ্চল্য ধরা পড়ে নানাসময়ে লেখা প্রচুর অগ্রন্থিত কবিতায়, গল্পসিরিজে, গানে, কাব্যনাট্যে। নিজেই তিনি এসব আঙ্গিক নির্মাণ করেন। নিশ্চয়ই এর পেছনেও একটি পাঠ আছে। কেননা, কোনো আঙ্গিকই সমাজদ্বন্দ্বের বাইরের নয়। প্রকরণ তো একটি প্রবণতাও বটে। এই প্রবণতায় পুনর্গঠিত রুদ্রর ভিন্ন স্বর। নতুন রূপালীরেখা বলে তার পাঠও আলাদা, ভিন্ন প্রতিপাদ্যের।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ আনখাগ্র কবি, সেটি প্রতিষ্ঠিত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কবি ও কবিতাই তাকে সে অভিধাটি পাইয়ে দেয়। আজকে মৃত্যুর পরও আমাদের হাতে অনিবার্য হয়েছে যে স্বর্ণমুদ্রা, তার সমাজ নিহিতার্থ কী, কেন তিনি বাংলাদেশের কবিতার মৃত্যুঞ্জয়ী কবি, কেন তাঁর কবিতাসমগ্র মেলে দেয় অপার শক্তি ও সম্ভাবনার উপলব্ধ আকস্মিকসমূহ! সর্বদা তিনি যে কঠোর জীবনের কথাই লিখেছেন, তা নয়। বরাবর যে একটি সুরেই গান করেছেন তাও নয়। রুদ্র সৃষ্টিশীল থেকেছেন অলৌকিক আনন্দের উৎসারণে। এ সৃষ্টিশীলতায় উপভোগ আছে, ঋষিমন্ত্রের সুখ আছে, অধ্যাত্ম অবিনাশী কৃতীও আছে। বাংলা ভাষার ঐতিহ্য কী? তাতে তার সংস্কৃতির প্রকাশইবা ঘটে কীরূপে। এ সংস্কৃতির বিবর্তনের ধরণ কী? জনসংস্কৃতির মুখ্য অবকাশ কী? অধ্যাত্মমন্ত্রের শখ ও সাধনা এ আলো-হাওয়া-প্রকৃতিতে কীভাবে বাঁধা। সেটি তুলে আনার উপায় ও উপলভ্য কী। রুদ্রর কবিভাষা সে কাজটি সম্পন্ন করেছে। নিরঙ্কুশভাবে করেছে। নৈমিত্তিক হয়েও তা হয়ে উঠেছে নিরাবলম্ব। নির্জ্ঞানলোকে পৌঁছেছে তার সজ্ঞান-সাধনা। নিরালোকে চালিয়ে দিয়েছেন তিনি দিব্যরথের চাকা। এ লক্ষ্যে আমরা প্রচুর উপাদান যেমন খুঁজে পাই তাঁর অগ্রন্থিত কবিতায় তেমনি শব্দযুদ্ধের ভেতরে শানিয়ে তোলেন তিনি সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ-আলেখ্য। এ স্বরূপ-সন্ধান তার লক্ষ্য ছিল না, বেপরোয়া-বোহিমেয় রুদ্র সচেতন অভিজ্ঞানে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কিছু করেননি। কবিতা তার অবলম্বন-আরাধনা-লৌকিক বিহার। এ পরিভ্রমণের ভেতরেই তিনি হয়ে ওঠেন অলৌকিক আনন্দের সারথি। কবিতায় নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠার ক্ষমতা– তাই তার জন্মমৃত্যুর উল্লাস। কার্যত, তাই বেঁচে থাকা। সেভাবেই আলো আর আলোর পথের যাত্রীদের খুঁজে চলা। অগ্রন্থিত কবিতার খররৌদ্রের ভেতরেই বাউলিয়ানার রীতি, বাউল বাসর, গড়ে উঠেছে। আবার *বিষ বিরিক্ষের*

www.culturefoundation.org

বীজ কাব্যনাট্যের ফর্মেও তাঁর প্রকাশশীল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে চিররূপময়। বিভিন্ন সময়ে লেখা অগ্রন্থিত কবিতা থেকে :

ক.
তোমার সাগর বুকের নিবিড় চর নিসর্গ
গ্রাস করে নেমে যাচ্ছে ঠিকানাবিহীন প্রবাসে
হে সিন্দাবাদ, মাল্লার জলজ চোখে নীল অনিদ্রার
মাতাল পালে থেমে আছে মৌশুমি আকাশ
এখন প্রতিধ্বনি থেকে সশরীরী বিশ্বাস
জেগে ওঠো ধ্বনিময়–

খ.
আজ, নয় কাল, নয় একদিন
পথ শেষে গন্তব্যের চূড়া দেখে তরুতলে কুড়াবো বকুল,
জীবনের সমস্ত কালো মেঘ ভেসে যাবে হিমেল বাতাসে।

গ.
প্রতিটি দিনের শেষে
ব্যস্ততার ঘামে ভিজে, গায়ে মেখে প্রয়োজনের ধুলো ও বালি
চোখের গভীরে এক গহিন খোয়াব
ফিরে এসে দেখে যাই ঘাসের গালিচাখানি–
তুমি জানো, ঘাস নয়
ঘাসেরো অধিক এক সবুজের টানে
আসি আমি।
আর সে সবুজ থাকে নির্জন দিঘির মতো
তোমার দুচোখে॥

সত্তুরেই তার কবিতা উৎকৃষ্ট মাত্রা পেয়ে গেলে আশিতে তা স্বতঃধার, অনেক কবিতাই লেখা হয়, বৈভবের উৎসবে গুরুত্বও পান তিনি; মিঠেখালি-মংলা-বাগেরহাট-ঢাকার আবাস, নিয়তই তাকে দেয় অনেক কবিতা, কবিতার গড়া চেতনার প্রতিমূর্তি অনেকদূর তার ব্যাপ্তি-বিস্তৃতি; ক্রমশ তারই প্রতিক্রিয়া– এই সমাজ ও রাষ্ট্রে গৃহীত। মেরুদণ্ড সোজা, কলমে বিপ্লবী। সমাজ শোষক-স্বৈরাচারের অশনি, রাষ্ট্রের দানব; বিপরীতে জনতার হাতিয়ার। নিরঙ্কুশ প্রেমিক, অলৌকিক বাউল– এমন নানা অভিধায় সম্পূর্ণায়ত রুদ্র। তাঁর নানা সময়েরলেখা উপর্যুক্ত কবিতাসমূহ কখনো মংলায়, কখনো ঢাকায়– সত্যিকার কবির চান্দ্র-প্রতিলিপি। কী পাই তাতে? নেই শুধুই প্রতিকার, শ্রেণির হাহাকার। কবিতা কখনো নিছক নন্দনেরও। প্রেমিকার প্রলয়ের উল্লাসও। বাউলিয়ানার মন্দ্ররূপ, কোমলতার তীব্র আকর্ষণ, প্রহরীর বন্দনার ক্লেশ কী নয় তা! পংক্তির কৌমার্য যেন চিরপ্রসূন।

www.chinnofoundation.org

সুকুমার। রুদ্র এসব কবিতায় উচ্চমাত্রা স্পর্শ করেছে। উপভোগ্য এবং অন্তহীন অনুভবে তা দুর্মর আলোকজ্জ্বল। ধ্বনির ঝংকার এবং অভ্যন্তরীন স্পন্দন তাতে অনতিক্রম্য নয়, বহুদূর ব্যাপ্ত। জগতের সমস্ত আলোকরশ্মি তা গ্রহণ করেছে। খুব প্রিয় দুটো কবিতার কিছু লাইন ধরে রুদ্রকে আরও মহার্ঘ্য করে তুলি। কবিতা দুটির নাম "অভিমানের খেয়া" এবং "খতিয়ান"। প্রথমেই "খতিয়ান" থেকে :

ডেকে ওঠো যদি স্মৃতিভেজা ম্লান স্বরে
উড়াও নীরবে নিভৃত রুমালখানা।
পাখিরা ফিরবে পথ চিনে চিনে ঘরে,
আমারি কেবল থাকবে না পথ জানা

"অভিমানের খেয়া" থেকে :

এতোদিন কিছু একা থেকে শুধু খেলেছি একাই,
পরাজিত প্রেম তনুর তিমিরে হেনেছে আঘাত
পারিজাতহীন কঠিন পাথরে।
প্রাপ্য পাইনি করাল দুপুরে,
নির্মম ক্লেদে মাথা রেখে রাত কেটেছে প্রহর বেলা–
এই খেলা আর কতোকাল আর কতোটা জীবন!
কিছুটাতো চাই– হোক ভুল, হোক মিথ্যে প্রবোধ,
অভিলাষী মন চন্দ্রে না-পাক জোস্নায় পাক সামান্য ঠাঁই,
কিছুটাতো চাই, কিছুটাতো চাই।

সত্যিকার অর্থে, কোনো কবিতার অংশবিশেষে পুরো কবিতা-রস আহৃত হয় না। এখানে তুলে ধরা কবিতাপংক্তি কীরূপে উপভোগ্য তার কিয়ৎ নমুনা প্রকাশ করে লেখাটির সমাপ্তি ঘটাতে চাই। এক তুমুল প্রার্থনা ও অসীম প্রণোদনা নিয়ে পুনর্গঠিত "খতিয়ানে"র পংক্তিবিশেষ। কীরূপে? ছবিটি স্মৃতিকণ্টকিত। 'রুমাল'গন্ধীও। রুমাল এখানে ইমেজাশ্রিত। প্রভূত দাপটের সঙ্গে একীকৃত। তাকে বিশেষায়িত করা হয়েছে নীরব ও নিভৃত শব্দযোজনায়। 'ডেকে ওঠা'র প্রত্যয়টি আহ্বান নয় শুধু, প্রণয়ের এবং ঈষৎ বিরহতাপিত। যেখানে স্বচ্ছন্দে দণ্ডায়মান প্রেমিকা। যিনি রুমালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। *ওথেলো*র প্রণয়-অবলম্বি যেন এ রুমাল। আর সেটি তো পৃথিবীজুড়ে প্রণয়কামীদের সন্দেহ আর থরোথরো দ্বিধার প্রলাপন। এখানে তা পেয়েছে অনাদ্যন্ত রূপ। প্রান্তিক স্বরে তা ভেতরে ভেতরে দুর্বিনীত এবং মায়াবী ভাবনার অভিমুখে প্রকাশ্য। কিন্তু এসব গৎবাঁধা স্বরে আটকায় না। তিনি দ্যোতিত হন পরিস্রুত দার্ঢ্যে। সময়ক্লিষ্ট কোমল ও জটিল উপাচারে। তাতে বঙ্কিম হয়ে ওঠে দৃষ্টিপাত। স্বরে আসে গহীনতা। সুরের কার্নিশে জমে ওঠে তীব্র মাদকতা। সংশ্লেষের রঙয়ের ফেরারি দ্যোতনা।

www.amarfoundation.org

www.chinnofoundation.org

আশির কবিতার নির্মাণচিন্তা ও প্রতিষ্ঠিত সঞ্চয়

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতা অনেক বৈভবে উত্তীর্ণ। এর কারণটি নিহিত তার ভিত্তিমূলে। পাঁচের দশক থেকে কবিতায় যে স্বপ্ন-বিশ্বাস জারিত হয়েছে তা পূর্ণায়ত সত্যরূপ অর্জন করে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে। একটি ভূখণ্ডের জাতীয়তাবাদী চেতনা যখন সফল ও উত্তীর্ণরূপে পর্যবসিত হয় তখন সমাজের সমস্ত সম্মুখগামী পথের উন্মুক্তি ঘটে আর পেছনে পড়ে থাকে যাবতীয় অন্ধকারাচ্ছন্নতার আবর্ত। এমন ঐক্যবদ্ধ আর্তনাদ কুলছাপানো বিশ্বাসকে সম্মুখ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করে। 'পলাতকা ছায়া' দৃষ্টি এড়ানো সংস্কার অতিক্রম করে প্রকৃতসত্যে যাপিত জীবনে পৌঁছায় আর এবংবিধ প্রত্যয় গ্রহণ করে। বিশ্বাসের মূলমন্ত্রে সবকিছু শিখরস্পর্শী হয়ে ওঠে। এতে করে সাহিত্যও সর্বাত্মক উদ্ভাসিত হওয়ার শক্তি অর্জন করে। বাস্তবতার কার্ণিশে তখন অনেক আলো প্রতিফলিত হয়, কল্পনার প্রতিচিত্রে ধারণ করে ব্যাপক মাত্রা। কিন্তু খুব তড়িৎ সেসব ফ্যাকাশে বা বিবর্ণ হতে থাকে, সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতার একাধিক আবর্ত। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটও একরকম পুঁজিকেন্দ্রিক রাজনীতির সমর্পণ নেয়। জাতীয়তাবাদী ঐক্যের ভেতরে শ্রেণিচরিত্রের শোধনশক্তি, নীতি-সাম্যের দৃঢ়তা, উৎপাদন-সংশ্লিষ্ট শ্রমমজুরির দায়িত্বসমেত ইত্যাকার প্রতিষ্ঠার শর্তসমূহ শিথিল হতে থাকে। অসহায়ত্ব তৈরি হয় রাষ্ট্রশক্তিতে আসীন শ্রেণিটির। খুব স্বল্প সময়ে তা ভোগবাদী, স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেণিতে পরিণত হয় এবং ঐ আন্তর্জাতিক পুঁজিশক্তির অংশে একীকৃত পায়। বাইরের প্রলুব্ধতায় অবক্ষয়ের জন্ম হয়, একে একে গজিয়ে ওঠে অহংতাড়িত, ভোগলিপ্সু কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণি। বৈষম্য, স্বেচ্ছাচারিতা, অপরাজনীতি, ক্ষমতাদাপট এ শ্রেণিকে রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রে থেকে সমস্ত দুর্বৃত্তায়নের বিকেন্দ্রীকরণে তৎপর হয়। কেউ বিলাসব্যসনে গা-ভাসায় কেউ অনাহারে অর্থহীন স্বাধীনতাকে ধিক্কার জানায়। এরূপ ফলশ্রুতিতে সাতের দশকের মধ্য সময়ে সিভিল রাষ্ট্রশক্তির নির্মম অপচয় ঘটে এবং বিপরীতে প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক-স্বেচ্ছাচার শক্তি সাম্রাজ্যবাদের মদদে ক্ষমতাসীন হয়। আমলাতান্ত্রিক স্থবির শ্বেতহস্তীমার্কা বিলাসব্যসনদুষ্ট পরাজিত মূল্যবোধের উচ্ছিষ্টভোগী কিছু ব্যক্তির আয়োজনে সামরিক স্বেচ্ছাচারিতায় পূর্বতন আয়ুবী উদাহরণমার্কা রাষ্ট্রশক্তি রচিত হতে থাকে। সেখানে আবার মীমাংসিত বিষয়টি বিপ্রতীপে অমীমাংসার তকমা আঁটে; জিগির ওঠে সাম্প্রদায়িকতার-ইসলামি মূল্যবোধের, সামরিক লেবাসে গণতন্ত্র আর মুক্তিযুদ্ধে-অর্জিত রাষ্ট্রের মৌল স্তম্ভগুলো বাতিলের প্রচেষ্টার। ততদিনে ক্ষয় ও বিনাশ শুরু হয়েছে ব্যক্তির ভেতরে-বাইরে। দ্রুতলয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

www.chirnofoundation.org

ভঙ্গুর, অবকাঠামোসমূহ নিরাপত্তাহীন, অকার্যকর। ঐ স্বপ্নদেখা উঠতি মধ্যবিত্ত পরিশুদ্ধ কবিকুল আবার হতাশায়-নৈঃশব্দ্যে বিবর্ণ-বিদীর্ণ। সাতের দশক এরূপ স্বপ্নভঙ্গ-আশাভঙ্গ, অবক্ষয়িত, বিচ্ছিন্ন অনাচারে দীর্ণ হয়ে পড়ে। আবার উজানে ফেরার প্রতিধ্বনি শুনতে পায়। ব্যক্তিচিন্তা ও মূল্যবোধসমূহ পথ খোঁজে পরিশুদ্ধতার আশাবাদে উত্তীর্ণ হওয়ার। কবিতায় মুক্তিযুদ্ধফেরত কবিরা একদিকে দেশাত্মবোধে উদ্গ্রীব আবার চলতিপত্রে হতাশ-ক্রুদ্ধ। চরম ও জটিল দোলাচলতায় মুখ ব্যাদান করেন অনেকেই। চোখের সামনে উৎপাদন সূত্র-সম্পর্ককে পাল্টে যেতে দেখেন। শ্রেণিস্তর সৃষ্টি হতে দেখেন। সেখানে উঠে আসে বিবিধ মুখ; ভোগ ও পণ্যবৃত্তির বিচিত্র আস্তরণ, বৈষম্য ও আরোপিত পুঁজির প্রকোপে বিষ্ভূত ব্যক্তি-প্রতিকৃতি। বিকৃত, গলিত মূল্যবোধের করালস্পৃষ্টরূপ সমাজে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। স্বাধীনতার স্বাদ গৃহীত হতে থাকে আত্ম-উন্নতি ও স্বার্থবুদ্ধির অবলম্বনরূপে। সমষ্টিচেতনা বা দেশাত্মভাবনার ঊর্ধ্বে বড় হয়ে ওঠে ব্যক্তির ভোগবাসনা। অচিরেই এসব অপপ্রস্তুতির ভেতরে ফিকে হয়ে যায় শ্রেণিচরিত্রের প্রগতিবাদী রূপ। অন্ধকার অচলায়তনে ঘুরপাক খায় জাতিগোষ্ঠীর চেতনা। বৈষম্যের ভেতরে ব্যক্তি হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন বা অপক্ষমতার দোসর। ইত্যাকার বাস্তবতায় কবিতা নামের শিল্প অনেকের কাছেই অন্যরূপে আসে। মুখ ফিরিয়ে পৌঁছান হাতাশার ভেতরে। আশা-হতাশা জমাটবদ্ধ হতে থাকে। বিপর্যয়ের ভেতরেই সতৃষ্ণ আশাবাদ ঘনীভূত হয় কবিগণের ভেতরে। কবিতার প্র্যাকটিক্যাল প্রচ্ছদপটে জমা হয় অন্যেতর উপাদান। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্বের প্রণোদনায় ঐক্য আর সত্তাবিকাশের সত্যপ্রকাশ অনতি-পরবর্তীতে আর থাকে না। উপর্যুক্ত কারণসূত্রে তা ঘটলে কবিব্যক্তিত্বে তা প্রকাশরূপে আসে। 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' কিংবা 'বাতাসে লাশের গন্ধ'র পংক্তিমালা ক্ষেদ বা সন্তপ্তর শ্বাসক্ষেত্ররূপে চিত্রাভাস তৈরি করে। এ চিত্রাভাসে চেতন-অবচেতন স্বরূপ আছে একই সঙ্গে কাব্যরূপে সম্মুখে এগুনোর মাত্রা আবিষ্কারের চেষ্টাও থাকে। সেখানে প্রাপ্তস্বদেশ এবং তার ভেতরে ব্যক্তির বিচিত্রকৌণিক স্থিতি ও প্রণোদনা প্রগতিরূপে পরিস্রুত হয়। কারণ, কবিব্যক্তিত্ব যে কাব্যশক্তি আয়ত্ত করে তার মৌলিক সদিচ্ছা বা মর্জি ওই শর্তেই গৃহীত। এবং সমাজের উৎপাদন সম্পর্কে ব্যক্তির অন্তর্স্থিতরূপে তা প্রকাশমান। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী দশকের কবিরা সে সত্যে জীবনদৃষ্টিকে বহন করেন। তবে কবি অভিজ্ঞান ততোধিক কালবৃত্তস্পর্শী বলে তা স্বভাবিকভাবেই বিন্যস্ত হয়, প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতসমূহ পজেটিভ আত্মস্থ করে নিজের ভেতরেই রূপান্তরিত উৎস রচনা করে। লক্ষণীয়, সাতের দশকের শেষদিকেই কবিতার স্বাধীন 'বাংলাদেশ'-বীক্ষাটি কবিব্যক্তিত্বে স্বয়ম্ভূ এবং কাব্য পরিব্যাপ্ত বৈশ্বিক সকাশে। এমনটা বিন্যস্ত ভাবে-ভাষায়-ভঙ্গিতে, আনীত চিত্ররূপে বিচিত্র চিত্রকল্পে; পর্যবসিত

www.chintofoundation.org

মেসেজ যে ঐক্যের বিপরীতে অনৈক্য বা বিচ্ছিন্ন-অবক্ষয় সেখানে আবার ঐক্য-সম্ভাবনা আর এমন সর্বাত্মক সত্যে মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অর্জিত দেশে পূর্ণায়ত ব্যক্তিজীবনকে বিজয়ী দেখা, জীবনবাদী দীক্ষায় ঈপ্সিত অর্জনকে নিরীক্ষা করা—এরূপে প্রকরণ প্রতিভাসিত হতে থাকে। কবিরাই সেটি স্বতঃস্ফূর্ত গ্রহণ করেন। আর কবির উক্তি ও উপলব্ধি সেটিই চেতন বা অবচেতন উপায়ে গ্রহণ করে। এমন উদাহরণ আশির অনতি-পূর্বে অনেকের আঙ্গিকে মেলে। যেমন : দাউদ হায়দার (*সম্পন্ন মানুষ নই* : ১৯৭৫), আবিদ আনোয়ার (*প্রতিবিম্বের মমি* : ১৯৮৫), আবিদ আজাদ (*ঘাসের ঘটনা* : ১৯৭৬), নাসিমা সুলতানা (*মৃগয়ায় যুদ্ধের ঘোড়া* : ১৯৮৫), ত্রিদিব দস্তিদার (*গৃহপালিত পদ্যেরা* : ১৯৯৬) প্রমুখের পংক্তিমালায়। সেখানে ক্রমশ উজ্জ্বলতর হতে থাকে বাঙালিত্বের অহংকার উপাদান আর ঐতিহ্য-আধুনিকতার মিথস্ক্রিয়া প্রয়াস। উঠে আসতে থাকে বৈশ্বিক-আদিষ্ট আঙ্গিক আর রাষ্ট্রবাঞ্ছিত ব্যক্তির ন্যায়-আদর্শ-অধিকারভিত্তিক সম্ভাব্য আত্মিক অনুরণিত উপকরণসমূহ। এরূপ ধারাবাহিক 'চঞ্চল অঞ্চল প্রবাহে' সত্তরের প্রান্ত ছুঁয়ে আশির কবিকুলের উদ্ভব। প্রসঙ্গত কোনো দশক বিচ্যুত বা পৃথক করে নয় কবিরা ধারাবাহিক প্রণোদনাই ধারণ করেন এবং সে মতেই উঠে আসেন। তবে আশির কবিরা এক রকমে আলাদা প্রতিশ্রুতি ধারণ করেন সময় ও কাল-আদৃত চেতনায় ভর করে। একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা আশিতে সমাসীন, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশ-সম্ভূত চেতনার স্থিতি ও পুনর্গঠন প্রত্যয় মনোবৈশ্বিক স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত। এরূপ আকুলতা কাব্যপ্রকরণে যুক্ত হয় আধুনিক ইঙ্গিতে। তবে সত্তরের যুদ্ধপ্রজন্ম আখ্যায়িত কবিরা কাল-বাস্তবতায় যতোটা একীকৃত—সময়ের ব্যবধানে উত্তরিত কবিতা কবিদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে অনেক বেশি সম্ভাবিত সংযত, ইমেজাশ্রিত এবং কাব্যগুণান্বিত। স্থির ও পরিপক্ব যুক্তিতে এ দশকের কবিতা অবশ্যই আনুপূর্বিক এবং বৈচিত্র্যরঞ্জিত। সে কারণে, গঠন-নির্মাণে তার সিদ্ধতা অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও আগ্রহব্যঞ্জিত।

বেছে নেওয়া যায় এ দশকের কবিতা ও কবিব্যক্তিত্ব। ময়ুখ চৌধুরী, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, বিষ্ণু বিশ্বাস, মারুফুল ইসলাম, সাজ্জাদ শরীফ, শোয়েব শাদাব, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ প্রমুখের ফর্মবিন্যাসে আগ্রহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত। কবিতাকে টেক্সট্ মেনে এর নির্মাণ ও নির্বাচনকে বিবেচনায় আনা যাবে। প্রথমে ময়ুখ চৌধুরী চিত্রকল্প-উপমায় ও শব্দ-নির্বাচনে আধুনিক কাব্যপ্রয়াসের বিরচন ময়ুখ চৌধুরীর (জ. ১৯৫০) কবিতা। মেঘ-সমুদ্র-নদী-স্রোত প্রত্ন-মর্যাদায় অভিষিক্ত কবির কবিতায়। তাঁর কাব্যে রোম্যান্টিক হাওয়ার স্পর্শ থাকলেও বুদ্ধির প্রখরতা সমুপস্থিত। তবে মানুষ ও প্রকৃতির পরাবর্তটি তাঁর উচ্চারণের আবর্তকে দেয় পাল্টে :

www.chinnofoundation.org

আমি কাল চলে যাচ্ছি। বাতাসের হু হু কান্না; স্মরণীয়—
এখন ভাটির টানে,—দেরি হয়ে যাচ্ছে ফিরে যাওয়া।
পলিমাটি রেখে যাচ্ছি;—প্রবাহের সারমর্ম শষ্য বুঝে নিও।
সমুদ্রকে বলে দেবো—যথারীতি পৌঁছে দেবে উপযুক্ত হাওয়া।

জলমাটিহাওয়ার আবহে গড়া বাঙালির সিক্ত মন—তার প্রেম, অলৌকিক শক্তি নিয়ে প্রতিভাত হয় কবিতায়। খুব শক্তিশালী তাঁর মনন বা বুদ্ধিপুঞ্জ। ক্রমাগত তিনি কবিতার ভেতরে পরিস্রুত হয়েছেন। প্রতিবাদী রূপ বা দ্বন্দ্বাত্মক শক্তি ময়ূখ চৌধুরীর কবিতার 'পোয়েটিক' শরীরকে নির্মিতি দেয়। ঐতিহ্য-কাঠামোয় গ্রাম ও নগর উভয়ই নিজস্ব স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যে কবির কাব্যে রূপায়িত। এখানে কবিতায় মগ্নতায় দৃঢ়তা যেমন আছে তেমনি তার চেয়ে বেশি আছে পূর্ণাঙ্গ আবেগের ঋজু প্রণয়ভাষ্য। কবিতা ইতিহাসে গুরুত্ববহ বুদ্ধি ও চিন্তার চিরনবায়নের বিস্ময়মুগ্ধতা। সমস্ত আন্তঃসম্পর্কের বাইরে তাঁর কাব্যভাষা অলৌকিক নন্দনমাত্রায় উন্নীত। উচ্চতাও অর্জিত শিল্পে নির্ধারিত। 'ইন্টারনেটে উড়ে যাচ্ছে সভ্যতা। আড্ডা জমে উঠেছে রোবটের সঙ্গে।... বাতিল হয়ে যাচ্ছে সবকিছু; দেহ এমনকি মনও'—কী যৌক্তিক দর্শনভিটেতে শরণ নেন কবি—যেখানে বৈশ্বিক তাণ্ডবসমূহ অন্তর্লীন আর জীবনের জন্য নির্বাচিত। তাঁর কাব্য সেরূপেই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর দেশের প্রযুক্তি কালবৃত্তে জৈব-উপাদান প্রযুক্ত হলেও—এর দৃষ্টিকোণ অজস্রতায় আলোকিত, সেখানে শুধু পার্থিব প্রয়োজন নয়, অপার্থিব স্ফটিক মায়াও অনিবার্য করে তোলা হয়েছে। কবির এ উত্তরিত প্রণোদনার রচন : *কালো বরফের প্রতিবেশী* (১৯৮৯), *অর্ধেক রয়েছি জলে, অর্ধেক জালে* (১৯৯৯), *তোমার জানালায় আমি জেগে আছি চন্দ্রমল্লিকা* (২০০০), *প্যারিসের নীলরুটি* (২০০১), *আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে* (২০০২) প্রভৃতি।

আটের দশকের অসুস্থ কবি বিষ্ণু বিশ্বাসের (জ. ১৯৬২) কাব্য *ভোরের মন্দির*, আমাদের অভিজ্ঞতায় নতুন। জীবনানন্দর পরে আবুল হাসান চেতনায় তিনি প্লাবিত। বোহিমেয়, বিষণ্ণগ্রস্ত কবি। কাঠামোবন্দি মৃত্যুচিন্তার দ্বারা; কখনো হতাশা নিদ্রাচ্যুতি। পূর্ব-অভিজ্ঞতাতাড়িত হলেও স্বকীয় স্বদীক্ষিত রূপটি ভিন্নতর। দার্শনিক-বীক্ষায় বিমূর্তকে মূর্ত করে তোলেন; আর ডিসকোর্সে তা থাকে অপাপবিদ্ধ। রহস্যের বেড়াজালে আদেশ থাকে তীক্ষ্ণধী স্বপ্নে বাঁচবার আকুলতা। এজন্য কবিকুশলতায় মিথরূপে বিস্তৃতি পায় 'ঘোড়া', 'শব', 'অন্ধকার', 'সমুদ্র' ইত্যাকার সব প্রসঙ্গ। অক্ষরবৃত্তের নিরীক্ষায় তিনি কখনো প্রতিষ্ঠিত কখনো বেসামাল—তবুও স্বাতন্ত্র্যে হয়ে ওঠা সব পংক্তিমালা 'তারার আঁধারে আপাতত থাকো, রাখো অবগুণ্ঠন/ লাল কমল নীল কমল ঝলমল' কিংবা মাটির গভীর থেকে

www.chhandofoundation.org

সমলয় নৃত্যে, আসে/ বালির আড়ালে ধ্বনি/ মুক্তি, সাধনা, শক্তি'। রূপকথার অলৌকিক আনন্দটি যেন লৌকিকতায় পর্যবসিত। দুর্দান্ত এ কবি কিছু কবিতায় সত্যের দিশারী। কিন্তু পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার আগেই বিলীন। বিষ্ণু বিশ্বাস ও তাঁর কবিতা :

তখনও অনেক বাকি ভোর
অন্ধকার এবং অমেয় জলের বাষ্পে
টুকরো পাতার তরবারি বেজে চলে
ঝুনুঝুনু।
অতর্কিতের গুনে গুনে প্রহর
ঘুমিয়ে গিয়েছে কর্ণ
তার উন্মীলিত চোখে হলদে জ্যোতির্লোক
হয়ত তখনই জেনেছিল নিদ্রাচ্যুতি মৃত্যু
ভোরের চিলের ডানায় উড়ে যাবে শব
শূন্যে, সমুদ্রে
নিরঙ্কুশ কাকের আধিপত্যে সৌন্দর্যের সড়ক
শহর, পালাবে আদিভূমে
যেখানে সূচনা—চেতনার।

কবিতার কাব্য কী? 'সময়' ও তৎ-পরিবেশ থেকে বিচ্ছুরিত নির্ধারিত শব্দের বাঞ্ছিত উপমেয়-প্রতীক। শব্দ রূপান্তরিত ইমেজে, যে ইমেজ ক্রমশ দখল করে প্রতিপার্শ্ব, সর্বকালের (অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ) হয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু যেন তাতে করায়ত্ত ও নিবিড়। পরিচর্যা-ব্রতী রূপান্তরিত শব্দপ্রতীক 'চেতনা'র পুনরাবিষ্কারে মত্ত। সে চেতনার ইতিহাসটি অঙ্কন করেন কবি বা উত্তরকবি। অপরিমেয় তার আর্তি ও অভিষেক। উপর্যুক্ত উদাহরণে 'টুকরো পাতার তরবারি বেজে চলে রুনুঝুনু'। কেন? তন্ময়তার ভেতরে নৈঃশব্দ্য, ব্যক্তি অবক্ষয়িত ও হতাশাদীর্ণ। অতিন্দ্রীয়তায় পৌঁছয়, বস্তুকে বিসর্জন দেয় না। গোনা প্রহরে 'কাক', 'শব' 'সৌন্দর্যের সড়ক'—এসব প্রভূত হয়ে আসে। 'সর্বস্ব-ব্যক্তি' সেঁধিয়ে যায় শবে, সেখানেই 'শব' আর 'কাক' নিরঙ্কুশ হয়। অনবরত পলাতক সব সৌন্দর্যতা জড়িয়ে নেওয়া সম্ভব, ঐ কবিতার কারণেই। আবুল হাসানও তো তেমনটি লিখতেন। এখানে একটি আশ্চর্য লাইন ভিন্নতর পরিমার্জনায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে—'হয়ত তখনই জেনেছিল নিদ্রাচ্যুতি মৃত্যু'। 'নিদ্রাচ্যুতি মৃত্যু'—অনেক কড়া, কঠোর-উত্তীর্ণ ইমেজ। এসব একটি সমাজ-কাঠামোর ভেতর দিয়ে স্ফটিকরূপ পায়। যেখানে মধ্যবিত্ত ব্যক্তির বিকাশ ও শীলনসন্ধান নির্মিত। সমাজ স্তরান্যাসে তার আর্থ-অবস্থানই গড়ে দেয় আন্তর-অনুসন্ধানী সম্বন্ধসূত্র। কাব্যসূত্রটিও সেরূপেই পরিগণিত। বিশ শতকের ভাববিশ্ব আমাদের জাতীয় চেতনার উন্মীলন

www.chintafoundation.org

যেমন ঘটিয়েছে তেমনি পাদবীক্ষেপে বৈশ্বিক আত্মতাও দান করেছে। এতে করে দৈনন্দিনতার আওতায় বিবিধ প্রচল বিশ্বাসে চিড় ধরেছে, মলিনতা দূরীভূত হয়েছে। ভেতর পাদবীক্ষেপ তাতে জমা পড়েছে অনেক উক্তি, অনচ্ছ-অজাচার আর অন্ধতার পরের আলো; আর সে আলোর আরও প্রতিবিম্বিক বর্ণালী-প্রলেপ। তাতে বস্তুজগত এক বিরাট-বিপুল প্রগলভতা পেলেও প্রতিক্রিয়ায় বন্দী পুঁজির করাল ফাঁদে, আরদ্ধ কর্পোরেট চালানে সবকিছু ও সর্বাত্মক নিপতিত। কখনও তাতে সরাসরি ইন্ধন রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্রের। রাষ্ট্রও পুঁজির ফাঁদে আটকায়, পলে পলে দোর্দণ্ড দণ্ডাঘাত তাতে। প্রচল ধর্ম কিংবা 'অধর্ম'কে সে ব্যবহার করে—যেখানে ব্যক্তি-সংস্কার সমূল প্রোথিত। যেমনটি নির্ধারিত, এ পাঠে, আপামর ঐরূপে দণ্ডিত, স্থবিরতা কেটে যাচ্ছে, পুঁজির বিবিধ প্রকোপ বাড়ছে, ভোগবাদ বা ক্ষমতায়নের বিচিত্র পল জেগে উঠছে আর থেমে গেছে মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রের আরদ্ধ আবদ্ধ আবেগসমূহ। তখন আমাদের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গসমূহ একটি বার্তায় উঠে আসছে বা ব্যক্তিতে প্রেথিত হচ্ছে। তখন কবিপ্রণয়, রাগ-অনুরাগ-অনুভূতি সর্বোপরি বৈশ্বিক দ্রুততার সম্বিৎ ও বিবিধ আঁচড় জমে উঠতে থাকে আসীন কবিতায়। এরূপ কবিদর্শন এ ভূমিতে মাত্রিকতা পেতে থাকে বিচিত্র দোর্দণ্ডতায় ও প্রতাপে। বিষ্ণু বিশ্বাসের ভেতরে যে কবিব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা তা আরও অনেকের মধ্যে মিলতে থাকে। যেমনটি অভিজ্ঞ খোন্দকার আশরাফ হোসেনে (১৯৫০-২০১৩)। সময়ে আশির, কিংবা আবির্ভাবেও; কিন্তু উত্তীর্ণ ব্যক্তিতে ও অভিজ্ঞতায়, বয়সে ও ধৈর্যে, সংহতিতে। ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার মৌল চেতনাকে ষাটের দশক এবং পরবর্তীতে আশির দশকে সুচিহ্নিত অনুবর্তী ভেবে নবরূপরীতিতে তিনি উদ্বোধিত। সমকালীনতার সঙ্গে মেশেন। অপরূপ ধ্বনিময়তায়, অনুসন্ধানী ও আত্মচেতন। বোধে তুলে আনেন চিরায়ত সব শব্দপ্রতিমা—যার নির্মিতিতে দেশাত্মবোধ, সূক্ষ্মতর প্রবৃত্তি-সংবাদ, গীতিকা-গাথার লোকায়ত অনুষঙ্গ, প্রেম-বৈরাগ্য-সমাজ-সংগ্রাম সামূহিক সংবেদন সূত্রগুলি সুপিনদ্ধ ও শীলিত। উল্লিখিত ও নির্ধারিত কবিতার শব্দবন্ধে, জায়মান চিরায়ত স্নিগ্ধতা; প্রতীকময়তা স্বকীয়মাত্রায় উৎকীর্ণ। তাঁর *তিন রমনীর ক্বাসিদা* (১৯৮৪) রূপময় কাব্য। *পার্থ তোমার তীব্র তীর*-এ আমিত্ব ও আত্মরক্ষার সংগ্রাম স্ফটিকায়িত। 'মানুষকে কেউ ধারণ করতে পারে না/ না নিসর্গ না ঈশ্বর না প্রেম না ঘৃণা'—এমন ধারণা-অভিজ্ঞতা বহুবিস্তারী মাত্রায় পরিগণিত। তবে *জীবনের সমান চুমুক* (১৯৮৯), *সুন্দরী ও ঘৃণার ঘুঙুর* (১৯৯২), *যমুনাপর্ব*, *জন্মবাউল*, *তোমার নামে বৃষ্টি নামে* (২০০৮) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে একটি দাগী কবিমুখ চিহ্নিত হতে দেখা যায়। উত্তর-আধুনিক ধারণা বিচিত্রভাবে তার ভাবসত্তাকে দখল করে। স্বদেশ-স্বাজাত্য বোধ পেরিয়ে জীবন-মৃত্যু কিংবা সমাজ-রাজনীতির প্রসঙ্গ স্বতঃস্ফূর্ত করায়ত্ত তাঁর

www.shimmofoundation.org

কবিতা। এজন্য ইমেজ-পরিকল্পনেও ঘটেছে রূপান্তর। তবে কোনো উদ্দিষ্ট বিষয়ক বার্তা নয়; কাব্যনন্দনের প্রকৃত পটচিত্র নির্ধারণে তিনি কামিয়াব অনেকটা :

আমাকে পাবে না প্রেমে, প্রার্থনায় নম্র হও পাবে,
কামে-খামে আমি নেই, পিপাসায় তপ্ত হও, পাবে।

কিংবা,

আমি চিৎকার করে বললাম, 'তোরা কারা?'
ওরা বলে, আমরা তিন বোন, তিন শুদ্ধ জগতের মেয়ে।'
'কাখের কলসে কী?' পূর্ণতার অবিমিশ্র ফল ও জলধি।

আমরা যাচ্ছি দূরে মুগ্ধতার রাজবাড়ি, তুই যাবি আমাদের সাথে? সময়ে আশির, কিংবা আবির্ভাবেও; কিন্তু উত্তীর্ণ ব্যক্তিতে ও পরিশুদ্ধতায়। কবির গীতিকা-গাথার লোকায়ত অনুষঙ্গও পরিপক্ব। প্রেম-বৈরাগ্য-সমাজ-সংগ্রাম সামূহিক সংবেদন নির্দেশিত। ইত্যাকার উপাদান-সূত্র কবিকণ্ঠে শীলিতরূপে প্রকাশ। বোধে অসীম-অপার্থিব বারতা বিদ্যমান। উল্লিখিত ও নির্ধারিত কবিতার শব্দবন্ধে, জায়মান চিরায়ত স্নিগ্ধতা; প্রতীকময়তা স্বকীয়মাত্রায় উৎকীর্ণ :

এক লাটিমের মতো স্থির বিন্দুতে ঘূর্ণিত হ'তে হ'তে
হারালাম গতির সমূহ স্পর্ধা, সকল উদ্ধার
বিনয়ের ঝঞ্ঝাপাতে আমার সুগ্রীব অহংকার
মাটিতে নমিত হলো

পাশ্চাত্য-প্রভাবিত কবির উত্তরিত অংশটি দুর্বল হলেও জীবন-মৃত্যু কিংবা প্রচ্ছন্ন সমাজ-রাজনীতি স্বতঃস্ফূর্ত করায়ত্ত কবির কবিতায়। ইমেজ-পরিকল্পনে রূপান্তর আছে। তবে কোনো উদ্দিষ্ট বিষয়ক বার্তা নয়; কাব্যনন্দনের প্রকৃত পটচিত্র নির্ধারণে তিনি সম্মুখগামী। *ঝঞ্ঝা ও পুনরুত্থান* (১৯৯২) অসীম কুমার দাসের (জ. ১৯৫৯) একমাত্র কবিতাগ্রন্থ। এর বাইরেও অনেক কবিতা লিখেছেন—যা অগ্রন্থিত। ২০১১ তে *ঝঞ্ঝা ও পুনরুত্থান*-এর পরিমার্জিত সংস্করণ বেরিয়েছে। তাঁর কবিতার mode of expression ইন্দ্রজালময় ঊর্ধ্ব-জগতের বাণী শোনায়। Imagination (স্বপ্নকল্পনা)-এর ভেতরে কবি প্রেমকে প্রতিষ্ঠা দেন অনির্বচনীয়-অজস্রতার ইঙ্গিতে। সেখানে পুরাণ প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত :

লক্ষ্যহীন আশা বা দুরাশা
দাবানলে
অর্জুনের গাণ্ডীব দহনে যার
সমাপ্তি ঘোষিত ছিলো
নিয়তির অনিবার্যতায়

পরিবেশনায় ফ্রিভার্স, প্রযোজনা অসীম মহাজাগতিক শূন্যতার। অসীম কুমার দাস প্রয়োগকৃত ছন্দে প্রাণবন্ত, আধুনিকতার অভিযাত্রায় তিনি রাজসিক :

www.shimoforumdation.org

ওখানে খুঁজোনা তুমি, এ্যান্টিগোনি,
ওখানে রুদন্ত রাত্রি চেরনোবিল—
জিউসের ব্রজাগ্নিশিখায়
ওখানে থিবিস-কালো হাড়;
ওখানে তোমার ভাই
অনেক লাশের নীচে লাশ।
অনেক আগুনে শুদ্ধ—ঈডিপাস।

আগুনের পুরাণ-ব্যাখ্যায় পরিশুদ্ধতা কিংবা ধ্বংসরূপ, ধ্বংসের ভেতর থেকে জেগে ওঠা পুরাণের পাখি—সেখানে চেরনোবিল হয়ে ওঠে মর্মন্তুদ, অনেক মানুষের লাশের স্তূপ, কষ্ট-ক্লান্তির পুরাণ, আহাজারি-অমানবিকতার চিরন্তন দলিল, আবার ওই আগুনেরই অপররূপে ইডিপাস জ্বলেপুড়ে আত্মআবিষ্কারে অপরূপ হয়ে উঠতে পারে, সে চেয়েছিলও তাই। এভাবে অপরূপ কাব্যমালার অনিঃশেষ তপ্তযুদ্ধের দ্বান্দ্বিক আখ্যান রচনা করেন অসীম কুমার দাস। অলৌকিক অনিঃশেষ বারতায় একাধারে ভক্তি-প্রার্থনা অন্যদিকে প্রেমবন্দনায় দূরাভিসারী তিনি। সেখানে জাগতিক সীমানা ছাড়িয়ে কাব্যলোক অধিকার করে নতুন বিকীরিত আলো। 'তোমাকে পাওয়ার আগে/ কুরুক্ষেত্র/ তোমাকে পাওয়ার আগে/ ট্রয়'—পংক্তিতে বিবৃত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পুরাণ, কিন্তু কার্যত তা নিরন্তর প্রেম, সমাপ্তিহীন প্রণয়যুদ্ধ। অসীম কুমার দাসের এ কবিতা অনন্তের এবং আঙ্গিকে অব্যাবহতভাবে নতুন। **মাহবুব হাসান** (জ ১৯৫৪) সত্তরের তরুণ কবি, যাঁর কবিত্বমেধা বিকশিত ভিন্নতর ভূমিতে। পেরিয়ে আসেন সত্তর-পূর্ব বহুমুখী কাব্যধারার উত্তরাধিকার। 'ঘেসোশব্দ, ঝিঁঝিঁপোকা, সুনসান নিসর্গ-প্রকৃতি আর কুলিকামিন মানুষের কথামালা আমরা প্রায়-নতুন করে ফেললাম আমাদের কবিতার স্বপ্নময় ভূ-ভাগ।' মাহবুব হাসানের কবিতার প্রেক্ষাপট মুক্তিযুদ্ধ, নতুন অর্জিত স্বাধীনতা। এর পরিপ্রেক্ষিতে আশাবাদ অভিপ্রেত কিন্তু ক্রমশ অবসিত আমাদের স্বপ্নময় সম্ভাবনাসমূহ। মোহভঙ্গ-চিহ্নিত হয়ে পড়ে কবিতা। তবুও কবি পেরোতে থাকেন উজ্জীবনের মন্ত্রে, ক্ষতচিহ্ন বহন করেও শোনান আশাময় আহ্বান :

আমি বৃক্ষের সহোদর
অঙ্কুরিত হয়েছি মাটিতে
মৃত্তিকা আমাকে ছেনে-ছেঁটে মানুষ করেছে
তার সোঁদা স্বাদে আমার গা ভরপুর

এক্ষেত্রে কবি-কানন অনেকটা চিরায়ত ও সারস্বত-সন্ধিৎসু, শৈশব-নস্ট্যালজিক। কবিতা তাঁর আটপৌরে উক্তিবাহিত, মেদহীন, মনোহারী প্রসাধন অবসিত। গদ্যআভারঞ্জিত, ঘরোয়া কথন পরিস্রুত স্পন্দন আকর্ষণীয়। মন্দাক্রান্তার (৪+৩) মোহ আকর্ষণীয়। এসবে ঐ চিরায়ত-নিসর্গ, গ্রামপটচিত্রের ব্রাত্য ছায়াচিত্র প্রসাদ-

www.chirnofoundation.org

উত্তীর্ণ। তবে অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিক শ্লেষ ও স্যাটায়ারেও উত্তপ্ত তার মনোভূমি। মিথের ভেতর দিয়ে ঐতিহ্য-আধুনিকতার কিংবা আন্তর্জাতিকতার চর্চা তিনি করেছেন। নাগরিক-স্বভাব সেখানে দুর্মর, নেই স্থূল রোমান্টিকতার আরোপ। বড় কবির প্রত্যয়টিতে মাহবুব হাসান ক্রমাগত সম্মুখে এগিয়েছেন। তৃতীয় কাব্য *নিসর্গের নুন* (১৯৯০) থেকে অগ্রসরমান। *আমার আকাশ* (১৯৯৮) কবির বড় কাজ। কার্যত এ পর্ব থেকেই তিনি উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়। পরের দিকে দীর্ঘকবিতার ঝোঁক পরিলক্ষিত। তাঁর কাব্য *তন্দ্রার কোলে হরিণ* (১৯৮৪), *তোমার প্রতীক* (১৯৮৬), *তাজা গ্রেনেড কিংবা দিবাস্বপ্ন* (১৯৯৩), *পরীর পঙ্‌ক্তিভোজ* (২০০৮) প্রভৃতি। **ফরিদ কবির** (জ. ১৯৫৯) স্থির মেজাজের পরিপক্ব কাব্যরথী। পরিশ্রমী ও বিশুদ্ধ কথক :

বীজের জানালা খুলে ভেতরে তাকাও
সুন্দরী ফলের মধ্যে ঘুম যায় আমার অরণ্য

বা,

কাঠের শরীরে গাঢ় নীল দাগ দেখলে বুঝবে
দুঃখে ছিল পাখি-সম্প্রদায়
কীভাবে মুছতে হয় বেদনার জল
সেই মন্ত্র তোমাদের জন্য জানা হয়ে গেছে।

জীবনের সূক্ষ্মতর অভীপ্সার রং ও রেখাকে সময় নিয়ে আত্মস্থ করা এবং একইসঙ্গে পরিবর্তন ও বিবর্তনকে যেন নিবিড়তায় প্রকৃতিভাণ্ডে তুলে দেওয়া। অমিত সম্ভাবনার এ কবি জীবনকে অনন্ত করে তুলতে চান বৃক্ষ-পাহাড়-পাখি-ফল-ফুল এসবের ভেতর অবগাহনে। যন্ত্রসভ্যতা অনেক কিছুকে কৃত্রিম বানালেও মানুষ তো তার মূল্যবোধ নিয়ে মূলেই ফিরতে চায়। ফরিদ কবির অনবদ্য সে উচ্চতায় ফিরেছেন—দিয়েছেন তাতে জীবনজৌলুসের পদভার। ছন্দকে নিরীক্ষায় এনে জীবনকে এরূপে গ্রহণ কিংবা তার সম্ভাব্য সূত্রটির পর্যবেক্ষণ—একটু আলাদা রকমের (distinctive)। ফরিদ কবির সৌন্দর্যকে বোনেন; ছন্দ সেজন্য নানারকম, ইমেজও চাঁদ-জ্যোৎস্নার পরিচর্যায় আলোকিত। তাঁর কাব্য : *হৃৎপিণ্ডে রক্তপাত* (১৯৮৫), *ওড়ে ঘুম, ওড়ে গাঙচিল* (১৯৯৮), *অনন্ত দরোজাগুচ্ছ* (১৯৯১), *মন্ত্র* (১৯৯৯)। সম্পাদনা করেছেন : *পঞ্চাশ বছরের প্রেমের কবিতা* (১৯৮৬), *কবিদের লেখা প্রেমের গল্প* (১৯৮৭), *দুই বাংলার কবিতা* (১৯৮৭), *একুশের গল্প* (১৯৯১), *একুশের কবিতা* (১৯৯১), *দুই বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্প* (১৯৯৪), *স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি* (১৯৯৪), *হৃদয়ে আমার বাংলাদেশ* (১৯৯৪) প্রভৃতি। **সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ** (জ. ১৯৬৫) কবিতা-কাঠামোতে ঋজু, পরিশ্রমী, যত্নবান। মানবিকতার অহংকারটি শুধু সুকবি বা সম্ভাব্য কবি হিসেবে নয়, বড় কবি হিসেবে। কাব্যভরা এ

www.chinmofoundation.org

কবির যাত্রা অনেকান্ত, অনেকদিকে। আমাদের প্রত্যাশায় তিনি অনেক দূরের যাত্রী—বিশেষত উদ্বেগের প্রাবল্যের চিহ্নিত মাত্রাটি যাচাইসাপেক্ষে। এ সতর্কটিতে তাঁর কবিতাগ্রন্থ : *তনুমধ্যা* (১৯৯০) এবং *পুলিপোলাও*, *কবিতাসংগ্রহ* (২০০৬)র "টায়রা" থেকে :

কে তুই দুঃখের ধন, মরণের মূলধন মম
কোথা হতে, কোন পথে, পৌঁছে গেলি এ দূর প্রয়াগে
খুঁজে পেলি জীবনের জননের দ্বিবেণীসঙ্গম
নিখিলের আদিতম জীবনের, জননের আগে?

কিংবা,

ঋতু রুদ্ধ হয়েছে আমার
ঝরে গেছে জরায়ুর মুকুল সকলই
থেমে গেছে আদিগন্ত কোকিল-কাকলি
তবু কি রে ক্লান্ত হয় জন্তু কামনার?

ছন্দে পূর্ণ-নিরীক্ষা, আর সে নিরীক্ষার প্রকোষ্ঠে অবক্ষয়িত কাতরোক্তি, সংশয়গ্রস্ত আকুলতা, সন্ত্রস্ত দ্বিধা। কাব্য-বিকীরণে অনিরুদ্ধতা, জনম-জন্মান্তর রাগ-বিরাগ ও প্রেমান্তর প্রসঙ্গ। পরিচ্ছন্ন রুচি আর অপার-অনুভূতির বিলোড়ন, উপমায়—নির্ধারিত নিরীক্ষাতেও। গোমেজ এ বঙ্গকে ছেনে তোলেন বুদ্ধির-পঠনের সূচ্যগ্রে, থেমে নেই তা ক্রম-আবর্ত পাল্টায়, এ দশক পেরিয়ে অনেকদূর, আপাতত 'সাত জনমের পরি'—পূর্ণ মূল্যায়নের অপেক্ষা আরও পরে। **মাসুদ খান** (জ. ১৯৫৯) ছন্দে স্বতঃস্ফূর্ত মাসুদ খান। বাঙালি-বাংলার চিরায়ত ও লোকায়ত ধারা কিংবা ঐতিহ্য কোনোটাই তার কাব্যে নিছক নয়; চেতন-অবচেতনের সঙ্গমে পরিশীলিত এবং প্রত্নরূপে দৃপ্ত পরিবেশনা পায়। অমলিন অমরতায় পথ চলতে থাকে। এর প্রধান কারণটি নিহিত; কোনো নিয়ম, বৃত্ত বা আরোপ করা কোনো শর্ত একেবারেই তাঁর রূপজগতকে স্পর্শ করতে পারে না। এক ধরনের প্রচণ্ডতায় (স্যাটায়ার, হিউমার, উইট কিংবা নাটকীয় প্রবাহে) আধুনিক-তাকে তিনি গেঁথে ফেলেন ঐতিহ্যিক ধ্বনিচিহ্নের মূলবিন্দুতে। উত্তর-উপনিবেশী মন তাঁর এ পথটি তৈরি করে থাকলেও মূলের আনুগত্য তো অনস্বীকার্য নয়। বরং একটা সময়ে তা আত্মঅস্তিত্ব এবং অনিবার্যরূপে পুনর্গঠন তৎপরতার দীপ্র প্রেরণা। এসব ব্যাখ্যায়নে মাসুদ খান অনেকের থেকে তিনি স্বাতন্ত্র্য। *পাখিতীর্থদিনে* (১৯৯৩), *নদীকূলে করি বাস*, *সরাইখানা ও হারানো মানুষ* তাঁর উল্লেখনীয় কাব্য। *পাখিতীর্থদিনের* (১৯৯৩), মাসুদ খান (জ. ১৯৫৯)। অমায়িক কাব্যভাষা, মন্ময়চিত্ত ছড়িয়ে দেন অনেকান্ত আবহে :

উনুন তৈজসপত্র সব অরক্ষিত রেখে

www.chinnofoundation.org

বধূঁ ছুটে যেতে চায় বনকেন্দ্রে
অবলোহিত কুলমর্যাদা তার
বারবার টেনে ধরে রাখে।

সেই থেকে চুলখোলা ইলেকট্রন উন্মাদিনী,
তরঙ্গ জাগিয়ে তোলপাড় করে ঘোরে, হাঁসে কাঁদে,
তুরীয়াবেশে, একই পরিধিপথে।

অন্তত কিংবদন্তী তা-ই বলে।

দুর্বার পংক্তিমালায় উদ্ধত কাব্যবাণী নতুন চিন্তার উদ্রেক করে। একটি কাব্যেই গুরুতর হয়ে ওঠেন। গুরুত্ব পান। আত্মঅস্তিত্ব এবং অনিবার্যরূপে পুনর্গঠন তৎপরতায় কবিচেতনা দীপ্র। তাঁর সম্ভাব্য স্বাতন্ত্র্যচিহ্ন পরীক্ষণীয়। **মারুফুল ইসলাম** (জ. ১৯৬৪)র *মলাটবন্দী মন* (১৯৯৩) প্রথম কাব্য। মন্ময় এ কবি অনেকাংশে বিষাদ-স্মৃতি-নস্ট্যালজিক। কাব্য নামকরণেও তার স্বীকারোক্তি গোচরীভূত। আধুনিক জীবনের যাবতীয় প্রবণতা বিশেষ করে নাগরিক সারসত্য এখানে বেশি প্রকাশিত। এমনটা করতে গিয়েই ছন্দের বৈচিত্র্য-গীতলতা বর্ণাঢ্যতা পায় :

পাখি পূর্ণিমা কাঁপানো কণ্ঠে গাইবে কেবলই গান
সুষুপ্তির অতলান্তে প্রাণের কবোষ্ণ সুরে
তখন আমার থেকে অযুত যোজন দূরে
মনে কি তোমার পড়বে না কর্পূর-অতীত?

অতীত নয়—এর ভেতর দিয়ে প্রেমের প্রতীতি নির্মিত হয়েছে। কিছু ইমেজ আকর্ষণীয়, উদ্ভাবন গুরুত্বপূর্ণ। আশির দশকের আলাদা কোনো ভাব নেই আর তা কোনো কবি ছকে বেধে গ্রহণও করেন না। মারুফুল কোনো দিকে তাকান না, প্রেমের কর্পূর-সময়চিহ্ন আঁকেন। ভাবে দ্যোতনা আনেন, রোম্যান্টিক ছত্র দাঁড় করান, ভেতরে এক ধরনের উত্তরণও ঘটাতে থাকেন। মধ্যবিত্ত প্রেম, বিশ্বচিন্তাময় তার মাত্রিকতা, সবৈব মগ্নময় বিরহ-উক্তি; তাতে প্ররোচিত নিজস্ব ভাষ্য : 'অনাত্মীয় সময়ের মেঘের আড়ালে/ বনমোরগের লাল ঝুঁটি জেগে আছে/ দুপুরের অন্ধকারে দুহাত বাড়ালে/ কখনও পাই না খুঁজে নিজেকেও কাছে'। আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্য, আবেগ ছাপিয়ে ওঠে মেধা, নিজের আবর্ত-অবরুদ্ধতা-সর্বস্বতা পরা-চিন্তায় পর্যবসিত। বিশ শতকের শেষ ও শুরুতে কবি-রচিত উপর্যুক্ত পংক্তি আমাদের নতুন রুচির সংকেত আনে, ফেরায় মানবতার ব্যাকুল আশ্রয়ে। তাঁর অন্যান্য কাব্য : *কথা না-বলার করেছি নিজস্ব পণ* (১৯৯৪), *শূন্যপুরাণ* (১৯৯৫), *অনন্তের অলীক অপেক্ষা* (১৯৯৫), *জল-পাথুরে* (১৯৯৬)।

www.chinirfoundation.org

পাহাড়ী জনপদের জনতাজীবন **হাফিজ রশিদ খান** (জ. ১৯৬১)-র কাব্যভাষা। ক্ষেত্রে বিরাজিত হাফিজ রশিদ খান। নানা রকমের বোধের প্রবারণা পালিত তাঁর কাব্য : *জোস্না কেমন ফুটেছে* (১৯৮২), *চোরাগুপ্তা ডুবোপাহাড়* (১৯৮৮), *লোহিত ম্যাণ্ডোলিন* (১৯৯১), *আদিবাসী কাব্য* (১৯৯৭), *স্বপ্নখণ্ডের বেগম রোকেয়া রুকু* (১৯৯৫), *দস্যু রত্নাকর ও অন্যান্য কবিতা* (২০০০), *জুম পাহাড়ের ওম* (২০০২), *টোটেমের রাতে হত্যাকাণ্ড* (২০০২), *এই সুন্দর আমাঙ হারাবো না* (২০০৬)। একটি আদিমতার প্রবাহ—তাতে লোকায়ত সিদ্ধি, চেনা পরিবেশকে আরও মনোময়, বলশালী করে তোলা, তবে আবেগের স্থূলতা যেমন আছে তেমনি স্থিরতা কম, ফলে তাতে ভর করে তারল্য, দুর্বলতাও। প্রাচীনতা বা কালধর্মীতা চিরাচরিত অপূর্বময় :

লোককাহিনীর বিনোদিনী, নরপতি এবং তুরীয়
নরকের কোতোয়াল হয়ে গেছে। সুতরাং
রোকেয়া বেগম রুকুর জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার
মানে হলে; চারিদিকে শকুন আর হায়নার
অসহ কোলাহল

পরিস্রুত এ জীবন-সংস্কৃতি নিয়ে হাফিজ রশিদ খান সম্মুখগামী। আদিবাসী পীড়ন-নির্যাতন কবিভূমে হতাশা-আঙ্গিকও নির্মাণ করে। একই সঙ্গে ক্ষুদ্রজাতিসত্তার মুক্তির সংগ্রামে অনুবর্তী হবার বাসনা সার্বজনীন ও সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। চেতনার স্তরে জুম জীবন, সংগ্রাম, সংস্কৃতির অধিকার সমীকৃত হয়। তবে টোটেম-ট্যাবুর পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা, অলৌকিক শক্তির প্রতি আস্থা বা 'সর্বপ্রাণবাদ' (animism)-এর বিষয়টি কবির চেতন-সত্তায় আকরিত হয়। তবে এসব আনুকূল্যের মধ্যেও হাফিজ রশীদ খানের কবিতায় পাহাড়ঘেরা প্রকৃতির অনুপম শৈলি এক রকমের ন্যায্যতা পায়। তবে তাঁর বর্ণনায় কিংবা ভাষাভঙ্গিতে সত্যতা অনেক স্থানে ব্যাহত। **তুষার দাশ** (জ. ১৯৫৭) তুষার দাশের কবিতায় স্নিগ্ধতা ও সচেতনতা পরিপূরক। 'পোয়েমিক্স' তাঁর কবিতার শিরোনাম। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর মেয়ে আর পায়ের পাতায় প্রণম্য মধ্যবিত্ত নারীর প্রণয়প্রবণতা বিদগ্ধ নেতৃত্ব পায় কবির কাব্যে। কর্ষণফলায় কবি উদ্গাত করেন স্বকীয় শব্দতরঙ্গ। অবলীলায় কায়েম হয় তাঁর সাবলীল গদ্যছন্দ। তবে কবিকাব্যে শৈথিল্য দোষ তিরোহিত নয়। তুষার দাশ দেশ, মানুষ, সময়, সমকাল বলিষ্ঠভাবে যেন উচ্ছ্বসিত করে তোলেন। কবির *সহজপাঠ ও অন্যান্য কবিতা* (১৯৮৮), *অতিক্রান্ত বাল্যশিক্ষা* (১৯৯১), *দুর্লভ নির্জন আয়না* (১৯৯৬), *অনিবার্য গৃহযুদ্ধ* (১৯৯৯) প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ। **সরকার মাসুদ** (জ. ১৯৬১) *কাচপোকার ঘূর্ণিদৃশ্য* (১৯৮৫), *প্রিয়তমার নৌকাঘাট* (১৯৯৯) সরকার মাসুদের কাব্যগ্রন্থ। গতানুগতিক বিরহ বিষাদ নয়, খুব নিবিষ্টতায় ও নিরীক্ষায়

www.chinhofoundation.org

তাঁর কবিতা বহুগামী। বলতে হয় নাগরিক মধ্যবিত্তের যাবতীয় ক্লান্তি-ক্লিন্নতা কিংবা দীর্ঘ যন্ত্রণা সামূহিক বিবেচনায় বর্ণনার উপাদান তৈরি করে কবিতা শরীরে। এক্ষেত্রে আঙ্গিকের দুর্বলতাটুকু পাওয়া যায় উপরিকাঠামোতে দৃশ্যমান জীবনাচারের অপরিপক্ব পর্যবেক্ষণে। কবিচেতনায় সমাজের চালচিত্রটি বাস্তব অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয় না। ফলে পরিচর্যায় তেমন আকর্ষণও জন্মে না। তবুও সরকার মাসুদ কবিতায় উজ্জ্বল বার্তাটিই ছড়ান।

দশকওয়ারি কবিতা নির্ণয় ও মূল্যায়ন সঠিক হয় না। তা অনেকটা মুশকিলও। তবে মুক্তিযুদ্ধোত্তর এ দশক আজকালকার বিবেচনায় তেমন আশাপ্রদ নয়, একুশ শতকে তা তেমন দৃশ্যমানও বলা যাচ্ছে না। কার্যত, এ দশকের কবিগণের বয়স ষাটের অভিমুখে। কিন্তু তাদের প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের কবিতায় এখনও অক্ষয় উজ্জ্বল বা পরিণতিপ্রবণ মনে হয় না। তবুও উল্লেখনীয় কয়েকজন ইতিমধ্যেই 'জলের স্বাক্ষর' রেখেছেন, সন্দেহ নেই।

www.chinnofoundation.org

মনিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে

বাংলা সাহিত্যে প্রথম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়ে মানুষের মানুষকে চেনাজানা হলো, আগের কালের সবকিছু বিধিবালাই ছিন্ন করে। মনে করা নয় শুধু, এমনটা প্রতিকূল উজানো পরিব্যাপ্ততায় নিশ্চিত যে, আধুনিক যুগমানস ওঁরই হাতে ধরা পড়লো, গড়ে উঠলো বিপুল কলেবরের তুলি। ওঁর লেখায় 'কলমপেষা' ধার– ধরা পড়ে, মাত্র একুশ বছর বয়সেই। বন্ধুরাই বাজি ধরেছিল, তখন *অতসী মামী* লেখা হলো, শক্তিটুকুও ধরা পড়লো। বাজিমাৎ। পরে আর পেছানো নয়, এক নতুন জিনিস আমদানি হলো, ওই সময়খণ্ডে– তার হাতেই। কথাকাররূপে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক গড়নটুকু এভাবে! তখন রবীন্দ্রযুগ শেষ নয়। রবীন্দ্রসূর্য পশ্চিমে হেলে পড়তে শুরু করেছে মাত্র, 'আধুনিক' কবির দল উন্মাদ! পাউন্ড-এয়েটস-এলিয়ট-লরেন্স তাড়া করছে তাদের। বিশ্বযুদ্ধের ফোঁকড়ে আটকে আছে তাবৎ জীবনের মুহূর্তগুলো। উন্মাদনায় ছেয়ে গেছে প্রাণের প্রান্ত-অন্ত। প্রভাব বললে কম হয়, একপ্রকার 'গ্রাস' করে ফেললো পাশ্চাত্যের এয়েটস জীবনানন্দকে, বোদলেয়ার বুদ্ধদেব বসুকে, মালার্মে সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে, এলিয়ট বিষ্ণু দে-কে। কিন্তু এর বাইরেও নানা মাপে ঘটে অনেক কিছু। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য-শৈলজানন্দ-সজনীকান্ত নগরের পচা-গলা-বাসি জীবনের ধ্বসচিহ্ন নিয়ে ক্লিন্ন-কিন্নর সংবাদে প্রখর হয়ে ওঠেন। তারও দাম কম নয়! জারানো মলিন বস্তি-ব্রথেল নির্মমতার কষ্ট-চাঁদরে ভুনিয়ে গড়লেন অমিয় রূপ। ওতে স্থিরতা ভাঙলো, মাখলো স্ফূর্তি। অসহায়তা বা গ্লানিময়তার নয়, আরও নির্জলা রোদের স্পষ্ট দিশা তৈরি হলো। আতঙ্ক আর নির্বিচারের দৈন্যসাধিত কলোরব, জীবনের শতভাগ উপস্থিতি নিয়ে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করলো। তখন আর নয় প্রথা-পুরনো-তথাকথিত আভিজাত্য পোলিশ কিছু। পালাবদল ঘটে চলে সাহিত্যে। চূর্ণীকৃত মনের স্তর আর অবগুণ্ঠিত কাল অন্দরে আছড়ে পড়ে। জহুরি তুলে নেয় নতুন তুলি, বেজে ওঠে বারামখানার কালোয়াতি– গম্ভীরনাদ। এ মহাকাব্যের অলৌকিক শক্তির মহানায়ক নয়, ধীরোদাত্তগুণের নায়ক নয়, এ মাঝি-কুবের। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ করেন, ঠিক নিঃশব্দে– নিছক অনির্দিষ্ট অলক্ষ্যে। কী অভ্রান্ত পথ ওঁর। মনের জন্য। মনোরোগের চিকিৎসা। নির্ভার-নিপাট সে সমাজচোখ। সার্বভৌম মানুষের শক্তিটুকু অন্বেষণ। ছিন্ন সমাজের জনতার প্রশ্নে ভিন্ন প্যাটার্নের প্ল্যাকার্ড। কর্তৃত্ব-বিরোধী তা। সমগ্রতার সবটুকু মিলিয়ে। যেটি উল্লেখ করলুম, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগচিন্তা বলে। কোন্ আধুনিক আর কী তার বিজ্ঞান? খুব পরিচিত *পদ্মানদীর মাঝি*র পেশাবৃত্তি-সংলগ্ন কুবের-মাঝি, আর জৈব-আধারে গাঢ়

www.chintofoundation.org

নিমিলীত কণ্ঠস্বরে। আর কপিলা! চোখের চাহনিতে, কটাক্ষের দৃকপাতে, দুরন্তদাহে, চিত্তের উর্ব্বশীটানে, গ্রীবার ভঙ্গিতে, ব্যূহভেদী স্তনের আকর্ষণে– এক নাছোড় আপত্তিহীন আবেদন। মাঝি হয়ে ওঠে ত্রাস-তৃষ্ণায় রোমাঞ্চিত। অপলক চোখে তাকায়, হাওয়ায় হেলে, তরঙ্গের পালে আলো দোলে। যেন কোন্ উদ্দেশ্য আছে ওঁর [লেখক মানিকের]! না, সে 'মুক্তকর যুক্ত করিবার উপায় নাই' এমন সমাজ-অপাংক্তেয় মাঝির ভেতর দুলুনি বাইয়া চলে– তার 'পাপ'। কিন্তু হতাশার বায়ে তপ্ত ক্রুদ্ধ মনের আশ্বাসকে কুঁদে কুঁদে গড়া ওর দেহ। লেপন দেয়, বুনিয়ে তোলে, ভেতরে জুড়ায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুভব। রাগ-অনুরাগ-আবেগ-অবদমনের অনুবার্তা রঙীন হয়। কোনোটি মোটা, কোনোটি চিক্কন প্রণয়-রেখায়। রেখার ভেতরে পশুত্বকে বাতিল করে দেয়ার অভিঘাত। মানব ও মানসীর মানুষ বিস্তার– অনেক ব্যাপদেশে, পূর্ণাঙ্গ করে। মানিকবাবু হারিয়ে ফেলেন না, অর্জন করা অনাভূতিগুলো। বরং তাতে ঘামে-কামে বাস্তব করেন। নির্মম, নির্দয়রূপে। অপরাজেয়তায় ছাড় নেই– ছাড়ে না হোসেন মিয়া– ময়নাদ্বীপের লগে। কষ্ট-লজ্জা-কাম আর বিশ্বাস-সংস্কার-অহং তাবৎ গরম ভাপে-তাপে গড়া শরীরে মনটার মূল্যও অশেষ হয়। এইটি ওঁর মুখ্য। মনের দামটুকু যা চাইলেই মানুষ বিকোয় না। কিন্তু মনের স্বরূপ আর কূল তো বোঝা দায়! শশী বোঝেনি কুসুমের মন, গোপাল বোঝেনি শশীকে, যাদব বোঝেনি নিজেকে। আর পুরো গ্রামের মানুষকে না বুঝে শশী হয়েছে 'অপারগ'। ক্লান্ত, অনর্থ নায়ক। কতোকালের অশনি আর অদৃষ্ট ললাটলেপনে আটকানো– সেসব যুগান্তরের সংস্কার, তার ভেতরেই চলে ক্রিয়াকর্ম, চলতি জীবনের গঠন-পুনর্গঠন। মানিকের বৈজ্ঞানিক মন বিচলিত হয়ে পড়ে। ভাঙতে চান। অনড়তার দেয়াল উপড়াতে চান। কিন্তু কেন বা তা কীভাবে? তার যৌক্তিক কারণটা খোঁজা যায় ওঁর মধ্যে। তার কেন্দ্র যে মন– সেইটিতে ওঁর লক্ষ্য। মানিক মনকে উপজীব্য করেন। মনকে ন্যস্ত করেন সমাজে ও শ্রেণিতে। যেটি চলমান স্রোতোরেখার টান। উজান পেরুনো কর্তব্য। এই মনের ট্রিটমেন্ট দিতে শশী, এবং তারও– শশীর নিজেরও পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ কাম্য। লেখক মানিকের বিখ্যাত এই দুটো উপন্যাসে মনের ওপর পর্যবেক্ষণ আকর্ষণীয়– বিশেষত এ কালের আয়নায়। বলতে চাই তা ওতে অভ্রান্ত এবং লক্ষ্যনির্দেশিত।

প্রতিপাদ্য উপন্যাসদ্বয়ে কুসুম-কপিলা খরতাপে মুখর। কুসুমের মন-শরীর পর্যাপ্ততায় ভরা। পূর্ণিমা চাঁদ। 'লাজ রক্ত হইলা কন্য পরথম যৌবন'। প্রথম যৌবনের অভিঘাতে মুখর মন গভীরভাবে টানে, নিয়মিত স্বামীগণ্য পরাণকে অতিক্রম করে শশী ডাক্তারকে। শৃঙ্খলা আর নীতিকঠোর সমাজের বন্ধনটুকু ছিল পরাণের ঘরে। পরাণ প্রথাগত স্বামী; নেই পরাস্ততাপ, কর্তৃত্বের আগুন, যুবাসংসর্গসন্নিকট। বরাবরই কুসুমের কাছে পরাণ পরাণহীন, ব্যক্তিত্বশূন্য,

www.chinnofoundation.org

লেশশূন্য। এ পরাণে কারো পরাণ জুড়ায় না। তাতে চান্দ্রশরীরে ঘটে গ্রহণ। ষোলকলা সান্নিধ্যহীন হয়ে পড়ে। পরাণে পরাণ ঘনায় না। সেই শূন্য মন্দিরে প্রাচুর্য নিয়ে উঠে আসে শশী। তার সান্নিধ্য, কাছে আসা, মনোরোগ নির্ণয় ও নিরাবরণ কুসুমতলে কুসুমিত হয়ে ওঠা! এটিরও এক-ঘা চিকিৎসা শুরু হয়। তলানিটুকুও বাদ যায় না। কুসুম চেতন-অচেতন জ্ঞান অতিক্রম করে, অধিকার করে; তাবৎ নিয়মনীতি অস্বীকার করে– অবুঝ বিহ্বলতায় বলে : 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?' ব্যাস, এর অপরপক্ষে কপিলা 'সব বড় রহস্যময় ও দুর্বোধ্য।... 'পাঁক মাইখা মরস কেরে কপিলা? মাইনসে কইব কী? যা বাড়িত্ যা।'' উত্তরটুকু আরও প্রগল্‌ভ। বর্ষার বিষণ্ণতার প্রতিমায় ঘনাইয়া বলা : 'মনডার অসুখ মাঝি, তোমার লাইগা ভাইবা ভাইবা কাহিল হইছি'। মনের কী বিচিত্র অভিপ্রায়! সেটুকু কী নিয়মে বাধা। সমাজ-নীতির বন্ধন দিয়ে তা কি থামানো যায়! মনের দাম তবে কী? মনের চিকিৎসাইবা কেমন? শশী কুসুমকে মন আর মনের আকাঙ্ক্ষার কথা বললেও সেকি মনের চিকিৎসা করতে সক্ষম হয়! হয়নি। কুবের রহস্যময় মনের সন্ধান পায়নি, শশীও নয়– অনেকসময় কুসুমের অপেক্ষায় 'মনটা কেমন করিয়া ওঠে'। সমস্ত ইচ্ছা আর চিকিৎসার মন্ত্র তার অস্ফুট অসংখ্য সংকেতে যেন নিষ্কার্য, নির্বাপিতপ্রায়। শশীর কথনের ভেতরে মানিকের অভিপ্রায় আছে। দুর্জ্ঞেয় মনের তল নির্ণয়, তার গড়ন ও প্রকৃতি নির্ধারণ– সেটি তো বায়বীয় কোনো বিষয় নয়! প্রকৃতির স্পর্শে, প্রাত্যহিক দ্বন্দ্বময় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, উদ্ভিদ্যমান সমাজের কররোলে, অনুতাপ-অনুভবের রেখাতলে, প্রতিজ্ঞার নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাটুকুর পুনর্গঠন চলে। সমাজ-অদৃষ্টবাদী কাঠামোর চলকগুলো আমাদের ঐতিহ্য-ইতিহাস বা পুরাণকে মনযোগী করে তোলে, ব্যক্তির সত্তাতাত্ত্বিক জ্ঞানকে পরিস্রুত করে তোলে। *পুতুলনাচের ইতিকথা* বা *পদ্মানদীর মাঝি* গ্রামকেন্দ্রিক বৃত্তিভোগী সমাজমনে চিত্রায়িত। সে গ্রাম না সামন্ত, না পুঁজি-আশ্রিত। বিশ শতকের প্রথমার্ধের এ সমাজকাঠামো বৃটিশ উপনিবেশ প্রভাবিত পুঁজির প্রতিক্রিয়ায় দীপিত। তার সমাজ ও শ্রেণিমনে মেলে শ্রীনাথ, হারু, পরাণ কিংবা কুবের, আমিনুদ্দি, গনশার পেশা-জীবন– সর্পিল-অসুস্থ-কাতরোক্তিতে অধিভুক্ত। এ উদ্‌যাপন নির্মম ও কঠোর, নিশ্চয়ই তা জঙ্গমতার সংগ্রামে পরিকীর্ণ। স্যবলটার্ন বা নিম্নবর্গীয় শ্রেণিকাঠামোতে এদের প্রতিকূলতা একদিকে যেমন শোষক প্রতীভূশক্তির দাপটে অন্যদিকে প্রকৃতিতেও। দৃশ্যমান এই নির্দিষ্ট শক্তির বাইরে অদৃষ্ট বা নিয়তির চালটুকু কম নয়। এতে ঝোঁক বেশি অদৃষ্টে, আবার এই অদৃষ্টই কর্তৃত্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ভুলে যাওয়া চলে না, যাদব, শেতল বচনকথা। হোসেন মিয়া অন্য ধাতে গড়া। তার সৃজন বা জীবনবীক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির– যা এই জলআলোহাওয়ায় বেশ আকর্ষণীয়। তবে মায়ার অধঃক্ষেপটুকু হারায় না। সে

www.chinafoundation.org

চলিষ্ণু সমাজে পূজ্য। এইটির পরতে পরতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে জমে ওঠে অদৃষ্ট বা নিয়তির নির্ধারণক্রিয়া। তাতে প্রচল সমাজের শাসক বা তার শাসনদণ্ড অদৃষ্টের শ্রেণিকাঠামোয় নিশ্চিত। এ শ্রেণির গড়নটুকু আধা-সামন্ত আধা-পুঁজিবাদী সন্নিধানে। যা সমাজের আদ্যাশক্তি। তাইতো শ্যাঁওলাধরা সমাজের ভেতরের ব্যক্তি রক্তশূন্য, কর্তব্যশূন্য। এ ব্যক্তির সিদ্ধান্তও আটকা থাকে যাদব পণ্ডিত বা যামিনী কবিরাজ, হোসেন মিয়ার হাতে। ক্রীড়নকের ভূমিকা তারা আদায় করে নিয়েছে পরিস্রুত সমাজ কেন্দ্রে। নিম্নশ্রেণিই কী 'নিম্নমন' তৈরি করে! সেটি বোধ করি প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের অভিমুখ। প্রতীভূর ইঙ্গিতের গভীরতায় মন-বস্তুটুকু নিছক তুচ্ছতায় মলিন। তার জৈবিক প্রখরতাও সমাজের কাঠিন্যে নিমজ্জিত। এক পর্যায়ে কুসুম মিইয়ে যায়, কপিলা ময়নাদ্বীপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, আমিনুদ্দি বা শ্রীনাথ-পরাণের মূল্যহীনতায় নিয়তি আর কুসংস্কারের সর্পনাগ তাদের করে তোলে নির্বীর্য। শশী একপ্রকার নিজেও সেই নাগবেষ্টনে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কুবের হোসেন মিয়ার নির্দেশকেই নিয়তি মান্য করে। সংসার-প্রেম-আনুগত্য-কর্তব্য-মনুষ্যত্ব সবকিছু মূল্যহীন ও অপ্রয়োগযোগ্য যেন। সমাজের তখন থাকে কী? মানুষগুলো এভাবে নির্বিশেষ বিশ্বাসটুকুও বিশ্বস্ত করতে পারে না! ভয় পায়। ভীত হয়ে জীবনের বিপরীতে দাঁড়ায়। জীবনের স্বতঃশ্চল অভিমুখ খুঁজে নেয়। জীবিকার তাগিদে, জীবনের অভিপ্রায়ে তুচ্ছ 'গুবরে পোকা' হয়ে শঙ্কাময় নির্মূল্যে বেঁচে থাকে। শক্তিটুকু তার তখন কুসংস্কার আর কু-বিশ্বাস। এর তলপৃষ্ঠে অহং-ও সক্রিয়। তা শক্তিও অর্জন করে। যাদবের ইচ্ছামৃত্যু বা কবিরাজের যুক্তি ও ভক্তিহীন চিকিৎসা যেমন গাঁওদিয়ার সমাজে প্রযোজ্য তেমনি মনের চিকিৎসাও কেউ নেয় না। বিজ্ঞান অকার্যকর। আগেও বলেছি মন কী? সে তো বহুকালের কুৎসিত-কুশ্রী সমাজে আঁটা মূল্যবোধ! সমাজদৃষ্টিতে তা-ই 'ন্যায়'। শশীর মতো আধুনিক নগরমনস্ক ডাক্তারও এর চাপে পড়ে ভাবাবেগে অদৃষ্টটুকুতে হাত পেতে নেয় কেন? সে সংস্কারটুকু তো উপনিবেশ-প্রশ্রয়ের সমাজ-অর্থনীতি তৈরি করে দিয়েছে! সে শ্রেণিমন, কর্তৃত্ব, সংস্কারের কণারাশির প্রকটত্বেই সৃজিত। সেটি ভাঙতে পারা কঠিন। কঠিনটুকু তো এই বর্তমানেও কর্পোরেট পুঁজির গলিত নিঃশ্বাসে দুষিত। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণিমন এই তথাকথিত পচনশীল পুঁজির প্রতিক্রিয়ায় নষ্ট ও নির্বাপিত। প্রকট বিচ্ছিন্নতা আর ভোগবাদের নির্বিকার অভ্যেস এখন যেমন রপ্ত হয়ে চলছে তেমনি বাড়ছে ভীতমনের অদৃষ্টের আস্থা। মানিকের উপন্যাসের রোগগ্রস্ত রোগীদের রোগমুক্তি ঘটেনি, তার ক্রুদ্ধ-আদেশে কেউ বিজ্ঞানমনস্কও হয়নি; এমনটি সত্য মনে হয়– যখন এই বিদ্যমান সমাজ– সন্তপ্ত মানুষের বদলে, বিনষ্ট ভোগবাদের সঙ্গে অদৃষ্টশক্তিও প্রযুক্তিশাসিত ব্যক্তিকে করেছে অন্ধ, ফেলে দিয়ে অনালোকিত গহ্বরে। তবে তো মানিকের সমাজ দৃকপাত শুধু

www.chinnofoundation.org

তার কালকেই অঙ্গুলীনির্দেশ করে না, এই বর্তমানকেও। সমাজের রোগমুক্তি ঘটে বিজ্ঞানমনস্কতায়। ব্যক্তি তার দর্শনটুকু ঠিক করে নেয়। কিন্তু তা কোথায়– এই প্রযুক্তিশাসিত কর্পোরেট সমাজে? মানিকের সমাজ-চশমা সে উত্তরটিই প্রকাশ্যে এনেছে– এই সমাজে।

www.chinnofoundation.org

পুতুল নাচ ও মানিকের শিল্পমন

*পুতুলনাচের ইতিকথা*র বীজশক্তি কোথায়? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯.০৫.১৯০৮-০৩.১২.১৯৫৬) কোন দৃষ্টিকোণে রচনা করেন এ উপন্যাস। 'কলমপেষা মজুর' আখ্যায় আর প্রতিনিধিত্বশীল এক গ্রামের 'ব্রাত্য' প্রতিনিধি জনৈক হারু ঘোষের বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনায় প্রারম্ভিক পর্বের যে বিবিক্ত ইশারা শহরফেরত শশী ডাক্তার পায় তাতে প্রতীক্ষিত আখ্যান নির্ণয় অভিপ্রেত হয়ে ওঠে। করুণ সে বর্ণনপ্রয়াস : 'বটগাছের ঘন পাতাতেও বেশিক্ষণ বৃষ্টি আটকাইল না। হারু দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া উঠিল। স্থানটিতে ওজনের ঝাঁঝালো সামুদ্রিক গন্ধ ক্রমে মিলাইয়া আসিল। অদূরের ঝোপটির ভিতর হইতে কেয়ার সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সবুজ রঙের সরু লিকলিকে একটা সাপ একটি কেয়াকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। গায়ে বৃষ্টির জল লাগায় ধীরে ধীরে পাক খুলিয়া ঝোপের বাহিরে আসিল। ক্ষণকাল স্থিরভাবে কুটিল অপলক চোখে হারুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়াই বটগাছের কোটরে অদৃশ্য হইয়া গেল।' রাগী চোখের নির্মম বর্ণন-পর্যবেক্ষণে, কথকের কেন্দ্রে প্রোটগ্যানিস্ট শশী, আর তারই (কথক বয়ানে) দ্রুত সঞ্চরণশীল উদ্যোগে চলমান আখ্যান-সময়ের ঘণ্টা দুই ব্যবধানে মৃত হারুর সৎকার-কার্যের বক্ষ্যমান প্রয়াস। হারু কে? কোন্ সমাজের প্রতিনিধি সে? তার সচিত্র গ্রামভূমিটুকুর বীক্ষণ কেমন! এ গ্রামে এই উপলক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প সৃষ্টি হয়। তাতে তৈরি হয় মন ও মনের অন্তর্পরিকাঠামো। গড়ে ওঠে আর্থ-তুচ্ছ দারিদ্র্যক্লিষ্ট জন্মান্ধসৌধমিনার। সেখানে ঘিরে চলে একপ্রকার বীভৎস কৌতুকরস। কুসংস্কার আর অনগ্রসরতার অভিশাপে আটকানো প্রতিসরিত সমাজ। তাতে ঘিরে আছে যাবতীয় অবিশ্বাস, অন্যায্য সন্দেহ, কুতর্ক, গ্রাম্য কূটনীতি, বাড়ন্ত অহং, অনৈতিক জেদ-অভিমান আর ধেয়ে চলা যতো অসম্প্রসারণের অগতির আস্থা আর টেকসই স্থবিরত্বের স্বীকৃত অবসর। কেন মানুষ এমন? কোথায় পায় এসব ধারণা আর বুদ্ধিহীন বুদ্ধি? শশীর প্রশ্নগুলো চলতি মানুষ তুলে নেয়, নির্দ্বিধায়। বিস্মিত শশী আরও বিস্মিত হয়, চলতি জীবনযাপন দেখে, পাঠকও তা দেখে, এবং সে কারণেই, শশীর প্রশ্ন পাঠক তুলে নেয়। পাঠক তা গ্রহণ করে। আখ্যানসূত্রে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনি গড়েন, প্লট নির্মাণ করেন, একের পর এক গৃহীত সমস্যার আনয়নের ভেতর দিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন মানুষকে। একপ্রকার সাক্ষাতও ঘটে মানুষের, শশীর সঙ্গে। এতে কাহিনিও নির্ধারিত পথ ধরে এগোয়। মুখোমুখি হয় দ্বন্দ্বের। যুদ্ধও একপ্রকার। বাঁচার, সংগ্রামের, তা হয়তো ভেতরের এবং বাইরেরও। তাতে

www.chhimofoundation.org

পুনর্গঠিত হয় জীবন জঙ্গমতার ক্ষুরধার বিধানাবলী। প্রথা পাল্টায়, হোক ভেতরে বা উপরতলে। আচরণ ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে পড়ে। বাধা পায়। প্রগতির পথ তৈরির নিমিত্তে। মূল্যবোধ গড়ার নিমিত্তে। তা যে গড়ে ভাঙচুরের ভেতর দিয়েই। সম্মুখে চলতে গেলে গতি তৈরি করতে গেলে ভাঙতে হবেই। ফেলে আসতে হবে পুরনো, জীর্ণ, মলিন সবকিছু। কিন্তু তা তো ছাড়া যায় না সহজেই। বিরাট পাথরসম সে স্থবিরতা। নিশ্চলতার, জড়তার, আড়ষ্টতার অভিমুখ তো পাল্টায় না। সে পেছনে টানে, টেনে ধরে পুরনোর পরতে, পরাকাষ্ঠাও তাতেই টিকে থাকে যেন। এ পাথর নড়ানো সহজ নয়। শশী গাঁওদিয়ায় এসে স্থবিরত্বের নিশ্চল রূপটি দেখে নিজেও স্থবির হয়ে পড়ে। সংস্কারের ভেতরে সেও পা দেয়। দেয় কেন বলছি, হয়তো গোপালপুত্রের রক্তেমাংসেই তা বহমান। চাইলেই ভিন্ন হয়ে আলাদা রকমে এক লহমায় তা ছাড়তে পারে না। সে বিব্রত হয়, দ্বিধায় পড়ে। কালিমা বা কলঙ্ক, আস্থা বা অনাস্থা, বিশ্বাস বা অবিশ্বাস, যুক্তি বা আড়ষ্ট সবকিছুই তাকে ঠেলে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আর এ সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তারও চিত্তে বাধা পড়ে, পুরনো মায়াজালে। কর্তব্যের ভেতরে অপূর্ণ আবেগে। তরল ক্লিন্ন আবেগ আর আহৃত প্রাচীন আলোহাওয়ার ধৃত কণ্ঠ তাকে পলায়নের পথই দেখায়। ভাঙ্গার বদলে পলায়নের। কিন্তু কোথায় পালাবে সে! বৈজ্ঞানিক উপাদানে গড়া অর্থদণ্ডে পাওয়া ডাক্তারি মন কেন তাকে কবিরাজ আর সূর্যবিজ্ঞানের ভুঁইফোঁড়, অনৈতিক, দায়হীন, মনগড়া, ভ্রান্ত, ছলনা-প্রতারনায় বিশ্বাসহন্তারকপ্রসূত চিকিৎসায় স্থির করবে। এ স্থিরতা প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে পুনর্বার, একাধিকবার প্রতিটি পদক্ষেপে মুখোমুখি হওয়ায়। বিব্রতই শুধু নয়, এর জন্য গ্লানি আর লাঞ্ছনা যেন প্রতিমুহূর্তে প্রতীক্ষিত হয়ে থাকে। শশী এ প্রতিনিধিত্বশীল গ্রামের আলোহাওয়াজলবায়ুকে কীভাবে ফেরাবে? কতোকালের এ প্রতিকৃতি, যে মুখ বিকৃত-ক্লিন্ন-অপদস্ত তার চিকিৎসা সে করবে কোন্ উপায়ে। কীভাবে তা সম্মুখের পথ পাবে। এসব প্রশ্ন জ্বলন্ত হয়ে উঠলে মানিক আরও বহুবিধ মনচিন্তায় অগ্রবর্তী হয়ে পড়েন। সূক্ষ্মতর মনের কোণের পরিলেখটুকু খুঁজতে থাকেন। অনেকদূর তার রূপ ও রেখা– সে ঘনতল রঙ ও রূপের কাঠামোটুকু চিনিয়ে দিতে চান। সমস্যার জট চেনা শুধু নয় খোলার কারণ ও অভিমুখও তার কাছে গুরুত্ব হয়ে ওঠে। একের পর এক সুকুমার-সন্দিগ্ধ চিত্তের পরত আর প্রান্তসমূহ বিশ্লেষিত হতে থাকে। একপাক্ষিক নয় এর কাহিনি। উপন্যাস বিরস নয়, সাপেক্ষ-অনপেক্ষ হিসেব করে চলাও নয়, সামগ্রিক দর্শনবুদ্ধিতে বিকাশপ্রাপ্ত এবং পুনর্গঠিত। লয়প্রাপ্ত যেমন নয়, শেষও নয় কিছুতেই, সত্যিকার রূপটি তুলে ধরে তার অবারিত প্রেক্ষণটুকু গড়ে তোলা। পরোক্ষ সম্পন্ন মানসিকতায় শুধু নয়, দ্ব্যর্থহীন চিন্তায়, সমাজ ভাঙ্গনের ভেতরের যুক্তিতে, সমাজযুক্তির সত্যে চিহ্নিত মানসে। বায়বীয় নয় যেমন তেমনি অসম্ভব

www.chinnofoundation.org

উচ্চাশাতেও নয়। সম্পূর্ণ জীবন ও জীবনের জঙ্গমতাকে যুদ্ধমান জয়ের অভিমুখ করে তোলে, যেখানে শেষাবধি জীবনই সত্য। আর সে সত্যে দ্বন্দ্বই মুক্তি। সেটি তত্ত্বের তত্ত্বে নয়, ব্যক্তির আবেগ-অনুরাগ-প্রণয়-প্রেম আর উচ্ছল বৌদ্ধিক (ট্রান্সসেন্ডেন্টাল) আস্থার কেন্দ্রকে ইতিবাচক গুণে মেনে। কারণ, বেড়ে ওঠা বৃক্ষের সমস্ত রস-মাটি-উদ্‌গম আলোহাওয়ার মুক্তিটুকু অস্বীকার করে এ গ্রাম বা তথাকথিত অনাস্থাজ্ঞাপক পুঁজির শহরতলীর মানবচিত্ত তার মনকে গড়ে না, বাঁচাতেও পারে না। শশীই এর দৃষ্টান্ত। শশীর চিকিৎসা এ উপন্যাসে কে পেল না পেল তা মুখ্য নয়, কে তার কথা শোনে বা না শোনে তাও মুখ্য নয় কিন্তু তার নিজের মন-মনস্তত্ত্ব, শিক্ষা-সংস্কৃতি আর গাঁওদিয়ার অশিক্ষা আর কুসংস্কারের তারে বাধা নিশ্চল-প্রচল অবরুদ্ধ সংস্কৃতি দ্বন্দ্বে লিপ্ত কিন্তু মনটুকু তো এদেশেরই ঋষিমুনির নাতিষীতোষ্ণে ভাবের বৃন্তে আটকানো। সেটি অনস্বীকার্য তো বটেই। সুতরাং মানিকে সে ট্রিটমেন্টও আছে। উপন্যাসে সে দৃকপাতও আকর্ষণীয় ও ইঙ্গিতবাহি। তাই *পুতুলনাচের ইতিকথা* এক দারুণ সাক্ষ্য নিয়ে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সে প্রস্তাবনায় গড়ে ওঠে মন ও মনের ভেতরের কাম-প্রেম-বাসনা অনুষঙ্গ– যথাস্থিত অভিপ্রায়সমূহ। সে অভিপ্রায়ে মধ্যবিত্ত প্রবণতা, প্রান্তিকতা, ভাবপ্রবণতা আর অদৃশ্য প্রেরীত বিশ্বাস-সংস্কার এক চরিত্ররূপে প্রতীয়মান। ব্যবচ্ছেদিত এবং চিকিৎসারত। মানিকের শিল্পমন কী ভেবে যেন বুঝে যায় এইটিই ঔপন্যাসিকের কাজ। সম্পূর্ণ উপন্যাসে কাহিনি বলা বা চরিত্র বানানোই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য জীবনবেদ– অলক্ষ্যে থাকে মাটি ও মানুষের শ্রেণিমনের দর্শন। যেখানে আখ্যান হয়ে ওঠে অভিপ্রেত দ্বন্দ্বের, স্থবিরত্বকে মুখোমুখি করে কুৎসিত উপসর্গ চিহ্নিতকরণে, পরের কাজটুকু লোকোত্তর পৃথিবীর। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, এ উপন্যাসের নির্মিত মন যে সমাজের দ্বন্দ্বের ভেতর থেকে চিহ্নিত, তাতে একটি শ্রেণিমনের তিলকও এঁটে দেওয়া আছে। তাই এতে যা কিছু ঘটে চলে তা শ্রেণি-সংস্কৃতির বিবর্তমান রূপকাঠামোকে অবলম্বন করেই। তাতেই জীবনের বিশ্বস্ত চলকগুলো চিহ্নিত হতে সক্ষম হয়। উপন্যাসটির পরিচর্যার স্থলটুকুও তাতেই নির্ধারিত হতে সক্ষম।

২

গল্পগ্রথিত চরিত্রসমূহ গড়া একপ্রকার সামন্ত অবকাঠামোয়। তা বিশ শতকের প্রথমার্ধের দৃষ্টিপাত। গাওদিয়া, বাজিতপুরের বসতভিটা। সেখানকার সমাজ-মানুষের সম্পর্ক। ওর দ্বন্দ্বজাল, কথকের দৃষ্টিকোণ ও পরিপ্রেক্ষিত। তীব্র তাপে শ্রেণিমানুষের তীক্ষ্ণ সংঘাত ও সন্তাপ। ব্যক্তি-সমাজের দ্বন্দ্ব, সমাজ ও ব্যক্তিরও। প্রথম অংশেই লেখকের সমাজচশমার যে বিবরণী তা কোনো আঞ্চলিক বা বিচ্ছিন্ন

www.chinnofoundation.org

দ্বীপবাসী মানুষের নয়। এ প্রকৃতিহত মানুষ। নিয়িতিনির্দিষ্টও। সে নিয়তি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কারুণ্যে– অমোঘ বিধিলিপি। মরীচিকার মায়ায় অভিসম্পাতি অভিমুখ। রহস্যজাল কালধৃত। এমতে প্রশ্ন জাগে, এই কী মানিকের শিল্প? মানুষের মন খোঁজা– মানিক কোনো চরিত্রকেই– খণ্ড করে দেখেননি। অখণ্ড ও সর্ববিচারী দৃষ্টিকোণে– শ্রেণি-সমাজ-রাজনীতি-সংস্কার-কুসংস্কার সবকিছু দিয়ে। চরিত্র তার আগুনচেতা, ক্ষরিত; পুড়িয়ে ওঠা সমাজ মেরামতির কাজে স্পন্দিত। উদ্বায়ী মনটি প্রবৃত্তিজাত ছায়ালোকে তা তড়পায়। তার সামগ্রিক সার্বভৌম শিল্পধাতও তাই। সেটি চিনে বুঝে নেয়, ওই শ্রেণি-জাত সম্বল করে। এমন সমাজ ও সমাজ স্পন্দনের মোড়ানো ব্যক্তির ব্যবচ্ছেদ, সেটি তার দণ্ড। তাঁর সময়ে এ প্রয়োজনটুকু অন্য উপন্যাসিকরা কতোটুকু করেছেন কিংবা কোন ধারায় সকল গ্রামসমাজের মানুষকে দেখেছেন সে বিচার এক্ষণে অবকাশ কম কিন্তু এটি সত্য যে, এক বৈজ্ঞানিক দৃঢ়পাতে বাঙালির সমাজ-অভিঘাতটুকু বিশ্বস্ত করে তোলাতেই তাঁর পূর্ণ প্রয়াস। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট দর্শন বা তত্ত্বের প্রতি আস্থা বা অনুমতি থাকতে পারে কিন্তু নিশ্চয় সেটি ব্যক্তিমানুষের স্বরূপে বা তার বিবর্তিত সমাজ পরিপ্রেক্ষিতটুকুতে অবিচ্ছিন্ন রেখেই। এখানে শশী একক, পরে যাদব-গোপাল-সেনদিদি একপ্রকার 'হাপাইয়া হাপাইয়া' সমাজে ভারে চলমান, এ প্রকারে আনন্দ-নিরানন্দেও দস্তুরও এ প্রয়াসে এক সুতোয় বাধা।

যে উদ্ধৃতিতে হারু ঘোষের অবস্থান ও আবিষ্কার, কাহিনিটির গ্রন্থিমুখ (exposition), সেটি নিছক কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু তাতেই অমোঘ। শিল্পীর চোখে দেখা অমোঘ বাস্তব। আশ্চর্যই হতে হয় সে রূপটি অবলোকন করে। 'ইতিহাসচেতনা, সমাজ-অভিজ্ঞতা ও কালজ্ঞান– এই বোধ যখন কোনো ব্যক্তিমানস সংবেদনার স্তর থেকে চেতনাপ্রবাহের নিগূঢ় আবেগ ও বিশ্বাসের ঐক্যবিন্দুতে সুগঠিত করতে সমর্থ হয়, সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞা হিসেবে তখনই তার সিদ্ধি'। মানিকের সাফল্যের উৎস ও সীমানা এ প্রস্তাবে নির্ণীত, প্রথম দুটি বাক্যে। মৃত হারুর অবস্থান ও পরিচয়ই নয় শুধু, ভ্যাগ্য ও দুর্গতিও পারম্পরিক সমগ্রতায় ব্যঞ্জিত। কটাক্ষ করে তাকে প্রকৃতি-বৃক্ষ-সমাজ এমনকি ছোট্ট প্রাণীটিও। এর কারণ কী? কারণটুকু মেলে আরও ডিটেলে এ বিষয়ক আলাপচারিতা ধরে এগিয়ে চললে। অনেক মানুষের সঙ্গে গ্রামের প্রকৃতিকে যুৎসই বেধে দেন মানিক, শতবর্ষী বৃক্ষ, বৃষ্টি, বজ্র, প্রাণিকুল– একাকার তাতে। প্রেক্ষণদৃষ্টিতে (point of view) নিয়তিও একরূপ– সেও ছাড়ে না। শশী এ অমোঘতার পরিচয় 'প্রথম দর্শনেই প্রেম' ভাবে মনে গেঁথে নেয়। গ্রামের মানুষের সান্নিধ্য সংবেদনের তাড়নায় প্রখর হয়ে চলে, এ সংবেদন-স্বরূপটি তো শিল্পীর, যে গোবর্ধনের মনকে চিনে ফেলে, মৃত হারুর জন্য করুণা নয়, মৃত্যুও কারণও খুঁজে বের করা নয়, জাত-পাতের

www.chhandofoundation.org

বিচার আর ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়, সম্মানের ভয়, কানাকানির ভয়। চলমান বিশ্বাসের বাইরে, প্রতিকূলতায়। তার প্রতিবেশে প্রকৃতির পুনর্গঠন। বাস্তবতাও সে প্রকারে চিহ্নিত। শশী একপ্রকার বাধ্যই করে গোবর্ধনকে– কিন্তু সমাজমন! বাধ্যটি, তার সমাজধর্মের বাইরের বৃত্ত। 'মুক্তি হারুর গোবর্ধন ছুঁইলেও নাই না ছুঁইলেও নাই'– তাই তো পাড়া জুড়ে তার অনেক উপাচার। প্রতিটি শব্দই হারু অভিমুখী। অবস্থাপন্ন হারু এ গ্রামের বাইরে গিয়েছিল, কন্য মতির জন্য সচ্ছল মানসম্পন্ন পাত্র দেখতে। ফিরবার পথে বজ্রাঘাতে এ দশা হলে তা হয়ে ওঠে নানা সংকেতাশ্রয়ী এবং তীব্র কটাক্ষ পূর্ণ। এ কটাক্ষের আড়ালে আছে ঘাতপ্রতিঘাতে লুপ্ত সামগ্রিক জনজীবন। এটি প্রতিকৃতি নয়, বাস্তবও নয় লেখকের অন্তঃস্তলের সমগ্রতায় জীবনার্থের পর্যাপ্ত প্রতিমান। এরপর কাহিনি যেন আর থেমে থাকে না। ক্রমবর্ধিত বয়ে চলে এ তটের জীবনঘাটের নানা প্রান্ত ধরে। এগিয়ে চলে, চলে আসে, একে একে প্রতিকূল উপচানো বিশাল ও বিপুল জনমানবকুল। শশীর সন্নধ্য চোখ ক্রমাগত অধিকার করে জনপদসমূহ ও তার প্রতিটি মানুষের আচরণ। ডাক্তার হিসেবে আরও নিকটের তিনি– ঘরের বা বাইরের, গোপন বা নির্গোপনের, অন্তরের-বাইরের, সত্য বা মিথ্যার– আর পূর্বাপর ইতিহাস, পুরাণের তো বটেই। যেন মাখামাখি জীবনের, পূর্ণাবয়ব পরিবেশনা। যার তল বহুকৌণিক, বহুদৃকপাতে আলোড়িত। সে আলোড়ন সমাজমনে, শ্রেণিতে কিংবা পরিস্রুত ঘাত-প্রতিঘাতের কলরোলে দীপিতময়। মানিকের ভাষ্যে এমন বিষয়টিও মোটা দাগের; কেননা ইতিহাসের ভেতরের ইতিহাস, বিপরীতাত্মক দ্বন্দ্বের আরও ভেতরের দ্বন্দ্ব তাই তার কাছে প্রধান প্রতীয়মান। পর্যবেক্ষণ ছাড়ে না তাঁকে, বরঞ্চ তাই গড়ে তোলে কাঠামো-বয়ানে। শশীকে কেন্দ্র করে সে মনস্তত্ত্ব, সেটি গতিমান ও প্রবহমান, দ্বন্দ্বপ্রসূত মন ও আধারকে কেন্দ্র করে। কিছু উদাহরণ :

ক) এবার কার্তিক মাসে পূজা। সেনদিদির সর্বাঙ্গে ব্রনগুলি পাকিয়া উঠিতে উঠিতে গ্রামের পূজার উৎসব শুরু হইয়া গেল। উৎসব সহজ নয়, গ্রামের জমিদার শীতলবাবুর বাড়ি তিনদিন যাত্রা, পুতুলনাচ, বাজি পোড়ানো, সাতগাঁর মেলা– পূজা তো আছেই। গ্রামবাসীদের ঝিমানো জীবনপ্রবাহে হঠাৎ প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে, কেবল শশী এবার সেনদিদিকে লইয়া বড় ব্যস্ত।

খ) খালের কুমির শুধু নয়, ভূতোর কথায় ভূতের কথাও আসিয়া পড়িল। তার পর বাজারের সন্ন্যাসী, বাজার দর, একাল- সেকালের পার্থক্য, নারী হরণ, পূর্ণ তালুকদারের মেয়ের কলঙ্ক, বিদেশবাসী গাঁয়ের বড় চাকুরে সুজন দাস, এই সব আলোচনা। শশী কি এত উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে যে এই সব গ্রাম্য প্রসঙ্গে তাহার মন বসিল না, শান্ত অবহেলার সঙ্গে নীরবে শুনিয়া গেল?

www.chinafoundation.org

গ) বিশ্বাস হয় না, তবু শশীর মনের আড়ালে লুকানো গ্রাম্য কুসংস্কার নাড়া খাইয়াছে। এক এক সময় তাহার মনে হয়, হয়তো আছে, বাঁধা যুক্তির অতিরিক্ত কিছু হয়তো আছে জগতে, যাদব আর যাদবের মতো মানুষেরা যার সন্ধান রাখেন। দলে দলে লোক আসিয়া যে যাদবের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে, এদের সকলকেই বিশ্বাস কি মিথ্যা?

শশী ডাক্তারের মন আর গ্রামীণ মনের দ্বন্দ্বের প্রকৃতিটুকু এখানে আঁচ করা যায়। এর ভেতরে সর্বজ্ঞদৃষ্টিজাত মানিকের মনকে কিছু নিরূপিত বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা যায় : (১) গ্রামের মানুষের গলিত সমস্যার উদ্দিষ্ট প্রতিকার ও সুস্থ পুনর্বাসনে শশীর নিযুক্তি, (২) নিযুক্তির পর কর্মসাধন ক্ষেত্রে তার মন ব্যর্থ ও বিক্ষুব্ধপ্রায় কিন্তু তা 'নীরবভাবে' গণসমাজে অপ্রকাশ্য, (৩) নিজের ভেতরেও প্রলুব্ধ কুসংস্কারগুলো এমন কর্মপ্রয়াসে তাকে গতিহীন করে তুলছে, (৪) দীর্ঘ কুসংস্কারের প্রাকারে শশী যাদব বা যামিনীর গণ-প্রণিপাত একপ্রকার ভীত ও ভয়ংকর বার্তা দেয়, যেখানে শশী নিজেও আটকে আছে সে ব্যবস্থার মধ্যে (৫) বিবরবাসী গ্রাম্যজনতা পরের অব্যয়ি-প্রলাপে সন্ধিৎসু, বিষয়বুদ্ধিহীন, অদৃষ্টবাদী, অনর্থ পরশ্রীকাতরতায় উন্মুখ– সেখানে শশী মূল্যহীন (৬) সামন্ত ব্যবস্থায় 'ব্যক্তি'র মুক্তি নাই, যুক্ত-করের বন্ধনে নিবন্ধিত, সেখানে উৎসব জমিদারের, আর গ্রামের যে উত্তেজনা তা বাইরের– উপরিস্তরের, উপায়হীনের উপরের আনন্দ (৭) গ্রামের বিপুল অন্ধ-প্রাকারে মধ্যবিত্ত ভাবাবেগী-স্ববিরোধকাতর শশীও উদ্বিগ্ন– নিজের প্রশ্নশীল শিথিল আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে, (৮) বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে শশী নিজে যেমন আলাদা তেমনি তার গ্রামময় প্রসার ঘটলে প্রবল অন্ধকারের কর্কট প্রতিবিম্ব তাকে প্রহেলিকায় আবদ্ধ করে– যেখানে নিজেও হয়ে ওঠে অবরুদ্ধ-তিরোহিত। এরূপ প্রস্তাবনায় লেখক দৃষ্টিকোণ, অভিপ্রেত হয়ে ওঠে– স্মরণে নিতে চাই নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটুকু :

> Art itself may be defined as a single-minded attempt to render the highest kind of justice to the visible universe, by bringing to light the truth, manifold and one, underlying its every aspect. It is an attempt to find in its forms, in its colours, in its light, in its shadows, in the aspects of matter and in the facts of life what of each is fundamental, what is enduring and essential...

আর্ট সৃষ্টির প্রেরণায়, 'enigmatic spectacle' রচিত হয়, সমাজের দ্বান্দ্বিক অভিপ্রায়ে, বৈশ্বিক বিচারের মাত্রায়। তাতে নিয়তি নির্দিষ্টতার বাইরে ব্যক্তি-পরাণের জাগতিক প্রতিজ্ঞা গড়ে ওঠে। সৃজিত চরিত্র অর্জন করে বহুমাত্রিক বিভা। রঙ ও রূপের নির্দিষ্ট মাত্রা বাস্তবতাকে করে তোলে বাঙময়। তাতে প্রত্যাদেশও রয়, প্রত্যাশিত শর্তের। শশীর মাধ্যমে গ্রাম-সমাজের পক্ষ-বিপক্ষ, সত্য-মিথ্যা,

www.chirandfoundation.org

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নির্দ্বন্দ্ব রূপটি আধারবন্দী হয়। বাইরের সত্যটিতে যেমন তাৎপর্যে প্রগাঢ়তা পায়, তেমনি ভেতর সত্তার অলৌকিক-অবচেতন আবর্তসমূহও প্রকটিত হয়। শশীর মুখোমুখি যাদব, যামীনির মুখোমুখি শশী, প্রতিপাদ্য হারু ও সেনদিদি, ঘনানো কারুণ্যে উত্তাপময় মতি ও কুসুম, সর্বদা সারল্য-স্পৃষ্ট পরাণ আর পাগলাদিদি; এর অন্তরআখরে পুনর্গঠিত বাস্তবতা, প্রখর উত্তাপমাখানো– জন্ম-মৃত্যু, জীবন-জৈবিকতা, স্বর-প্রতিস্বর, বস্তু-নির্বস্তু, রাজ্য-রাজনীতি, সংস্কার-কুসংস্কার প্রকটরূপে পরিগণিত। এই পল্লিগ্রামকে রূপ দেওয়া, তাবৎ প্রতিজ্ঞার রংয়ে গড়ে তোলা কম কথাটি নয়! সেটি 'এক হাতে' রচিত, ও নির্মম বুননিতে বহুবিষয়ক মনের স্বপক্ষ করে তোলা– কাজটি এতোটুকু নয়। আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই, উপপাদ্যটুকুর ভেতরে না ঢুকে। এই করণেকৌশলে 'enigmatic spectacle', উদ্ধারকৃত অনেক আখ্যায়। আখ্যানের ভেতরের আখ্যান কথায়। বর্ণনাও তাতে আখ্যান গড়ে। নির্মিত করে, বিস্তার ঘটায়, স্বাদে-আস্বাদে বিপুল করে তোলে, অলৌকিকত্বের মর্মপ্লাবী কারুণ্যে। যাদব কিংবা যামিনী এই ভূপ্রকৃতির রঙে নির্মিত, অহং আর নিশ্চিন্ততার প্রহরায় ঘেরা তাদের চেতনার স্তর। গাঢ় ও ঘন সে মুখরা প্রদাহ। অনড় আর অনভিপ্রেত আস্বাদে লালিত। প্রতিরোধ নয়, এমন অন্তঃসার-এর কেন্দ্রে নিমীলিত চক্ষুতে প্রিজমিক রশ্মির বর্ণালী চিনে নিতে চায়, কেন্দ্রাতিগ শশী। কেন? জোসেফ কানরাড (১৮৫৭-১৯২৪)-কথিত 'The Task of the Artist' থেকে বলি : 'To snatch in a moment of courage, from the remorseless rush of time, a passing phase of life, is only the begining of the task.' এই টাস্কটুকু গভীর হয়ে ওঠে, শশী শুধু বাইরেরটুকু দেখে না, নিজেকেও দেখে, চেনে, জানতে চায়। প্রকরণের সারাৎসারটুকু গড়ে ওঠে, নির্বিবাদে, প্রবহমানতায়, কৃষ্টিমুখরিত আচ্ছন্নতায়। হতাশা বা নিরাশার দোলাচলতায় তার সমগ্রতার লয়টুকু ধরা পড়ে, সময়খণ্ডও স্বতঃস্ফূর্তজাত, সম্মুখগামী বিবর্তন-দ্বন্দ্বও দর্শনদায়ে সৃজিত। শশী গোপালকে দেখে তার অভিপ্রায়টুকু জানায়, সেটি মানস-সংস্কারজনিত, প্রতিজ্ঞাঋদ্ধ তাপে ঐতিহ্যিক :

> ডাকাতের মতো দেখায় গোপালকে, খুনে দাঙ্গাবাজের মতো শোনায় তার কথাবার্তা। অমূল্যের ঘরে যে বিচিত্র কথোপকথন চলে, তার কিছুই শ্রান্ত শশীর চেতনায় পৌঁছায় না; জীবন সম্বন্ধে যে অমন তীব্রভাবে সচেতন, সে হইয়া থাকে পুতুলের মতো চেতনাহীন! তাকেই বাৎসল্য করে বলিয়া মধ্যরাত্রে গোপাল আজ যে বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা করে, যে সব অদ্ভুত কথা বলে, তা দেখিলে ও শুনিলে একটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়া যাইত শশীর।

আসলে 'জীবনের গতি দুজনের বিপরীতগামী', দুজনের পথ দুদিকে। কীসে পার্থক্য তাদের! সে পার্থক্যই তার অভিজ্ঞতা। আর ওই অভিজ্ঞতাই তার

www.dhimafoundation.org

ইতিহাস। সংস্কারে-পুরাণে আটকানো। গভীরের গহনে তুমুল দৃকপাত। পিতাপুত্রের সম্পর্কের একটা রূপ এতে পুর্গঠিত। গোপাল ছেড়ে যায়, বিত্ত-সম্পত্তি শশীকে অর্পণ করে, কী এক কানাকানি অস্পষ্ট অনেক মানুষের চুপচাপ কথাবার্তায়। স্থির সেসব কানকথা, কিন্তু তাতে লজ্জা বা 'চলিয়া যাওয়ার' অভিপ্রায় কেন, এতেই কী সে মুক্তি খোঁজে, সে তো হরোস্কোপের দলে নয় কিন্তু লীন-আত্মার মুখপানে কোনো অদৃশ্য আস্তানার পথে– হোক সে কাশী বা কোনো পূণ্যস্থানে। কিন্তু এইটিই কী শেষ কথা! শেষ যাত্রারথ। কিন্তু ফেলে যায় কী? পড়ে থাকে কতো স্মৃতি, মুগ্ধতা আর অনেক অজানা প্রশ্ন কিংবা সমাজ-সংসারের প্রভূত হাসি-কান্না-আনন্দের চিরকালীন বার্তা। সেটি তো মুছে যায় না, না শশীর বা গ্রামবাসীর অন্তর থেকে। হয়তো আলোড়ন একেকজনের এক এক রকম, আলোড়নের স্পন্দন বা স্বরে আছে মিহি ও মোটা অভিপ্রায়, কিন্তু গোপাল গাঁওদিয়ায় অচ্ছিন্ন– এতো অনস্বীকার্যও বৈকি। একই অঙ্গে তুলে আনি আরও আলোড়ন-স্পন্দিত যাদব বা যামিনীকে– বিশেষ করে যাদবকে। উপন্যাসে তার পরিচয়-পর্ব থেকেই এক আগ্রহী ও অভিনব মনরূপে তাকে চিনে নিতে হয়। সম্মান তার অনেক। গ্রামে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কে! তার সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা কার সাধ্য। সে সাধ্যটি শশীই বা পায় কোনভাবে! আদৌ তো ঠেকাতে পারে না কেউ, অচল-অবিচল বিশ্বাসের পারাবতে কে হবে তার মুখোমুখি, কেউ কী তার সিদ্ধান্ত দিতে পারে কিংবা পাল্টিয়ে দিতে পারে তার সিদ্ধান্ত। মহীরুহ, কিন্তু কোন্ ভিত্তিতে তার শ্রদ্ধা, কীসের কারণে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র! একে কী বিশ্বাস করা সম্ভব। গুঞ্জন অনেক প্রকারে। প্রশ্নও নানা মতো। আত্মহত্যা বা আত্মসংস্কার, পরম্পরা, বিদেহী শান্তি, জন্মচক্রের অবসান ও আত্মলীনতা– ইত্যাকার প্রশ্নে কিনারায় আরও জমাট বাধা অনেক প্রশ্ন। শর্তসাপেক্ষ প্রশ্ন। তা ছড়িয়ে যায় বস্তুনিরপেক্ষতা, নৈর্ব্যক্তিকতায়। পৌঁছায় স্থান-কালনিরপেক্ষ বিম্বে। কিন্তু সত্যিই তা সবকিছু কার্যে পরিণত হলে, কোনোকালেই এ গ্রামের মানুষ কেউ তা গ্রহণ না করলেও এ 'গ্রহণধরা' মানুষটি হারান না, হারিয়ে যান না। নানাভাবে গুমোট আলোচনার কেন্দ্রে হয়ে ওঠেন জীবিত। সেটি কাজেরও অংশ করে কেউ। আলাপ-আড্ডা-মারাত্মক সব ব্যাখ্যা এই তো জীবনের অংশ। উপন্যাসটির শুরুতে যে হারুর মৃতশরীর সম্মুখে প্রকাশপর্ব তৈরি করে তা তো অনেককাল মুখে থাকে, আলাপে-আড্ডায় সার্বক্ষণিক অবিচল। আবার নিত্য কর্মপ্রবাহের সমারোহে কোন অচেতন মুহূর্তে তা হারিয়েও গেছে। এক ঘটনার ভেতরে চাপা পড়ে যায়, গড়ে ওঠে অন্য ঘটনা, প্রাধান্য তো বর্তমানকে ঘিরে, বর্তমান যাকে গ্রহণ করে সেই তো গুরুত্ববহ, গুরুতররূপে এ অঞ্চলে, আঞ্চলিকতা ছাড়িয়ে পুরাণে-ইতিহাসে বর্তায়। কিন্তু সমাজটুকুর মালিক কে? কে কর্তৃত্ব করে, শ্রেণিই বা তৈরি করে কে। মর্যাদার

www.chinafoundation.org

বৃত্তটি কীভাবে রচিত হয়! আধার সংস্কার-কুসংস্কার-বিশ্বাস-অদৃষ্ট-নিয়তি নির্বন্ধ তাই আঁধার করে তোলে প্রত্যেককের জীবন, অর্থাৎ এ গ্রামের অনেককাল বসতির জীবন। এ জীবন যাদের হাতে বাধা তা ওই আঁধার-অন্ধকার। বিপরীতে আলো দিতে চায়, ফোটাতে চায় নতুন বিশ্বাস, আলোকিত মনে ভরাতে চায় অনাগত রূপ– শশী, তাইতো তার সবকিছু ছেড়ে এ গ্রামে ফেরা, গ্রহণ করা সবকিছু– কিন্তু সেটি তো শেষ পর্যন্ত এক বিদিত রূপ ধরে না। বোধ করি নিজের প্রশ্নেই, নিজের জগতেই– যেটি এ গ্রামে না ফিরলে সেও খুঁজে পেত না। শশী তো মানিকের মনরূপ ধরে এসেছেন! নইলে এতো আলোময় আলোড়িত প্রশ্নের উৎস কী? পাশাপাশি সমাজ-শ্রেণি-কর্তৃত্ব আর তার ভেতরের জটিল মন, সূক্ষ্ম তারে বাধা মন, প্রণয়ী মন, প্রেমপ্রবণ সত্তা– সবকিছু মিলে দাঁড়াবার শক্তি! শশী সবকিছুরই মুখোমুখি হয়েছে। মুষ্টিমেয় নয়, অনেককিছুতে। সাড়াশব্দে উদ্‌যোগী, উত্তোলিত অনেকানেক। আর তার কেন্দ্রে গূঢ় রহস্যময় নিয়তিসাধিত মন। তবে সমাধান নয়, তার তো দরকারও নেই। মানিক দরকারে গড়েননি তার শিল্প। প্রবণতায় যা অধিকতর তাই লেপন করেছেন, বিস্তারিত প্রয়াসে।

৩.

*পুতুলনাচের ইতিকথা*র আখ্যানভাগের বড়ো অংশ শশী ও কুসুমের অভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তি-প্রণোদনা। এটি গড়ে ওঠে কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বন্দ্বময় অভিমুখের তাৎপর্যে। প্লটের প্রথমাংশে গৌণ-চালে প্রবাহিত হলেও ক্রমশ তা হয়ে ওঠে কাহিনিকেন্দ্রের মুখ্যবিন্দুতে। কার্যত, শশীর জীবনই যেন চালিত হয়, কুসুমকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বে। যেটি এখানে উল্লেখ হয়েছে, *পুতুলনাচের ইতিকথা* শুধু বাহির্দেশীয় সমাজ-ক্রিয়ার স্তম্ভিক-সাক্ষ্য নয়, এটি মনের এবং অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিমনের– বিশেষ করে শশীর। ফ্রয়েড-কথিত অবদমন এর উৎস : 'repression is the most important, ... when a person experiences an instinctual impulse to behave in a manner which the *super-ego* deems to be reprehensible, then it is possible of the mind to push this impulse away, to repress it into the unconscious' শশী গূঢ়তর এ প্রতিক্রিয়ায় অপেক্ষা করে কুসুমের, কুসুমের আচরণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বায়ুবাহিত আবেগ-রেণুর উৎস তার পুরুষমন, শশী অনুরাগ-বাঞ্ছায় সম্মুখগামী, 'the repressed instinctual drive, as an energy-form, is not and cannot be destroyed when it is repressed- it continious to exist intac in the unconscious, from where it exerts a determining force upon the conscious mind, and can give rise to the dysfunctional behaviour

www.chinnofoundation.org

characterstic of neuroses.' সত্যিকার অর্থে, এই প্রসঙ্গটি বুঝে নেওয়া যায় উপন্যাস-কথকের অভিজ্ঞানে : 'খোলা মাঠে বিলীন কায়েত পাড়ার নির্জন রাস্তাটি আজো শশীর জীবনে রাজপথ হইয়া আছে, যে তাকে যতটুকু নাড়া দিয়াছে এই পথে তাদের সকলের পড়িয়াছে পদচিহ্ন। তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু কুসুম, এ পথে আজ শুধু কুসুম হাঁটে।' তার পরে অনেকবার সে বিস্তর কর্মের ভেতরেই কুসুমের পদচিহ্ন খুঁজে পায়। অনাবশ্যক-আবশ্যক নয়, এক অনপেক্ষ শক্তির ইঙ্গিতে, দৃঢ়তর সচেতন মনোবাঞ্ছায়, সত্যিকারের তপ্ত প্রণোদনায়। এতে আচরণের অসংলগ্নতা, ব্যক্তিত্বের-অনাসক্তি, এলোমেলো মনের প্রান্ত-কাঠামো, বিকার-অবিকারের ভেতরে ভয়, কষ্ট, কৌতূহল দুর্দমনীয়রূপে প্রকাশিত। কাহিনি তার এক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক চরিত্রকে খুঁজে পায়। যে কল্যাণের কারণে সে উচ্চাশী আবার এক 'কুসুম-কামীনি'র মধুর ধূপে তা সংরক্ত, বিবিক্ত; নিশিকুটুম্বর সান্নিধ্যই অগ্রভাগে, তাতে ক্ষতিপূরণ আর কেমন! পুরো কাহিনির বিস্তর ধারাটি এমন চরিত্রের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হলে, কুসুমের স্বামী পরাণ, তার চিকিৎসা আর অন্যদিকে 'ছেলের মতো ভালোবাসিবার জন্য নিজস্ব একটি' সেনদিদির সন্তান, রটনা-ঘটনায় এক উৎফুল্ল উদ্‌যাপন, এইটিও প্রত্যক্ষ ও আকর্ষণীয়, তাতে চিনে নেওয়া যায় জৈবিক মন– আর মানিকের লেখক মন, বিস্ময়কর সব অবিশ্বাস্য কর্মকাণ্ডের গভীর প্রান্তমুখ!

'মনটা কেমন করিয়া ওঠে শশীর। হয়তো পরশু, তার পরদিন কুসুম গাঁ ছাড়িয়া যাইবে, আর আসিবে না।' – মনের ভেতরের পুনর্গঠিত সত্তা, পরতে পরতে তার প্রজাপতি-রঙীন পাখা, অনুরাগের স্তরে স্তরে অতিক্রম করা সামাজিক অবগুণ্ঠন, ভেতরে কামনার প্রসারিত তরঙ্গ, গড়ে ওঠে বিস্তর জোনাকী ঝলমল অনুভব– প্রশ্নদীর্ণ অনুভব– কেন সে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, এই পরিচিত জীবনরাস্তায় যে কুসুমকে স্বচক্ষে দেখে, আলিঙ্গনের বাঁধনে জড়িয়ে থাকে– যে দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে তার জীবনে– সে কীভাবে তাকে 'ছাড়িয়া যায়'! শশী ভাবতে পারে না, এ প্রকৃতির সবকিছু বিসর্জিত মনে হয়, বিস্তর আনন্দ-পাখা অস্বীকারের পালে বাতিল হয়ে যায়, শশী যে পথের পদচিহ্নে গরবিনী ছিল, সে পথ এখন দুর্বিষহ, বহু উন্মততার স্মৃতিতে ক্রুদ্ধ, বিবাগী, বাত্যাতাড়িত নন্দনের ধ্বস। এভাবে আচরণে পাল্টায় শশী। অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে বিষণ্নতার, দুর্মর হতাশার। কোনো পেছন ফেরা মানুষ নয়, কিন্তু কেন সে সবকিছু আঁকড়ে ধরে আছে! এই গ্রামের সাফল্য, নিজের জীবনের সাফল্য, মানুষের উপকার-অভিপ্রায়, হাসপাতাল গড়া, ঘরে ঘরে জীবনের আলোর পথ খুলে দেওয়া, তর্কে-বিতর্কে মানুষের সদা-আনন্দের অভিনন্দন– সবকিছু কার জন্য, শশীর জীবন কেন এতো উজ্জ্বল ছিলো– সবকিছুর কেন্দ্র কী কুসুম! কুসুমই কী তাকে এতোদূর পর্যন্ত টেনে

www.chinnofoundation.org

আনে, সেই কী তার প্রেরণা? এই প্রেরণাই কী তার জীবনের সমস্ত স্বপ্নগুলোকে খুব বড়ো দামে কিনে নিয়েছিল! এখন কুসুমের গ্রাম ছাড়লে তার কী? পরানের বৌ গ্রাম ছাড়লে শিক্ষিত শশী কেন এতো অনাচার করে নিজের ওপর! সে ডাক্তার, তার সেবা-কর্তব্য সবকিছুই কী কুসুমের জন্যই সম্মুখে চলছিল? এ প্রণয় বা সংসর্গের দূত কেন শশীকে দুর্বল করে ছাড়ে! এমন প্রশ্নবিদ্ধ প্রতীকপ্রবণ সমাজ, প্রতিনিধিত্বশীল বঙ্গীয় গ্রাম গাঁওদিয়ায় যে ঘন ও গূঢ় কাহিনি গড়ে তোলে– সেখানে শশী ডাক্তার শুধুই গ্রামের সংস্কার-কুসংস্কার-কুপমণ্ডূকতার অন্ধরাশিতে আটকানো গণপ্রতিনিধি নন, ব্যক্তির রহস্য আর নিজের অভ্যন্তরীণ সংকটের মাত্রাটুকু ধরিয়ে দেওয়ারও আকাঙ্ক্ষা তার, তাতেই সদ্য পুঁজির-প্রসারে পুনর্গঠিত একটি শ্রেণি-চরিত্রের সন্ধান মেলে। এছাড়া নিশ্চল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজ-কাঠামোর ভেতরে বহু পুরনো নিস্তরঙ্গ সময়, জীবনপ্রবাহের অবিনাশী উপাচার, আরাধ্য জীবনের প্রতুল আকর্ষণ, ঋষি-তাপিত জমিনে পেটানো ভাববাদী আদর্শ, নিয়তির শিরোধার্য কুশল আর জৈবিক প্রবারণার প্রতাপশীল ইঙ্গিত এ উপন্যাসে চিরন্তন ও চলতি সমাজের চাকাটিকে প্রকাশিত করে ফেলে। এটি স্থবির সমাজের সচল চাকা (রথ)। এই সচল রথটি এ সময়ে এই একুশ শতকের গ্লোবাল বিশ্বেও সংজ্ঞার্থ অর্জন করেছে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত তার তাপ ও ভাপ। এই বৈষম্যময় সমাজকাঠামোয় এখনও গ্রাম এই গাঁওদিয়ার নিয়তি-ভূতে অবিনশ্বর। সে গাঁওদিয়ায় যামিনী-যাদব যেমন আছে তেমনি আছে পরাণের বৌ, মতি, হারু, গোপাল বা সেনদিদি। একইরূপে, একই সংস্কারে তারা কী অপরিবর্তনীয়? মৌল কাঠামোতে দেখা যায় কি কোনো পরিবর্তন? উপরকাঠামোর পরিবর্তন ও প্রসার আছে, হাতে হাতে ইলেকট্রনিক উপাদান বা স্যাটেলাইটের কেবলে আটকে গেছে দাপুটে বিশ্বের কর্পোরাল নানা ক্যারিকেচার। কিন্তু মৌল কাঠামোটি কেমন? এই চরিত্ররা কী অদৃষ্টকে অস্বীকার করে? মানিক মৌল-কাঠামোতে নিঃশঙ্ক নন্দনের ছোপ এঁকে দেন। গড়ে তোলেন শঙ্কিত সমাজের দৃপ্ত ইমারত। প্লটের কার্নিশে বুনে তোলেন অভিপ্রেত ব্যক্তি-প্রণোদনা। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দোলাচলতা, অদৃষ্টের অপচিত অবভাস, জড়তা-স্থবিরত্বের সংকেত ও তার ব্যক্তিদায়, নেতি-অহংকে। সেটি পেরুনোর অভিমুখে কর্মস্রষ্টার এই অশেষ কঠিন ও অসামান্য সৃজনপ্রণালী। কিন্তু এমনটি কী প্রকরণ-পদ্ধতিতে পরিস্রুত? সেইটিতেই শশীর আচরণিক প্রয়াসটি অভিপ্রেত করে তোলেন লেখক। যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ভেতর চলমান শশীর বাধা ও বিঘ্নতার অতিক্রমণ-প্রয়াস। বহুকালের নিশ্চল ক্ষেত্রটির চিহ্নিতকরণ এবং সেটির জড়ত্ব-দ্বিধাজর্জর আস্তরণভেদী অভিপ্রায়, অদৃষ্টের অপচয়কে বাতিলগণ্য করে তোলা– এইরূপ কর্মের প্রণালীটুকু শশীর প্রত্যয়ে বৃদ্ধি পেতে চাইলে, সেও মধ্যবিত্ত ভাবাবেগে জড়িয়ে পড়ে– তার ভেতরেই। আভ্যন্তরিক প্রকাশ মিইয়ে

www.chinmofoundation.org

পড়ে। সেটিও গড়ে ওঠে কুসুম-কেন্দ্রিক কামরাগবাসনার মঞ্জুলিতে। সেটি বিস্তারিত হয়, বিস্তরণ লাভ করে– ওইরূপ অভিপ্রায়ের ভেতর দিয়ে। মনোবিকলন স্বতঃধার কিনারায় ধাবিত। সমাজদ্বন্দ্বের কাঠামোতে উপরিস্তর গড়ে, ভেতরতলের চলমান রূপান্তরিত অভিমুখ ক্রিয়ায়। *পুতুলনাচের ইতিকথা*র প্রণালীতে ধরা পড়ে কুসুমকেন্দ্রিক প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার নানা অন্তরাল ও অভিব্যক্তির সঞ্চরণ। এই আচরণ, চারিত্রময় আবর্ত-অভিমুখ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আখ্যানে দুটি কৌশলকে চিহ্নিত করে। এক. বঙ্গীয় গ্রামসমাজের দ্বন্দ্বিক বস্তুকেন্দ্রিক বিবর্তনবাদী ইতিহাস নির্ণয়– যেখানে সামগ্রিক সমাজের চ্যুতি-উন্নতির দিক-নির্ণয়, দুই. প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিশাসিত ব্যক্তির ভাবাবেগের বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো চিহ্নিতকরণ। উপন্যাসের প্রথমোক্ত বিষয়টি চিহ্নিত হয়ে দ্বিতীয়োক্ত কর্মকৌশলের ভেতর দিয়ে। সেখানে শশীর মন-মনন-মনস্তত্ত্ব বিচিত্র বীক্ষণে পুনর্গঠিত। এ বিচিত্রতার একটি নতুন স্বর ধরা পড়েছে। জৈবিক মন ও তার মনস্তরের ইগো-তাত্ত্বিক অনুষঙ্গসমূহ। তত্ত্বটির চেয়ে এতে স্বতঃস্ফূর্তময় অমোঘ কার্যকারণসিদ্ধি। সমাজ ভাঙনের কারুণ্যে শশী-কুসুম সম্পর্কের সংশ্লেষ-বিশ্লেষ, জারণ-বিজারণ। মানিকের শিল্পের কর্মপ্রয়াস চিত্রটি কোনো তত্ত্ব-ভারাক্রান্ত না করেও এর উচ্ছল আশ্বাস আর উজ্জ্বল জীবনবিন্যাসের সূত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে না। তাই শশী ১২-১৩ পর্বাংশে 'মনটা কেমন করিয়া ওঠে'রূপে অভিব্যক্তময়। কুসুমের চাক্ষুষ সংশ্রবে শশীর পরোক্ষ বিষণ্নবদনআভা, তাতে তার অনুরাগ বা বিবাগী জড় অস্থির অসংযত অনভিপ্রেত হৃদয়মুখটুকু অপ্রকাশ্য হয়। কাহিনির ন্যারেশানে প্রবহমান থাকে, তাতে ইতিহাস-পরম্পরা বা ঐতিহ্যিক কর্মকুশল অনিবার্য প্রয়াসে বর্ণিত হয়, আর তপ্ত দর্শনটি তো থাকেই :

> কেন চোখ ছলছল করিল না কুসুমের? একবার বাপের বাড়ি যাওয়ার নামে আছাড় খাইয়া তাহার কোমর ভাঙিয়াছিল, যদি বা শেষ পর্যন্ত গেল, ফিরিয়া আসিল পনের দিনের মধ্যে। এখানে এমনভাবে হয়তো এই তাদের শেষ দেখা, এ জীবনে হয়তো আর এতো কাছাকাছি তারা আসিবে না, আর আজ একটুও কাঁদিল না কুসুম, গাঢ় সজল সুরে একটি আবেগের কথা বলিল না? কুসুমের মুখে ব্যথার আবির্ভাব দেখিতে শশীর দুচোখ আকুল হইয়া ওঠে, অস্ফুট কান্না শুনিবার জন্য সে হইয়া থাকে উৎকর্ণ। কে জানিত কুসুমের দৈনন্দিন কথা ও ব্যবহারে মেশানো অসংখ্য সংকেত, অসংখ্য নিবেদন এত প্রিয় ছিল শশীর, এত সে ভালবাসিত কুসুমের জীবনধারায় মৃদু এলোমেলো, অফুরন্ত কাতরতা? চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে, আর আজ এই তালবনে তার এত কাছে বসিয়া খেলার ছলে কুসুম শুধু বাজাইবে চাবি! কি অন্যায় কুসুমের, কি সৃষ্টিছাড়া পাগলামি!

www.chinafoundation.org

এর মধ্যে শশীর আকর্ষণ বা কুসুমের 'ব্যর্থ' অভিপ্রায় মুখ্য নয়, গ্রামসমাজের আভ্যন্তর শক্তির সংস্কার-অহংকার, ভাবানুরাগ, স্মৃতি-নস্ট্যালজিক নার্সিসাস প্রতিশ্রুত। সমাজধৃত জীবনের উপলখণ্ডটি ধরা দিয়েছে– সংহারমূর্তিতে। সেখানে 'such behavioral symptoms are highly irrational, but are completely beyond the control of the subject because they are driven by the now unconscious repressed impulse'-এইটুকু চেতনস্তরের কাঠামো, সে চেতনস্তর নিশ্চয়ই সমাজধৃত সংহারমূর্তির প্রচল প্রবাহ। অচেতন সত্তাটিও গড়ে ওঠে অভিজ্ঞতার সারাৎসারিক মৌলখণ্ডে, সেটির ভেতর-উপর দুস্তরেই যৌক্তিক পরিসর রচিত হয়, প্রাত্যহিক দ্বান্দ্বিক প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। তাই শশীর মনোজগত যে রূপে উপন্যাসটিতে অভিব্যক্ত তার একটি ফ্রয়েডীয় দাবি যেমন আছে তেমনি এর বাইরেও সমাজভিতের দ্বন্দ্বসূত্রটি অভ্রান্তরূপে উৎকীর্ণ হতে সক্ষম হয়। *পুতুলনাচের ইতিকথা*র মূল্যজ্ঞান সে পরিসরেই বিবেচ্য।

৪

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিছক কোনো চরিত্র সৃষ্টি করেননি, উপন্যাসও তার আখ্যানের নির্ভরতায় প্রতিশ্রুত নয়। এক দৃষ্টিকোণে যেমন কাহিনি বানান তেমনি চরিত্রও সৃষ্টি করেন। *পুতুলনাচের ইতিকথা*র শিল্পী শিল্পের আত্মা খুঁজেছেন, অভিপ্রায়টি চিহ্নিত করেছেন। দৃষ্টিকোণে গড়ে নিয়েছেন ভঙ্গুর সমাজ আর কালখণ্ডের রোগগ্রস্ত উপসর্গসমূহ। তাতে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণি নয়, সামগ্রিক অন্তর্বয়নটি যৌক্তিক আবর্তমাফিক ভূমি-বায়ুর সংশ্রবে তেতে তুলেছেন। এতে নায়ক শশী তার দৃশ্যমান সমাজের সবটুকু যেমন বিবেচনায় এসেছেন তেমনি তার নিজের সমস্যাতেও অস্থির হয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন। কাউকেই আড়াল করেননি শিল্পী। কোনো বিষয়কে একপাক্ষিকও করেননি। ভেতর-বাহির, আলো-অন্ধকারের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াটুকু ফ্রেমবন্দি করেন। সমাজরোগের খুঁত ধরে এক অমোঘ জীবনের পরোক্ষ প্রতিশ্রুতি গড়ে দেন দৃষ্টিকোণে। এইটিই মানিকের দৃষ্টিকোণ। এর ভেতরেই নির্ধারিত শিল্পের অমলিন কাঠামো ধরা পড়ে। বলা যায় : ''Art is long and life is short', and success is very far off. And thus, doubtful of strength to travel so far, we talk a little about the aim- the aim of art, which, like life itself, is inspiring, difficult- obscured by mists. It is not in the clear logic of a triumphant conclusion; It is not in the unveiling one of those heartless secrets which are called the laws of nature. It is not less great, but only more difficult. মানিক কী এই শিল্পের শিল্পী! অনেক বড়ো লেখক তো এই কাজটুকুই বুঝিয়ে দেন। অবশ্য, এই একটি উপন্যাসে সে

www.chintofoundation.org

বিচার সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে মহৎ আর্টের অভিমুখটুকু তো এতে বুঝে নেওয়া যায়!

www.chinnofoundation.org

মহাশ্বেতার সাহিত্যস্বভাব

কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬র ১৪ জানুয়ারি-২০১৬র ২৮ জুলাই)। তাঁকে আমরা চিনি *হাজার চুরাশির মার* কল্যাণে। পরে ক্রমশ আরও পরিচিতিতে বাঁধে *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর*, *অরণ্যের অধিকার* আর অনবদ্য চরিত্র *রুদালি*, *টেরোড্যাকটাইল* প্রভৃতির মাধ্যমে। কী আছে এসব রচনায়? নিম্নবর্গীয়/দলিত/স্যবলটার্ন মানুষের সংস্কৃতি, তাদের সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের ধ্রুপদী গাথা। তার রূপকার তিনি। তাইতো মহাশ্বেতা বলেন 'I have always believed that the real history is made by ordinary people. I constantly come accross the reappearance, in various forms, of folklore, ballads, myths and legends, carried by ordinary people across generations...' এমন লক্ষ্য-নির্দিষ্ট তাঁর শিল্প। তাঁর গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পীভাক। কার্যত, মহাশ্বেতার রচনায় ব্যাপকভাবে অনুরুদ্ধ হয়েছে এই উত্তর-উপনিবেশবাদ তত্ত্ব।

মহাশ্বেতা দেবী বাংলা ভাষার প্রবীণ লেখকদের অন্যতম। সাহিত্যে অবদানের জন্য পেয়েছেন ভারতের জ্ঞানপীঠ, পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণসহ আরও নানা পুরস্কার। এ নারী অ্যাকটিভিস্ট স্বপ্ন দেখেছেন আদিবাসী অধিকার ও মর্যাদার জন্য। মানুষের স্বপ্নে হয়তো আবেগ থাকে, মোহান্ধও হন অনেকেই কিন্তু মহাশ্বেতা তা হননি। তিনি ঠিক উল্টো। যা বলেছেন– তা করেছেন, পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে কাজ করেছেন। মাঠে গেছেন। মিশেছেন সবার সঙ্গে। একাকার হয়ে গেছেন। প্রসঙ্গত, কল্লোলের কবি ও নাট্যকার মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব) তাঁর বাবা, নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য স্বামী আর কবি নবারুণ ভট্টাচার্য তাঁর একমাত্র সন্তান (যিনি দুবছর আগে প্রয়াত হয়েছেন) এবং বাংলা চলচ্চিত্রের আইকন ঋত্বিক ঘটক তাঁর কাকা। এমন লেখক পরিবারে জন্মে মহাশ্বেতা অধিক জীবনঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং প্রান্তিক মানুষের প্রতি ছিলেন তুমুল দায়বদ্ধ। নিছক শিল্পচর্চা তাঁর কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। শিল্পকে তিনি সমাজের প্রয়োজনে, আভ্যন্তরীণ সংগ্রামী-শক্তির উৎস হিসেবে দেখেছেন। এবং সেভাবেই কাজ করেছেন। তাঁর লেখায় ওই মানুষরাই এসেছে, সংঘবদ্ধভাবে। আদিবাসী, প্রান্তিক বা নিম্নবর্গীয় সব শ্রেণিহীন মানুষ তারা। যারা তাঁর প্রেরণার উৎস। কার্যত, তাঁদের শক্তিকেই তিনি শিল্পিত রূপ দিয়েছেন।

২.

দে'জ পাবলিশিং কলকাতা *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র* বের করেছে কুড়ি খণ্ডে। তাতে উপন্যাসের সংখ্যা মেলে ৫৯। গল্প অনেক। নানা রকমের গদ্য আছে এতে।

www.shimofoundation.org

মহাশ্বেতা লিখেছেন বেশুমার। তাঁর রচনার উচ্চতা শুধু অসামান্য বললেই চলে না। প্রচুর পড়াশোনা, দৈনন্দিন পরিশ্রম আর দায়বদ্ধতার নিষ্ঠায় গড়ে উঠেছে তাঁর শিল্পসত্তা। এজন্য তিনি কোনো আপস করেননি। বলেছেন : 'আমি লিখতে লিখতে লিখতে শিখেছি' এবং 'আমি কোথাও পৌঁছতে চাই বলেই পথ হাঁটছি।' জীবনকে সপেছেন তাঁরই আদর্শে 'প্রয়োজন' আর 'অস্তিত্বে'র নিরিখে। প্রশ্ন ওঠে কেন তিনি *ঝাঁসীর রানি* (১৯৫৬) লিখবেন? ১৮৫৭র ইতিহাস তো নানা শ্রুতি আর স্মৃতিতে গড়া। এই ফাঁদ তাঁকে টানলো কেন! আরও পেছনে বর্গীর ইতিহাস তো আরও রহস্যে ঘেরা। প্রায় সবটুকুই রূপকথা-লোককথার চাদরে মোড়ানো। তাতে আগ্রহ কেন! শুধু আগ্রহ নয়, প্রস্তুতি নেন তিনি। পড়তে গিয়ে ধন্দে পড়েন। বিপরীতে যুক্তিও গড়েন। কয়েকরকমের ইতিহাসের পঠনে পাঠ-আয়ত্তে আনেন। খুঁজে বের করেন রাজবৃত্তের আড়ালে কীভাবে ঢাকা পড়ে আছে গণবৃত্তের ইতিহাস। তাঁর ঝোক তৈরি হয়। কারণ, তিনি তো রাজার যুদ্ধ বিবাদ আর ক্ষমতার ইতিহাস তৈরি করতে বসেন নি। রাজার প্রতিপক্ষ কারা ছিল? বা রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে প্রাণ যাওয়া 'উলুখাগড়া'ইবা কারা! বিস্ময়করভাবে পর্যুদস্ত ওই দলিত শ্রেণির জীবনবৃত্ত। তাদের কথা কেউ জানে না! তাদের নাম-নিশানা কোথাও নেই। শুধু খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়ানোর ইতিহাস বলা হয়েছে। কে এরা? এদের শ্রেণিই বা কী? এভাবে প্রশ্নের ভেতর দিয়ে মহাশ্বেতা নিজেকে ভাঙেন, তৈরি করেন, গড়েন। বিস্তর বুদ্ধি আর চিন্তাশক্তির নিষ্ঠায় তিনি একের পর এক গণবৃত্তের মানুষের ইতিহাসে হাত দেন। তবে স্মর্তব্য, মহাশ্বেতা প্রথানুগ ইতিহাসকে একপ্রকার বাতিলই করে দিয়েছেন। কিংবা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'র নির্ধারিত সংজ্ঞাকেও আমলে নেন নি। তিনি পুরাণ-শ্রেণি-অঞ্চল-লোকশ্রুতি-লোকসংস্কার-প্রত্নবীক্ষণের ভেতরে সমাজ-অর্থনীতির বিবর্তিত ধারাকে অনুসন্ধানের প্রয়াস পান। সেখানে কখনো নর্তকীর ইতিহাস কখনোবা সার্কাস-শিল্পীদের জীবনাধারা বা ভঙ্গুর সামন্ত সমাজের চিত্র কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত– আবার কখনোবা অধিক অপরিচিত গণমানুষ, দলিতশ্রেণি তার কাঙ্ক্ষিত চরিত্র হয়েছে। কার্যত, সমাজ-মানুষের ধারাটি চিহ্নিত করাই তাঁর লক্ষ্য। বিষয়বস্তুও সেভাবেই নির্ধারিত। এ লক্ষ্যেই তিনি শিল্পভাষাও তৈরি করেন।

শিল্পবিচারে মহাশ্বেতার কথাশিল্প ত্রুটিমুক্ত বলা যাবে না। তবে অনেক রচনার ভেতর থেকে *আঁধার মানিক*, *হাজার চুরাশির মা*, *অরণ্যের অধিকার*, *চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর* ধ্রুপদী শিল্প বলা যায়। 'A novelist can only begin to explore the value of human experiences by developing the characters of the story.' মহাশ্বেতা চরিত্র সৃজন করেছেন, ইতিহাসের ভেতর দিয়ে। সে ক্ষেত্রে ইতিহাসই কখনো চরিত্রে পরিণত হয়েছে আবার ইতিহাস প্লটও গড়ে দিয়েছে।

www.climatefoundation.org

এক্ষেত্রে 'The period of the rise of the novel as a literary form has also been the period of really great experimentation with, and development of, techniques in the management of point of view'– মহাশ্বেতার রচনার দৃষ্টিকোণটি এ লক্ষ্যে পরিস্রুত হয়। দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবে উত্তর-উপনিবেশ ধারণার একটি বড় অংশ গ্রহণ করতে সামর্থ্য হন মহাশ্বেতা। সেখানে নিম্নবর্গের ইতিহাসও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। গ্রামসী কিংবা স্পিভাক তত্ত্ব সরাসরি বিশ্লেষিত হতে পারে তাঁর কথাসাহিত্যে। কেন্দ্র-প্রান্ত, ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, শোষক-শোষিত দ্বিবাচনিক স্বরও তীব্রভাবে সম্বন্ধ সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে বাখতিনের তত্ত্বও প্রয়োগযোগ্য। আদিবাসী জনসংস্কৃতির যে রূপ তাঁর লেখায় অনিবার্য তা বিচিত্রগামী, এ পাঠে। আর মার্কসবাদ তো বটেই। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ তথা বিশ্বায়নবিরোধী দৃষ্টিকোণটি তাঁর উপন্যাসে অধিক তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে।

৩.

মহাশ্বেতার প্রথম গ্রন্থ *ঝাঁসীর রানি*। এটি জীবনীগ্রন্থ। গ্রন্থটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন : 'এ গ্রন্থ প্রচলিত অর্থে ইতিহাস নয়, রানির জীবন-চরিত লেখার প্রয়াস মাত্র।' ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য থেকেই তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। 'ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে যায়'– এই তাঁর লেখক-প্রত্যয়। 'লেখক মহাশ্বেতা দেবী থেকে কর্মী-লেখকে পরিবর্তিত হয়ে ওঠার উৎসে তাঁর এই 'অন্য' ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধতাকে বুঝে নিতে হবে আজ। ঝাঁসির রানি-দ্রৌপদী-স্তনদায়িনী কিংবা আঁধারমানিক-বসাইটুডু-হাজার চুরাশির মা-অরণ্যের অধিকার ইতিহাসের কাছেই তাঁর দায়বদ্ধতা।' এমন উল্লেখনীয় আখ্যানের বৈচিত্র্যের খাঁজেই গড়া ইতিহাস। তাঁর অনেক রচনাতেই হয়তো ইতিহাস আছে কিংবা একই ইতিহাসে হয়তো গড়ে উঠেছে অধিক চরিত্র। আরও একটি কথা স্পষ্ট করা যায়, 'লোধা-শবর-সহিস-কিরিবুরু-সাঁওতাল-হরিজনদের জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশকথা।'– এই দেশকতাই তাঁর কাঙ্ক্ষিত সৃজিত শিল্প, সন্দেহ নেই।

ইতিহাস কী? তা কী শুধুই রাজা-রাজড়াদের বিবাদ-বিসম্বাদ? তা নয়। মহাশ্বেতা বলেন : 'ইতিহাসের ধারায় শিক্ষিত হতে হলে একজন বিবেকবান শিল্পীকে জানতে হবে সেই অঞ্চলের ভূগোলকে, সমগ্র মানব-সমাজকে, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলকে।'– এই ইতিহাসই শিল্পের উপলক্ষ্য। তবে প্রকৃত লেখক তো আটকে থাকেন না কোথাও। তিনি যুঝতে যুঝতে চলেন। তাতে তার যাথার্থ্য প্রকাশ পায়। পথরেখা তৈরি হয়, বিবর্তনের চাঞ্চল্যরেখাও ধরা পড়ে। শ্রেণিস্বার্থ, শ্রেণিসমাজ, আর্থ-সমাজ, ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব, আদিবাসী সমাজ, দারিদ্র্য, সংগ্রাম-আন্দোলন জনসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় এমন বহু উপাদান উপলভ্য

www.chinnofoundation.org

হয়ে ওঠে– এরূপ প্রস্তাবনায়। ষাটের দশকে মহাশ্বেতা দেবী অনেকটাই বিচিত্রমুখী, দ্রোহচিহ্ন গল্পে যতোটা ধরা পড়ে উপন্যাসে ততোটা নয়। "নিশি" গল্পে দেখা যায়– কুসুম বলছে, 'তোর নিঃশ্বাসে, তোর চোখে বিষ আছে। আমার ভয় করে।' আবার "শকুন" গল্পেও আছে কীভবে দরিদ্র মানুষকে শকুনের চেয়েও হিংস্র ও ঘৃণ্য করে তোলা যায়। তবুও সমালোচক ইরাবান বসুরায়কে প্রাসঙ্গিক করে বলা যায় : 'প্রথম থেকেই মধ্যশ্রেণীর পরিচিত গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। 'নটী'র ইতিহাসাশ্রিত তীব্র উত্তেজক পরিস্থিতিতে ছিল এক নর্তকীর কথা। 'মধুরে মধুর' উপন্যাসটি তৈরি হয়েছিল নৃত্যশিল্পীদের নিয়েই। ... উপন্যাসের চরিত্রগুলো মধ্যশ্রেণীর 'ভদ্রলোক' নয়, তাই তাদের প্রবৃত্তি, তার প্রকাশে কোনো পালিশ নেই।' তাইতো সার্কাস এরিনার জীবনে মনোহর ও প্রেমতারার প্রেম কীভাবে প্রতিরোধের বাঁক পেরিয়ে সত্যিকারের বাস্তবতা সিদ্ধি পেল– যেখানে নর-নারী সম্পর্কের তীব্রতার আকুলতাই জয়ী হলো : ব্যান্ডের ঝমাঝম্ বাজনা আর ভোর-রাতে রাউটির বাঁশি আর কোনোদিন ভুলিয়ে নিয়ে যাবে না সার্কাসের মেয়েকে। জীবনে বাঁচার নিশানা পেয়ে গেছে প্রেমতারা। *তারার আঁধার*-এর যে নায়ক, তার জীবনের বিরাট ট্র্যাজেডির মধ্যে আছে একটা আঙ্কিক গোলযোগ। লেখকের কথায় : 'প্রয়োজন' ও 'অস্তিত্বে'র বে-হিসেব। 'এই হিসেব অনেকটা অর্থনীতির 'ডিম্যান্ড' ও 'সাপ্লাই'য়ের মতো। মেপে-মেপে, ভেবে-ভেবে চলতে হয়। নইলে জীবনের জটিলতা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।' বিজয় দাশের 'নার্সিসাস কমপ্লেক্স' নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। তবে শেষ পর্যন্ত বিজয়ের আত্মহত্যা অতি নাটকীয়। বিজয় দাশের পরিণতি তেমন শিল্পসফল মাত্রা পায় না। যেভাবে সে নির্বিকল্প-অস্তিত্ব ধারণ করে বাস্তব জগতে তা শুধুই তোষামদী আর ভ্রান্তিতে ভরা। মেলাতে পারে না নিজেকে। অথচ বিপরীতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব তাকে উধাও হয়ে ধায়। এই শূন্যতার পরিণতিই এক অর্থে তার আত্মহত্যা। বিষয়ের ভিন্নতায় এটি তৃপ্তিকর উপন্যাস, একপ্রকার বাস্তবিক নতুন চরিত্রের অন্বেষণও বটে। কিন্তু ট্রিটমেন্ট দুর্বল। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে লেখা *আঁধারমানিক* (১৯৬৭) গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। এটি ভূমি মাটির সুপিনদ্ধ স্পন্দন। কালপ্রবাহের গতির যে শক্তি তা স্পষ্ট– কারণ, পিপাসার জল তো সাজানো পাত্রের জিনিস নয় তা মাটির জলেই থাকে; তাইতো *আঁধারমানিক*-র স্পন্দন এতো উজ্জ্বল আলোকময়। বর্গীর অত্যাচার, রাজার লড়াই, জয়-পরাজয়ের বিবরণ কতো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তারে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। নির্মম ইতিহাস শুধু বাজুবন্ধের ধ্বনি, তলোয়ারের রক্তাক্ত খাপের আলেখ্য বয়ন করে কিন্তু সাধারণ প্রজার শোষণ-নিপীড়ন কিংবা শ্রম-শ্রেণির ইতিহাস বর্গীর অত্যাচার অশ্বক্ষুরে ভূলুণ্ঠিত। তাই এটি 'লোকবৃত্তের ইতিহাস।– কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবন গড়ে ওঠার প্রাক-মুহূর্তের ইতিহাস।' এর

www.chinnotfoundation.org

ক্যানভাস বড়। কাহিনির কেন্দ্র বর্ধমানের আঁধারমানিক গ্রাম। সমালোচক বলেছেন, 'আঁধারমানিক গ্রামের কয়েকটি পরিবার দিয়ে যে কাহিনীর শুরু, তার বৃত্ত বড় হতে হতে ধরে ফেলেছে মেদেনীপুর থেকে মুর্শিদাবাদ, নগণ্য রামাই বাগদী থেকে নবাব আলিবর্দী, সুরাট সওদাগর থেকে ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ কুঠিয়াল। তাদের সবাইকে বেঁধেছে একটিই সূত্র, বর্গী।' বিস্তর ইতিহাসের পাখায় এর কাহিনি বিচিত্রগামী। বাগদীপাড়ার রামাই, আনন্দীরাম মুখোটি, সংসার-বৈরাগী সুরকণ্ঠ এর প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। বর্গী আক্রমণে রামাই আহত হলে বউ পারী ধর্ষিত হয় আর আচার্যের কিশোরী কন্যা নির্মলার কোচড় থেকে স্বর্ণালঙ্কার লুঠ হয়– ফলে স্পর্শদোষে নির্মলা (যতো উচ্চবংশীয়ই হোক) নিস্তার পায় না। তপ্ত ঘৃতপানের বিধান মানতে হবে। কিন্তু এতে তো মৃত্যু অবধারিত। তাই কৌশলে নির্বাসন দেওয়া হয়। এদিকে আনন্দীরামের স্ত্রী ফুলেশ্বরীর জীবনে সুরকণ্ঠ কীভাবে এলো জানে না। এবার সে পালাতে চায়। কিন্তু রেহাই নেই কারণ সমস্ত বাংলার পথে পথে এখন তারই ডাক। কারণ, যে গেরুয়াবসন বিন্যস্ত তার শরীরে– সেখানে পথের সবাই তার কাছে মুক্তি চায়। এদিকে তখন চার্চে বসে ফাদার আন্তেনিয়ে ডায়েরিতে লেখেন এতো যীশুর জন্মের আগের ইস্রাইলের কাল। 'এক্সোডাস'। মানুষ ছুটে চলে তখন কলকাতার দিকে, গঙ্গা-যমুনা কিংবা জাত-পাত-শ্রেণিভেদ আর থাকে না। সবকিছু মিলে সবাই বাঁচতে চায়, চায় 'নতুন আশ্রয়, নতুন যুগের সন্ধান।' বর্গী হানার ইতিহাস চমৎকার মুন্সীয়ানায় বুনে দেন লেখক। বুদ্ধির চাকচিক্য আবেগের লাটাইয়ে অনুরুদ্ধ হয়ে ব্যঞ্জনা দেয়। পেয়ে চলে ভিন্নমাত্রা। লেখকের এ অনালোকিত ইতিহাসে প্রকোষ্টে ঢোকার পরিশ্রমটুকুতে যেন আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। অবশ্যপাঠ্য ও অনবদ্য এ ইতিহাস গ্রন্থটিতে বর্গী আক্রমণের প্রেক্ষাপট ধরে বেরিয়ে আসে জনসমাজের কাহিনি। এ যেন রাজবৃত্ত থেকে লোকবৃত্তের ইতিবৃত্ত তৈরির পথরেখা। প্রসঙ্গত লোকসমাজ এতে শিল্পিত হয়, জীবনের উৎসবকে অবলম্বন করে। এ উৎস কার? বেসরকারি জনতার। প্রান্তিক, আদিম, বঞ্চিত মানুষের। যাদের শ্রমে-হাহাকারে রচিত উচ্চবর্গের নহবতখানা। লেখকের দৃষ্টি প্রান্তে (periferal)। প্রান্ত তো অনেক উপাদানে উৎসবপ্রবণ। লোকাচার-সংস্কার-সারল্য-কিংবদন্তী আর রোমাঞ্চরসে ভরা তাদের কাহিনি। এতেই তাদের উৎসারণ ও ক্রমবিকাশ। তাইতো বাখতিন বলেন : 'Carnival against Capital, Carnival against Power'। ১৯৬৭ তে লৌকিক কবি মুকুন্দরামের জীবন নিয়ে লেখা ভিন্ন ফর্মের উপন্যাস *কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু*। স্মর্তব্য যে, 'Every age and culture has its characteristic narrative forms'– ভীমাদল, নিদয়া অরণ্য, রাজা গর্গবল্লভ, চুয়াড় উপজাতি, কবি বন্দ্যঘটী ও ফুল্লরা সকলেই (associative rythm) মিথ বা

www.ohimcfoundation.org

পুরাণকথার বাসিন্দা। এখন 'গোলকশুঁড়ি তার শুঁড়িখানায় বসে এখনও গল্প করে থাকে'– এই গল্পের কিংবদন্তীই উপন্যাসের বিন্যস্ত প্লট। আদিবাসীর আদিম সংস্কৃতি ও আচারের অভীপ্সা উপন্যাসে ইতিহাসের গুরুত্বকে নতুন সংজ্ঞার্থ দান করে যেখানে 'the why and how of the people's evolution'।

৪.

ষাটের পর মহাশ্বেতার স্বভাবসিদ্ধ পরিবর্তনটি লক্ষণাক্রান্ত হয়ে ওঠে। যে পঞ্চাশ থেকে তার লেখালেখি শুরু সেটি ষাটে একপ্রকার বিশেষত্বপ্রবণ; নিম্নবর্গীয় চরিত্র-নির্মাণ তথা ইতিহাসের ধারাবাহী আদিবাসী প্রান্তজনের লৌকিক জীবনাচরণে তা পুনর্গঠিত– তীব্রতর, গুরুত্বপূর্ণও। মহাশ্বেতার লেখকপ্রবণতাও ষাটেই চিনে নেওয়া যায়– প্রতিরোধ, শ্রেণিচেতনার উচ্চনাদী দ্রোহচেতন স্বরে। যেটি সত্তরে এসে আরেকটি পর্যায়ে উপনীত। কর্মে-তত্ত্বে চিন্তায় একপ্রকার বুঝে নেওয়ার পালা চলতে তাকে। সেই ফলশ্রুতি সত্তরের মাঝামাঝি পাওয়া যায়। লেখা হয় নকশাল নিয়ে *হাজার চুরাশির মা* (১৯৭৪)। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন :

> লিখেছিলাম এক অরাজনীতিক জননীকে নিয়ে, যার সঙ্গে তার ছেলের সম্পর্ক এমনই, ছেলেকে পেয়ে ও নিজেকেও খুঁজে পায়। সুজাতা মানুষ হিসেবে এমন যে, সংসারের অবমাননাগুলির প্রতিবাদ চেঁচিয়ে করে না, নীরব থেকেই বুঝিয়ে দেয় ওই কুৎসিত আচরণে ওর এসে যায় না কিছু। ব্রতা ব্যতীত অন্যদের বেলা সুজাতার ভালোবাসার চেয়ে কর্তব্য পালনটাই বেশি। সুজাতার নীরবতা, ওর অন্তরের আভিজাত্যপূর্ণ উপেক্ষা। এবং রাজনীতিক মানুষও ও নয়। অরাজনীতিক এক মা, যার ছেলে রাজনীতি করতে গিয়েই মারা যায়। তারপর তো সন্তানের বিষয়ে সুজাতার প্রথম আঘাত, ছেলেকে ও চিনত না। ব্রতীরা কেন মরে– এই 'কেন' জানতে গিয়েই সুজাতা নিজেকেও আবিষ্কার করে। এই সুজাতা অন্তরে নিঃসঙ্গ ছিল। ব্রতী ওকে মানুষের হাটে এনে দিয়ে যায়। 'হাজার চুরাশির মা' সেই মায়ের কাহিনী।

হাজার চুরাশির মা একজন 'মা' (সুজাতা)র গল্প। যার পুত্র (ব্রতী) [মর্গে লাশ নম্বর ১০৮৪, নকশালবন্দীর নম্বর]। শ্রেণিশত্রু খতমের 'আদর্শ'র কারণে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্মমভাবে নিহত। পার্টির প্রতিবিপ্লবীর পরিণতি– এ মৃত্যু। কাহিনির শুরু ব্রতীর মৃত্যুবার্ষিকীতে, যেখানে সুজাতা স্মৃতিতে ব্রতী ফিরে আসে, জন্মমুহূর্ত থেকে। সুজাতা ব্রতীকে মাতৃত্বের স্নেহ দিয়ে চিনতে চায়, বিচার করতে চায় তার বিপ্লবী মানসিকতার কারণসমূহ খুঁজে দেখে। গল্পের ভেতর দিয়ে প্রতিরোধী ও ন্যায়শীল ব্রতীর চর্চায় সে এক 'যৌক্তিক মা'তে পরিণত। জনতার পক্ষে, ন্যয়সত্যের পক্ষে ছেলের মৃত্যুর জন্য সে দায়ি করে বর্তমান 'শুষ্ক গণতন্ত্রকে'– যেখানে অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারিতাকে সমাজের অধিকাংশই প্রশ্রয় দেয়, সমর্থনও করে। মা হিসেবে

www.chirnofoundation.org

সুজাতা উপন্যাসে কাহিনির কেন্দ্র (Protoganist), যেখানে সে নিজেকে পুনরুদ্ধার করে। এক মানবিক মুহূর্ত তৈরির ভেতর দিয়ে 'রাষ্ট্রের মা' হিসেবে দৃশ্যমান হয়। তরুণ প্রতি-বিপ্লবীদের অস্থির ও রোমাঞ্চকর রাজনৈতিক শক্তি কমুনিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে দমনের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের বিপরীতে এক জাতীয় মাতৃমূর্তি এই *হাজার চুরশির মা*। বেশ ভিন্ন স্বর উপন্যাসের প্লট নির্মিত। 'মা' 'রাউন্ড ক্যারেকটার' হয়ে ওঠে। পরিসর ছোট হলেও উপন্যাসটি বিপুলায়তন প্রবাহে যুক্ত হয়ে পড়ে। একজন নারী অনেক স্তরের ভেতর দিয়ে সম্মুখে এগোয়। কন্যা-জায়া-জননীর সর্বংসহা মূর্তি তৈরি হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিরোধগুলো স্বীকার করে নিতে হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন, 'দ্বিতীয় লিঙ্গে'র ধারণা, কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা সুজাতার 'মাদারহুড' সত্তাকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে। সে বলেছে : গাঢ়, যেন কফবসা গলায় জিগ্যেস করেন দিব্যনাথ। কামনায় অস্থির হলে ওঁর গলায় যেন কফ জমে থকথকে হয়ে যায় স্বর। সুজাতা জানেন দিব্যনাথকে। দিব্যনাথ তাঁর শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেবার একটি অর্থই হতে পারে।... তিনমাস পর আবার সুজাতা ব্যংকে যেতে শুরু করেন। ... সত্যি বলতে কি, তাঁর ছেলে এমন কলঙ্কিতভাবে মরেছে, এই খবরটা ঢাকবার জন্য জ্যোতির বাবা দড়ি টানাটানি করে বেড়াচ্ছিলেন। ... সেদিন ব্রতীর সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার চেতনায় ব্রতীর বাবারও মৃত্যু ঘটে।... ব্রতীর খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে সুজাতা ভুরু কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন, ব্রতীর হত্যার পেছনে তাঁর কি পরোক্ষ অবদান ছিল? কিভাবে তিনি তৈরি করেছিলেন ব্রতীকে যেজন্যে এই দশকে, যে দশক মুক্তির দশকে পরিণত হতে চলেছে সেই দশকে, ব্রতী হাজার চুরাশি হয়ে গেল! অথবা কি করতেন তিনি, অথচ করেননি বলে ব্রতী হাজার চুরাশি হয়ে গেল? কোথায় সুজাতা ব্যর্থ হয়েছিলেন?' আর রাষ্ট্র? উপন্যাসে আছে :

> ব্রতীর জন্য কাঁদতে কাঁদতেই জ্যোতি ও দিব্যনাথ তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, এ সমাজে বড় বড় হত্যাকারী, যারা খাবারে-ওষুধে-শিশুখাদ্যে ভেজাল মেশায় তাঁরা বেঁচে থাকতে পারে। এ সমাজে নেতারা গ্রামের জনগণকে পুলিসের গুলির মুখেঠেলে দিয়ে বাড়ি-গাড়ি পুলিস পাহারায় নিরাপদ আশ্রয়ে বেঁচে তাকতে পারে। কিন্তু ব্রতী তাদের চেয়ে বড় অপরাধী। কেননা সে এই মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও স্বার্থান্ধ নেতাদের সমাজে বিশ্বাস হারিয়েছিল।

মা'ও তাই বলেছিল। এমন প্রশ্নের ভেতর দিয়ে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রে একজন মা গড়ে ওঠে। সে পারিবারে ও ব্যক্তিতে, ব্যক্তি ও সন্তানে, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে, ব্যক্তি-ব্যক্তিতে– রোধ-প্রতিরোধে, সত্য-অসত্যে, ন্যায়-অন্যায়ের দৃষ্টিকোণে সংশ্লেষিত। লক্ষ্য 'মা'রূপে। সীমাবদ্ধতা ও সংকটে মা'র ভূমিকা, সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতার তৃপ্তি– যেখানে স্বামী দিব্যনাথ এক 'পুরুষ'। উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রশ্নশীল মা

www.chinnofoundation.org

কমুনিস্ট নক্সাল মুভমেন্টে নিহত পুত্রের ভেতর দিয়ে সমাজ ও পরিবারতন্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকে চিহ্নিত করে। প্রশ্নের মাঝে উস্কে দেয় আত্মঅস্তিত্ব, আত্মগ্লানি ও বিবমিষা।

প্রতীকী চারটি অংশে চিহ্নিত *হাজার চুরাশির মা* : 'In the first chapter, significantly DAWN ('সকাল'), Sujana primarily returns to her interior, private world of personal suffering, tourcher, betrayal and loneliness. Negotiating the inner time in relation to her immediate familial situation, she becomes aware ofhow she and Brati were not just fellow suffers but also soul mates.' দ্বিতীয় অংশ 'দুপুর' এখানে প্রধান ঘটনা সমুর মার সঙ্গে সাক্ষাৎ– যেখানে মৃত্যুর আগে সে অবস্থান করছিল, এবং সমুর মা ও সুজাতা একই পরিণতির অংশ। সমুর মার ভেতর দিয়ে সুজাতার অন্য একটি অংশ খুলে যায়– দরিদ্র, ডিগ্রেডেশন, সাব-হিউম্যান ধারণা ইত্যাদি। তৃতীয় অংশ 'বিকেল'– যেখানে সুজাতার সাক্ষাৎ হয় নন্দিনীর সঙ্গে। ' It is Nandini, who reconstructs for sujata all the events leading up to brati's betrayal and murder... It's through Nandini that sujana is finally able to understand the reasons for Brati's political convictions and his rejection of the bourgeoisie code.' কার্যত এ সমাজের আমরা কেউই 'didn't really know Brati'। শেষ অংশটি 'সন্ধ্যা'। এখানে পরিবর্তিত মাতৃত্বের এক মূর্তমান রূপ স্বতঃশ্চাঞ্চল্যে সুনিপুণ। সে নীতিগতভাবে আত্মবিশ্বাসী এবং রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। কারণ, ব্রতী যেখানে নেই সেখানে সে শূন্য, অবমূল্যায়িতও। মৃত্যুর পরও সে অবহেলিতই থেকে যাবে– ওই 'পুরুষ' দিব্যনাথের সংসারে। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সুজাতা তার ডি-ক্লসাড্, সাপ্রেসড– সে অবস্থা থেকে মুক্তির প্রশ্নটি উপন্যাসে গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে– যদিও পুত্র ব্রতীই তার প্রধান আবেগবিন্দু। একজন 'মা'-ও এ চিরন্তন সমাজের কর্তৃত্বের অধীন। তবে বুঝি *হাজার চুরাশির মা* সমকালের 'জেনারেশন গ্যাপে'র গল্প! নক্শাল আন্দোলনের সময়খণ্ডটির ভেতরে শ্রেণিধারণাটি অপুষ্ট বা বেদনাবহ যেমনটিই হোক, হারিয়েছে ব্রতীরা– অনেকে সে তারুণ্যময় আবেগকে পুঁজিও করেছে– নিজের প্রয়োজনে। ব্যক্তিই এসব মুভমেন্টে মুখ্য ছিল– এর ফল শেষ পর্যন্ত স্বার্থেই লীন হয়েছে।

নকশাল আন্দোলন নয়। গ্রাম-ভারতের আধাসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নগ্নভাবে উন্মোচন করাই *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭) উপন্যাসের উদ্দেশ্য। এটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ১৯০০ সালের মুণ্ডা বিদ্রোহের ভিত্তিতে লেখা। উঠে এসেছে বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্ব। তিনি উনিশ শতকে মুণ্ডা বিদ্রোহ গড়ে তোলেন। সহেবদের ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। পরে রাঁচি জেলে রহস্যজনকভাবে মারা যান।

www.eminfoundation.org

মিশনারীতে থাকে বীরসা। একসময় সে বুঝতে পারে এদের উদ্দেশ্য অন্য। 'তারা দু-চারজন আদিবাসী যুবককে খ্রিস্টান করে এবং চাকরি দিয়ে পিতৃসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায়। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠল বীরসা।' লেখক বীরসাকে শুধু বিদ্রোহী বীরেই পরিণত করেন না তাকে কিংবদন্তী-মিথ-ইতিহাস ও প্রত্ন চোখে নবরূপায়ণ দেন। মুণ্ডাদের কাছে বীরসা 'অবতার'রূপে পরিগণিত হয়। সে বিদ্রোহী বাহিনি গঠন করে, তীর-ধনুক-বল্লম নিয়ে ন্যায়ানুগ অধিকারের বাণী প্রতিষ্ঠা করে। *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসের শুরুতেই বীরসার মৃত্যুকে দেখান হয়। কী অমানুষিক নির্যাতনে তার মর্মান্তিক মৃত্যু! তার পর ফ্ল্যাশব্যাকে পুরো কাহিনির বয়ান। এই বীরসাই পরে পাওয়া যায় *চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর*-এ।

চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করেন স্যবলটার্ন-তাত্ত্বিক গায়ত্রী স্পিভাক। 'Chotti is my best beloved book'– এতে 'একই সঙ্গে একটি মানুষ, তার সমাজ, একটি আন্দোলন, দীর্ঘ ব্যাপ্ত একটি এবং সেই সময়ের রাজনীতি, উত্থান-পতন ও অবক্ষয়ের বিশ্লেষণী বৃত্তান্ত বর্ণিত। কিন্তু বৃত্তান্তের বিবরণের ঢঙ হল একের পর এক tabuleau উন্মোচন। মহাশ্বেতা এতে নিছক গল্প বলেন না, 'চোট্টি', নদীর নাম, তরঙ্গের নাম, কান্না-হাসির প্রতীক। নামকরণের পশ্চাতে থাকে লোকজীবনের সংস্কার ও মূল্যবোধ। এখানে তীরেরও আখ্যান আছে। মুণ্ডাদের গানের মতোই তা নিরুচ্চার কিন্তু প্রতিবাদী, ক্ষমতা আর পৌরুষে সবটুকু সৃজ্যমান। 'এই তীর মুণ্ডাদের গানের মতো বিরসা মুণ্ডা থেকে ধানী মুণ্ডা হয়ে চোট্টি মুণ্ডা অবধি ধারাটিকে বহতা রাখে। তীর দিয়েই কাহিনির গতি চিহ্নিত, চিত্রিত। চোট্টি তীরকে ব্যবহার করেনি, কারণ, কাউকে হত্যার জন্য এ অস্ত্র নয়– সেটি তার স্বভাবও নয় কিন্তু যখন শেষ রক্ষা হয় না তখন মিথ্যা দায় নিতে হয়। তখন তো তীরে যাদু বর্ষিত হলো, সে রহস্যে সকলেই হতবুদ্ধি। 'একদিন চোট্টি, অন্যদিকে এসডিও, মাঝে শূন্যে উত্তোলিত হাজার ধনুক। আর অনেক উত্তেজিত হাতে সাবধান ঘোষণা।' এটা অনেকটা 'যাদু বাস্তব' (Magic Realistic)।

ঐক্য দেখান। আদিবাসী-সংগ্রামের উচ্চতা নির্ধারিত হয়। অলৌকিক, কিংবদন্তী, করাল বাস্তবতা, রক্তপাত, আর মৃত্যুর উৎসব মিলে এক হয়ে রয়। লুপ্ত ইতিহাস যেন জেগে ওঠে। বোর্হেস, মার্কেজের অলৌকিকত্বে যেমন বাধা পড়ে কাহিনি ও চরিত্র তেমন চোট্টি মুণ্ডার যাদু-তীর সাক্ষ্য হয়ে ওঠে :

> কথা বলতে বলতেই ও তীর ছোঁড়ে আর নিশানী বাঁধে। যোনকা হাঁটু ছুঁয়ে সম্মান জানিয়েছিল। চোট্টি বলেছিল, যত জনা পারে নাই, তত জনার ধনুক নিয়ে দেখাব? মন্তর পড়া আছে বটে। কিন্তু মন্তরপড়া তীরটা দেখ ব্যবহার

www.eimfoundation.org

করি নাই। যেটাতে নিশানী বিঁধলাম, সেটা আমার নাতিটার তীর। এ কথাও সত্যি মন্তরপড়া তীর কাছে থাকতে আমি নিশানাছুট হব না।

মহাশ্বেতা দেবীর *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* আলাদা মানের রচনা, সন্দেহ নেই। আদিবাসী আখ্যানের শুধু সীমিত দৃষ্টান্তেই মুগ্ধতা নয়, এতে ম্যাজিক-অন্বেষা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তীরের শক্তি, জনতার শক্তিতে পরিণত। পূর্বের মতো এ জনতাও কার্নিভালপ্রিয়।

'চোট্টিমুণ্ডা আমার সমগ্র আদিবাসী চিন্তার সমাহার। সমগ্রটা এক জায়গায়'– এর অর্থ কী? বিস্তৃত করলে বলা যায়, *অরণ্যের অধিকার* গ্রন্থে ইতিহাসের বীর বীরসার তীর প্রান্তিক নেতা ধানী মুণ্ডার মাধ্যমে পৌঁছে গেছে তিরন্দাজের মেলার চোট্টিমুণ্ডার কাছে। এ চোট্টি তাঁর সৃজিত। এ চরিত্রটি সৃজন করতে গিয়ে নির্ধারিত পরিবেশ, মানুষ, লোকজ সংস্কৃতি-আচার-আনুষ্ঠানিকতা চমৎকাররূপে প্রামাণ্য করে তুলেছেন। এজন্য তাঁর অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক। চোট্টিমুণ্ডা কিংবা বীরসা আদিবাসী বীর, তাদের সংস্কৃতির অধিকার-মর্যাদা সম্পর্কে তারা সচেতন। সংস্কৃতি রক্ষার জন্য, কিংবা মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে তারা মরতেও জানে। প্রস্তুতও। কিন্তু সে আত্মদান সহজ নয়। সংগ্রাম করে, প্রাণান্ত লড়ে, সভ্যতার ধারাকে চিরজীবিত করেই তাদের বাঁচার শক্তি অর্জিত হয়। সেজন্য লক্ষণীয় যে, একপ্রকার মানবিক মর্যাদার উচ্চতা এতে তৈরি। তবে সে কাহিনিটি নিছক রক্তশূন্যগ্রস্ত নয়, ইট-কাঠের পাথরের নয়– মানবিক জীবনাচরণের সমস্ত পরাকাষ্ঠা নিয়ে মহীয়ান। সেখানে লোকজ চিরায়ত বিশ্বাস-সংস্কার, মূল্যবোধ, নিম্ন-সংস্কৃতি, সংস্কার এক বর্ণিল প্রবাহে সুপিনদ্ধ। বাখতিনকথিক 'কার্নিভাল-তত্ত্বে'র প্রয়োগে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে নিম্নবর্গীয় নেতা 'বীরসা'। *অরণ্যের অধিকারে*, এমন তীব্রভাবে সে উঠে আসে– আদিবাসী আন্দোলনের শক্তিতে প্রমত্ত, বর্ষীয়ান– সমস্ত গণ্ডী তাতে যেন অতিক্রম করে যায়; বীরসার চরিত্রায়ণ সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তিতে তুমুল প্রতিশ্রুতিমান। এগুলো যে শুধু তাৎক্ষণিক সমাজের বিবৃতি তা নয়, ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষাও বলা যাবে না– এতে পুনর্গঠিত হয় দ্বন্দ্বসংকুল জীবনের অস্তিত্বিক সংগ্রামের ধ্রুপদী অভিমুখ। সেখানে নির্ধারিত বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ সরল ও সংঘবদ্ধ সৌন্দর্য নিয়ে চিরজীবিত। প্রসঙ্গত, আদিবাসী মুখের ভাষাও তাতে গুরুত্বশীল। চরিত্র সৃজনে মহাশ্বেতার এ মানসিক শক্তি আর অবিকল রূপায়ণের কর্তব্য– নিশ্চয়ই অভিনব। নির্ণিত এ কাঠামোতে তা সংস্কার ও সংস্কৃতির চিরউৎসবমুখর বারতা– তাই এ বর্ণিল রূপশুদ্ধ জয়ী মানবজীবনেরই ইঙ্গিত। এই অর্থে তা দায়বদ্ধও।

৫.

www.dhimoffoundation.org

মহাশ্বেতা দেবী ঠিক কোনো জায়গায় থেমে থাকেননি। সাহিত্যস্বভাবেও তার বদল ঘটেছে। *হাজার চুরশির মা* কিংবা *চোট্টি মুণ্ড ও তার তীর* এর রচনাকাল সত্তরের দশক। *মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্পের* (১৯৮৪) ভূমিকায় বলছেন :

> সত্তরের দশকে রচিত হাজার চুরাশির মা থেকে হঠাৎ কথাসাহিত্য রচনায় 'নতুন পথ' নিলেন কেন, ধারণাটি সম্ভবত তাঁর ক্ষেত্রে ঠিক নয়। ... গোটা ভারতীয় বাংলা সাহিত্যেই একটা নতুন স্রোত এই দশকে এসেছিল, এবং বাংলা উপন্যাসের নানা ধরণের নানা বিশ্বাসের নানা প্রস্তুতির লেখকরা প্রায় কেউই এড়াতে পারেননি নকশালবাড়ি-আন্দোলনের ঝড়ের প্রভাব, মহাশ্বেতার ব্যক্তিগত পরিবর্তন, যা একরকমের উত্তরণ, গোটা বাংলা সাহিত্যের এ সময়ের পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ অংশ। [রচনাসমগ্র ৮, পৃ. ৪৬৬]

সমালোচক ইরাবান বসুরায়ের ভাষ্যে আরও বলা যায় :

> সত্তরের দশকের উপন্যাসে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল অন্যভাবে। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না রেখেও ঐ প্রবল আন্দোলনকে অনুভব করে তাকে রূপ দিতে গিয়ে একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকে ও নিজের উপন্যাসকে ভাঙলেন ও নতুনভাবে গড়লেন একজন ঔপন্যাসিক– তিনি মহাশ্বেতা দেবী।

সত্তর পেরিয়ে আশিতে মহাশ্বেতা গল্প-উপন্যাসে (*নেঋতে মেঘ* গল্পগ্রন্থ প্রভৃতি) প্রান্তিক মানুষ, আদিবাসী জনপদ, শ্রমশীল জীবনবৃত্তে জীবনের জয়ই দেখা যায়। অরণ্য-পাহাড়-বনজঙ্গল অধিবাসীরা নিজস্ব কৃষ্টি ও লোকাচারে সরল ও তীব্র জীবনবাদী। সভ্যতার বৈচিত্র্যও তারা। মনে পড়ে বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* উপন্যাসের কথা। আশিতে এমন বিবিধ গল্পে মহাশ্বেতার জীবনদর্শনের পুনরাবৃত্তি ঘটলেও একপ্রকার ইতিহাসের আনুগত্যকে উচ্চতায় ছড়িয়ে দেন– নিবিড় শিল্পকৌশলে। এর মধ্যে তাঁর 'টোরোড্যাকটিল' আবার ফিরে আসে। *টেরোড্যাকটিল*, *পূরণ সহায়* ও *পিরথা* উপন্যাসে তিনি লেখেন : 'ভারতের আদিবাসীদের দেশের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ আজ, নতুন শতকে।... টেরোড্যাকটিলকে আসতেই হতো। পৃথিবীতে জীবসৃষ্টির আদিপর্ব থেকে ১৯৮০-র দশকে মধ্যভারতে তাকে আসতেই হতো আদিবাসীদের মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্বেগ জানাতে। কিন্তু সে এ কথাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের অস্তিত্বও বিপন্ন ছিল, তোমরাও আজ বিলুপ্তির সম্মুখীন। পূরণ সহায় এক সাংবাদিক।... আর 'পিরথা' শব্দটি পৃথিবীর সমার্থক...।' টেরোড্যাকটিল একই সঙ্গে মিথ ও প্রতীক, এক বিবেকী সাংবাদিক যে কোনো কিছু করতে একেবারে অক্ষম আর এই পৃথিবী (ভারতবর্ষ) এক আদিতম জাতিদের জগত– এই নিয়ে এ উপন্যাস।

৬.

www.chinnofoundation.org

মহাশ্বেতা এবম্প্রকার উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তাকে কল্পনার রঙে রাঙিয়েছেন কিন্তু একপ্রকার জীবনধারার ইতিহাস গড়তে গিয়ে মানুষ-জঙ্গল-প্রতিবেশ-প্রকৃতি-নিসর্গকে ছাড়েননি। অনুষঙ্গি করেছেন। এর ভেতরে তাঁর সরল বিশ্বাসও বুনে দিয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন। তাইতো 'টেরোড্যাকটাইল' তৈরি। সে যেন পুনর্বার ফিরে আসে, প্রত্ন-ইতিহাসের চোখে। লেখকের জনপ্রিয় উপন্যাস *হাজার চুরাশির মা*র মাতৃত্বও তীব্র পূর্ণতায় লাবণ্যময়। ম্যাক্সিম গোর্কীর *মা*-র কথা স্মরণে আসে। আর এখানে এ 'মা'-তেও রাজনৈতিক উত্তাপ আছে, তা অন্যরকম শৈলিতে ব্যক্তিত্বময়। মা কী বদলায়? নিশ্চয়ই বদলায় না, সে আশ্রয়-অনুপ্রেরণা ও প্রতিশ্রুতিশীল। মহাশ্বেতায় তা আরও অভয়রূপে হাজার হয়ে বেজেছে। বস্তুত, ইতিহাসটা মহাশ্বেতায় সত্য ও কমিটেডরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। ইতিহাসের অমোঘ দায় ও অনিবার্যতা তার শিল্পিত জীবনের প্রেরণা। এ লক্ষ্যেই দেখা যায় 'ফরেস্ট প্রটেকশান আইন'-র প্রশ্নবিদ্ধতা ও বিতর্ক, আদিবাসীদের অকুস্থল পাহাড়-অরণ্য নিয়ে নিরাপত্তার বসত গড়ার মমতাময় আনুগত্য, 'পিরথা' বা পৃথিবী যে সমান– সবার-সকলের, আর ভুঁইফোঁড় সভ্যতার নামে তার বিনষ্টি যে চলবে না– সেটি সামাজিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠা পাক– লেখক তা সমর্থনও করেন। সেজন্য নিজেও সক্রিয় হন। শুধু সমর্থন নয়– সংঘবদ্ধ করে প্রতিরোধী হন, সংগঠন গড়েন (পশ্চিবঙ্গের পুরুলিয়ায় তাঁর আদিবাসী সংগঠন আছে), কাজে নিবিষ্ট হন। মহাশ্বেতা আমৃত্যু তা-ই করে গেছেন। তাঁর কাজের প্রতি শ্রদ্ধা। তিনি বেঁচে থাকুন, সকলের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে। ##

www.chinmofoundation.org

কল্যাণকর/বেসরকারি রাষ্ট্র ধারণা : প্রসঙ্গ *সমুদ্র বাসর* উপন্যাস

the world actually experienced, and not the merely thinkable world

সমুদ্র বাসর-র কাহিনির অকুস্থল; দক্ষিণাঞ্চল-বিধৌত স্যাঁতসেঁতে উর্বর– চিত্তজয়ী জনপদ। ওর জনসংস্কৃতি আর জলমাটিতে মেশা আছে সংস্কার– যা স্মৃতি-মস্তিষ্কের হাওয়ায় মেশানো, ওতে আছে পৌরাণিক শক্তি; সাগর-তরঙ্গের ফেনায় একপ্রকার নেশার মত্ততায় জড়ানো, আর সে নেশার তারে বাঁধা উদ্যত 'মিস্টিক মুড'। ওরকমেরই অবিকল ভাষা উপন্যাসের, ভাষ্যটিও। শক্তি কম, তবে বেজায় আকৃষ্টপ্রবণ ও দুর্মর বৈশিষ্ট্যে বিবৃত আখ্যান। এখন যদি বলি 'অঞ্চল' কী? অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কী? তবে বলা যায়, মাটি জেগে-ওঠা ভূমি আর সে মতের ট্রাডিশনে ওই চূড়ান্ত দেশ। শামসুদ্দীন আবুল কালামের দৃষ্টিকোণ [সৌন্দর্য] তাই পুণ্যতোয়া তরণী বায় [it is in relation to the whole actual unity that my unique thought arises from my unique place in being]– এমন প্রেক্ষাপটে। সুজাত আলী– ওইসমেত তার বাপ-দাদা-মতলব মিঞা আর তার বিপরীতে মুজফফর– শ্রেণিদ্বন্দ্ব– কিন্তু অতিরিক্তরূপে *সমুদ্র বাসর* আরও অধিক চিন্তায় ঘেরা, প্রাচুর্যময় মানুষ-জনপদ-জীবন ও বিশ্বাস আখ্যানের অধিকৃত বিস্তর স্বপ্ন-সাহসের প্রণোদনায়। শৌর্য-বীর্যের চেয়েও অধিক সুখ-সন্তাপ ও প্রাণময় জনপদের সর্পিল জীবনের চিত্রণ এখানে বিধৃত। লেখকের ওসব বর্ণনাতে এতোটুকুও টাল নেই, পলকা দুলে উঠে কিছু যে বলবে তাও নয়– একক ছন্দে, লক্ষ্যচিহ্নিত পথের রেখায় পূণ্যবান বুনিত মনের সর্পিল চিত্রারূপ। তদ্রূপ মনে ও মানের আখ্যান এই *সমুদ্র বাসর*। নিশ্চয়ই এটি উপন্যাস– কারণ, ডিটেল নিপাট-পারিপাট্যময় প্রাচুর্যতায় তা পরিপূর্ণ, আমাদের প্রেক্ষাপটে অভাবিতপূর্বও। আছে চালচ্চিত্রিক আভাসও। উদ্ধৃতি দিতে চাই, মিখাইল বাখতিন থেকে কারণ উদ্ধৃত জনসংস্কৃতি ও 'বেসরকারি' পরিকাঠামোর সত্য-চাঞ্চল্য পুনর্গঠন প্রয়াস, যেখানে নবরূপে নির্মিত প্রান্তিক জনসংস্কৃতির আখ্যান, স্যবলটার্ন বৃত্ত এক গ্রান্ড স্কোপের পরিখা, সেখানে চিনে নেওয়া যায় ব্যক্তির পেরুনোর শক্তি, সে শক্তিতে কারণ ও তৎসৃষ্ট ক্রিয়ায় সংঘাত নিরূপিত। 'বেসরকারি' (প্রান্তিক/ জনসংস্কৃতির/ নিম্নবর্গীয়) প্রতিনিধির বিপরীতে দাঁড়ানো প্রতীকী মুজফফর (কেন্দ্র/ সামন্ত/ শ্রেণিচরিত্র) দ্বন্দ্ব– এবং ক্রমশ উত্তরিত দ্বন্দ্ব, সর্বসমেত অনেক উৎসবমুখর প্রেরণায় প্রান্ত-ই দাঁড়ায়, উপন্যাসে অ্যারিস্টটল-কথিত বৃত্তের বদল ঘটে– তখন ওই প্রোটোগ্যানিস্ট সুজাত আলী। *সমুদ্র বাসর* কয়েকটি কারণে বড় পরিবেশ পায়, এক. সমুদ্রতরঙ্গের সাথে

www.chitrofourdation.org

মানব জীবনের সংশ্লিষ্টতা, দুই. প্রকৃতি ও পুঁজির বিপরীত 'বাইনারি অপোজিট' সংঘাত দেখানো, তিন. সংস্কৃতির উৎসবানুষঙ্গ সংশ্লিষ্ট করা, চার. জয়-পরাজয়ের স্বরূপে মানবজীবনের সত্য উদ্‌ঘাটন, পাঁচ. উদ্দিষ্ট বুননে 'unique place in being'-এর ভাষা তৈরি। বৃহত্তর কাঠামোর প্রতিশ্রুতি থাকলেও শেষ পর্যন্ত আখ্যান গড়িয়েছে মেলোড্রামার পথে। লেখক-রচিত অন্যান্য উপন্যাসের মতো ['কাঞ্চনগ্রাম' ব্যতিরেকে] নয়, *সমুদ্র বাসর* বরং এগিয়েই– বিস্তৃত পরিকাঠামোতে পূর্ণতা পায়, আভাসেই মেলায় না। তবে 'মিলিবে মেলাবে'র নিরিখে আলোচিত উপন্যাসটিকে উপর্যুক্ত শর্তে এখানে যুক্তিশৃঙ্খলে পাঠ-বিরচনের চেষ্টা করি।

২.

ক্রিস্টোফার কডওয়েল– যিনি উপন্যাসের কলাকৌশল নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, উপন্যাস বৃহত্তর জীবনের বিবর্তিত রূপায়ণ। বাস্তবতাই তাতে মুখ্য। এই বাস্তবতার স্বরূপে বাখতিনও বলেন, 'প্রান্ত', 'বেসরকারি' মুক্তাঞ্চল বসতি ও 'কার্নিভাল' উপাদান। এসব প্রান্তশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপদের ক্রিয়াশীল প্রান্তমুখ নির্ণয় এবং সেই লক্ষ্যে নির্ধারিত সংস্কৃতির ভাষাবুনন পুনর্গঠন করা আধুনিক ঔপন্যাসিকের মুখ্য কাজ। তার বাইরে তিনি কিছু দেখার সুযোগটুকু আমলে নেন না। সেখানে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৫-১৯৯৭) পূর্ণতররূপে ওই জাতেই পড়ে যান। ওঁর লেখায় জড়ানো থাকে বিস্তর জনতা। আর ক্রিয়াশীল জনপদের সমাজ-সাপেক্ষ সংস্কৃতির স্বরূপার্থেও নিহিত জনতার আভ্যন্তরীণ শক্তি। তাইতো কথাসাহিত্যেকের কাজ– তারই অন্তর্বয়ন করা, সে অন্তর্বয়নে তীব্রতর থাকে দ্বন্দ্ব, বাহিরাশ্রয় প্রভাবিত মন ও মনোদ্বন্দ্ব এবং টুটে যায় মনোচালিত সংশ্লেষের প্রবৃত্তি-প্রেরণার যাবতীয় সংকুল বিভা কিংবা বিচিত্রতার সন্তাপ। *কাশবনের কন্যা* (১৯৫১) থেকে লেখকের শুরু। সে লেখায় জোবেদা মূল। নারী কিন্তু সর্বমুখ সঞ্চারী বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে গড়া। বৃহত্তর সংস্কার সাধ্যায়ত্ত সে। আর বক্ষ্যমান *সমুদ্র বাসরে* (১৯৮৭) আছে করিমন, সোনা, জরিনা। নারী হিসেবে তারা এক্সক্লুসিভ না হলেও স্বভাবমতো ক্রিয়াশীল। প্রখানুগ ও পুরুষানুগ। পুরুষের মনোধাঁচে গড়া। অনুগত। সমর্পিত। তাদের গড়ে ওঠা মন যেন পুরুষ-চাহিদামাফিক। যেহেতু যে জনপদ– তার সাক্ষ্যও তা-ই। সেরূপেই থাকে নারীমনের প্রস্তুতি। সমুদ্রোপকূলবর্তী, নতুন গড়া চরের কী অপরূপ আলেখ্যে মেশানো সে চরিত্র! লেখকের অমনিসেন্ট দৃষ্টিকোণে, ওই সিক্ত-মৌসুমী প্রকৃতির ধরণে নারীর রক্ত-মাংস-সংস্কার পুনর্গঠিত। তাতে পুরুষের প্রতি আস্থা, ওতেই জীবনের পরমার্থ খোঁজা কিংবা দূর-অতীতে লোকায়ত ধর্মের নারীশক্তি-কল্পনা, পুরুষের পরমার্থ নিহিতার্থ– তার বাইরে ওই সমুদ্র বাসরে সমুদয় কিছু ঘটার সুযোগ নেই। সে লক্ষ্যেই গড়া শৈলি-কাঠামো।

www.chinmoyfoundation.org

এটি শুধু বেসরকারি এলাকা নয়, মন-মানস ও এতদ্‌শ্লিষ্ট বাঁচা, সেজন্য সৃষ্টিশীল সংগ্রামও চলে। তারপর এক টুকরো ভূমি মিটলে ওতে বুনে দেওয়া হয় ফসল। সে ফসল দেখে দেখে স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। সে চলমানতার ভেতরেই তো সুর ও ছন্দ গাথা। আঞ্চলিক নয়, নয় 'হোয়াল' (Whale) উপন্যাস। কিন্তু এই বঙ্গের অংশ হয়েও যা ওতে ঘটে তা সবটুকু নতুন না হলেও পুরাতন বলা যায় না। *সমুদ্র বাসরের* বৃত্তান্ত কোড করি :

> মানুষ সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আত্মরক্ষার লড়াই করিতে শিখিয়াছে। ক্রমে ক্রমে তাহার সহায়তা আসিয়াছে সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছে অন্য মানুষ। সুজাত আলীদের ভুবনের সেই বল ছিল না। না ছিল তাহার জন্য কোন ক্ষোভ-আক্ষেপ। একটা যুদ্ধ জয়ের বীরত্ব লইয়া সুজাত আলীরা একদিকে বাঁধ দেওয়া এবং অন্যদিকে ক্ষেত-মাঠ হইতে জল সেঁচিবার কাজে লাগিয়া গেল। কিন্তু বাঁধের খুঁটি বারংবারই উপড়াইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল স্রোতের টানে, ক্ষেতে আবারও জল উঠিতে লাগিল নিচ হইতে গলগল করিয়া। সন্ধ্যায় যে কাজ সমাপ্ত করে, সকালে উঠিয়ে দেখে তা বিধ্বস্ত। একদিকে এক নালার মুখ বন্ধ করে, তো আর একদিকে জাগিয়া ওঠে অন্য মুখ। মনে হইতে লাগিল যেন একই জল স্থল অন্তরীক্ষ হইতে সংখ্যাহীন নানা শত্রু তাহাদের সঙ্গে সংগ্রামে নামিয়াছে।
> [সমুদ্র বাসর, মুক্তধারা : ১৯৮৬, পৃ. ৩২৫-৩২৬]

বস্তুত, এই সমুদ্র বাসরের কাহিনি সংক্ষেপ (gist)। এতে নতুন কিছু নেই! সুজাত আলীর নেতৃত্ব ও যুদ্ধ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, সেটি লেখকের বহিঃঅংশ, কিন্তু সুজাত তো ব্যক্তি– ব্যক্তি হিসেবে সমাজে তার চলতি শক্তি ও প্রতিরোধের-মনস্তত্ত্ব শিল্প উপন্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি, বলা যায়। তাই-ই জীবনের সম্ভাব্য শক্তি। সে লক্ষ্যেই প্রকরণের নির্মিতি। এই সভ্যতার সেন্স (বোধ), এরূপেই পরাজয়-পরাস্ততার বদলে ধরাশায়ী করে বিজয়ীর তিলক নির্ধারণ প্রয়াস। বিজয়ী মানুষ। এখানে সে মানুষ হিসেবে প্রতীকী 'সুজাত'। সে একালের। তার আগে ছিল তার বাপ ইউসুফ সুজা। সে পেশায় লাঠিয়াল। এখন তার সন্তান সুজাত পেশা বদলিয়েছে (যদিও কাহিনিতে সে অনেকবার বাপের সৌর্য দ্বারা প্রভাবিত)। কৃষক। সে বদলে কর্ম-অনভ্যস্ততার ছাপ আছে। সেজন্য ক্ষতি-লোকসান আছে। সেটিও প্রতিকূলতা। বড় বাধা প্রকৃতি, নিয়তিও (উপন্যাসে প্লটের কাঠামোতে নিয়তি অন্তর্ভুক্ত)। আর বিপরীতে আছে ব্যক্তি মুজফফর ও তার স্যাঙ্গাতের দল। যদিও শেষাবধি তা মুখ্য নয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যোদ্ধারই প্রতিরোধ অনদ্যান্ত। সে লক্ষ্যেই বিশুদ্ধ বিস্তৃতি। মিলও মেলে তাঁর শেষ লেখায়– *কাঞ্চনগ্রামে* (১৯৯৮)। অধ্যাত্ম-চিন্তনের জালাল মাস্টার, এখানেও সেই অধ্যাত্ম শক্তির আস্থা বা মত্ততায় লেখকের বয়ান প্রতিদীপিত– প্রচ্ছন্নভাবে। তাইতো নারীর মান্যতা সমাজে-

www.amarboi.org

সমাজের শক্তি হিসেবে পুরুষের– লেখকের মতে– ওকি প্রকৃতিই বেঁধে দেয় না– বিধাতার কৃপা– যার মধ্যে শক্তি ও সত্য নিহিত! সে লক্ষ্যেই আস্থাশীল, আনুগত্যপ্রবণ বিবরণ-ভাষা। এইটিই বুঝি লেখকসত্তার 'intrinsic merit'। এতে কী গড়ে ওঠে? ইউসুফ সুজার সমাজ-সংসার, পরের প্রজন্মের প্রোটোগ্যানিস্ট সুজাত আলীকে ঘিরে পরিবার ও তৎসংশ্লিষ্ট জীবনের বাতায়ন, সংস্কার-সংস্কৃতি, বাঁচা-স্বপ্ন-সংগ্রাম– এই কী উপন্যাসের তুল্যমূল্য? তা নয়। এর কারণ ওতে আছে 'ক্ল্যাসিকাল হেরিটেজ'– যা গড়ে দিয়েছে উপন্যাসের প্লট। কী সে ক্ল্যাসিক অবভাস! প্রাচীন বাংলার সমতট অঞ্চলের পরিবেশ ও পরিচয় আর বংশপরম্পরার সংস্কার। সেটি জীবনের অংশ। সংগ্রামও– জীবনের জন্যই এগিয়ে চলার। সভ্যতার গোড়ার স্বরূপ ধরে এই সমুদ্র-চরের জঙ্গমতা আর পরিবর্তিত জীবনের অংশ শহর– তার যোগাযোগ নিম্নোক্ত উদাহরণে বিবেচনায় আনা যায় :

ক)

প্রভুদের আদেশ-নির্দেশে আবহমান কাল ধরিয়া দেশের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইলেও দক্ষিণের খণ্ড খণ্ড অঞ্চলগুলির অভ্যন্তরের জীবন যাত্রা সেই সব অবস্থা-ব্যবস্থার সাথে খুব একটা সম্পৃক্ত ছিল না। বৎসরান্তে রাজ-রাজার খাজনা, পুণাহ অথবা বর্ষ-সংক্রান্তির সময় ছাড়া তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ একরকম ছিল না বলিলেই চলে। স্থানীয় হাটবাজারে প্রভুর তস্য জমিদার প্রতিভূ নায়েব, তস্য কর্মচারী তালুকদার-তহশীলদার তস্য বশংবদ হাওলাদার-দফাদার-চৌকিদারদের মাধ্যমে যে ব্যবস্থাটা চালু ছিল, তাহার মধ্যে রাজা-প্রজার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ক্ষীণ, কিন্তু পঞ্চায়েতের মধ্যস্থতাতেই সব বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি হইত।...

খ)

এই যে সাগরমেলা, ঐ খানেই প্রধান উচ্ছবটাই তো এই বিষয় লইয়া। সেইখানের জলে চান করলে বাঁজা মাইয়া মানুষেরও গর্ভ হয়, যে পুরুষের ক্ষ্যমতা নাই সে-ও হয় বীর্যবান, সরিয়া যায় রোগ-ব্যাধি, আরো আরো কতো কী। সেইখানে যে মেলা বসে আর নানান রকম আনন্দ উচ্ছবের বন্যা বইয়া যায় তার না কী আর হিসাব নাই কতো দূর দূর মুলুক হইতে নানান জাতের মানুষ আসে। অবস্থা না কী এমন ঘটে যে নৌকাপাড়া লাগেনেরও আর ঠাঁই খুঁজিয়া পাওন যায় না।...

গ)

পল্লীপতি ইউসুফ সুজা তাহার যোদ্ধার পেশা পরিত্যাগ করিতে চায় নাই। অনেকেই শহরে-বন্দরে উঠিয়া গিয়া পাইক- বরকন্দাজের কাজ বাছিয়া লইয়াছে, কেউবা ডাকাতিতে মন দিয়াছে ডাত্রীবহুল এলাকায়, কয়েকজন ধরা

www.chinnofoundation.org

> পড়িয়া কোন সুদূরের জেলের ঘানি টানিতেছে, কিন্তু ইউসুফ সুজাকে অন্য পেশা বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট করে নাই।... সব সময়ই ঠা-ঠা করিয়া হাসার স্বভাব ইউসুফ সুজার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হইলেও দীর্ঘ শরীরে এখনও অটুট স্বাস্থ্য। কালো শরীর পাথরে মতো শক্ত। মাথার ঘন বাবরিচুল ফ্যান দেওয়া লাল গামছায় চূড় তুলিয়া বাঁধা। মুখভরা দাঁড়িগোঁফের মধ্যে চোখ দুইটা সমুদ্রের মতো নীল। ...

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির আলোকে 'prototypes of virtuality all later narrative forms and with paradigms of the processes with grovern their interaction and evolution' এভাবেই হেরিটাল প্লট-নির্মাণের অনুষঙ্গ প্রস্তুত হয়। যেখানে সামগ্রিক জীবনের বিসংবাদের ইঙ্গিত পরিবাহিত হতে থাকে, অন্তর্জীবনের দর্শন আমলে নিয়ে। *সমুদ্র বাসর* উপন্যাসে 'prototype' (আদিরূপ) এর স্বরূপটি কী? 'prototypes can contribute to prejudice based on race, ethnicity, or social status' প্রোটোগ্যানিস্ট সুজাত আলীর মনোজগতে আঞ্চলিক সংস্কারকে ভিত্তি করে যে সামাজিক শ্রেণির পরিচয় মেলে– তা সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে উন্নত আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে– সেখানে তার লাঠিয়াল পিতার কর্মক্ষেত্র, সাগরমেলা কিংবা পরিবর্তিত বাস্তবতার ভেতর দিয়ে গ্রহণীয় সত্তা-উপাদান বস্তুত উপযোগিতার লভ্য বস্তু– যেখানে তার অধিকার কাম্য হয়ে ওঠে– আর সে কারণেই এই প্রতিরোধ যুদ্ধ। সেখানে অনুপ্রেরণা পূর্ববর্তী বংশধর। প্রতিটি কর্মপ্রেরণার মূলে আছে মর্যাদা ও কাঙ্ক্ষিত অধিকারের আয়ত্ত প্রচেষ্টা। সে লক্ষ্যে মুজফফর কিংবা বিরূপ প্রকৃতি তার প্রতিপক্ষ। এটি উপন্যাসের সভ্যতার ইঙ্গিত। কিন্তু সেটি শুধু নির্মিত্ত করেননি লেখক। তাকে ঘিরে গড়ে ওঠে সংস্কৃতি, সংস্কার, মূল্যবোধের কাঠামো। এমনকি রোমান্স, বিশ্রম্ভালাপ, প্রেমপ্রসঙ্গও। নারীর জৈবসত্তার কৃষ্টি-শ্রেণিটিও। তাই জরিনা এক চমৎকার প্রতিষ্ঠায় হাজির, কাহিনির অগ্রধারায় তা অবলুপ্ত। সোনা কিংবা করিমন স্বভাবমতো। কিন্তু তাদের ঘিরেই কার্নিভাল-কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। সে বিষয়টি পরে আলোচনায় আনা যাবে।

প্রোটোটাইপ-বীক্ষণে উপন্যাসটির উচ্চতা কেমন? স্বরূপ বা আধুনিক উপলভ্য রূপটি কী? উপর্যুক্ত উদাহরণে কিছু প্রয়াস আছে। বিশ্লেষণে গেলে মেলে, ক) লেজেন্ড যেখানে 'reconcile powerful empirical and fictional impulses', খ) সামাজিক মর্যাদার জন্য চরিত্রের মূল-কাঠামোর পূর্বাপর দ্বান্দ্বিক পরিবর্তন ঘটে– যেখানে প্রতিনিধিত্বশীল সুজাত এবং তার অনুগত দল পরিবর্তিত পেশায় সক্রিয়। এ লক্ষ্যটি উপন্যাসোচিত মর্জি অর্জন করে এবং সেটি প্লটে সমন্বিত হয় রোমান্স, স্যাটায়ার, প্রবাদ, লোকসংস্কার, আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের প্রান্ত ধরে। সেটি

www.chhimofoundation.org

কেমন? বলা যায়, 'slice of life', আরও এসব উপাদান বিস্তৃত প্রত্যয়ে আনলে ফিকশনাল উপলব্ধিতে দাঁড়ায় :

> The novel gives a familiar relation of such things, as pass everyday before our eyes, such as mayhappen to our friend, or to ourselves; and the perfection of it, is to represent every scene, in so easy and natural a manner, and to make them appear so probable, as to deceive us into a persuasion (at least while we are reading) that all is real, until we are affected by the joys or distress of the persons in the story, as if they were our own.

এ লক্ষ্যে উপর্যুক্ত পাঠ-উদ্ধৃতিগুলো [ক, খ, গ] আমলে নিলে ঔপন্যাসিকের ঔচিত্য অনুধাবন করা অসম্ভব নয়। বোধ করি, শামসুদদীন আবুল কালামের শিল্প-সৌকর্যের পরিমাপটিও সে লক্ষ্যেই চিহ্নিত। গ) যে আঞ্চলিক নৃ-সংস্কার আখ্যানে উজ্জীবিত তাতে 'স্ট্রাইভিংনেস' আহার-অধিকার শ্রমঘন দিনের সংকল্পে পুনর্বাসিত। তাই বিপরীত দ্বন্দ্বও আছে। সুজাত বনাম মুজফফর, প্রান্ত বনাম কেন্দ্র করে প্রজেক্ট বিস্তৃতি পরিলক্ষিত। এতই সম্মিলিত ঐক্য গড়ে ওঠে প্রান্ত-পক্ষে– যেখানে 'কার্নিভাল'-স্বরূপ সরল ও স্বতঃস্ফূর্তরূপে নির্মাণ পায়। 'the result justify our temerity'– এইটিই ফিকশনের অবজেক্টনেস। ঘ) প্রান্ত-জনতার ঐক্যে বেসরকারি মুক্তাঞ্চলটি এরূপ নৃ-কাঠামো থেকে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এবং ঐতিহ্য-নির্ধারিত কাঙ্ক্ষিত বিজয় লাভে সামর্থ্য হয়।

৩.

সমুদ্র বাসর উপন্যাসে প্রথমেই দৃশ্যমান সমতট-অঞ্চলের চিত্ররূপ। প্রান্তচরিত্র সখানাথ, রতন, রতিকান্ত, দেবনাথ, শ্রীহরির কর্মানুষঙ্গ। এদের মন, মনের দ্বন্দ্ব সংগ্রাম ও সংস্কারে প্রবল। স্বপ্ন জোয়ার-ভাটার ন্যায়। কিন্তু সংগ্রাম বা 'স্ট্রাইভিংনেস' প্রাথমিকভাবে প্রকৃতিকে ঘিরে। ঠিক, প্রচলিত ফর্মের কাহিনি সম্মুখে উজিয়ে চলে। পরিচয় মেলে মুজফফর মিঞার। সে পরিচয়ে শক্তি-ক্ষমতা আর সামন্ত প্রবণতার সুলুক-সন্ধান আছে। ফলে জরিনার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিরোধ দানা বাঁধে। কিন্তু পূর্বাপর পরিচিতিতে ইউসুফ সুজার সৃজন-কাঠামো থেকে সুজাত আলীর ক্রমবর্ধমান স্বরূপ ক্রমশ স্বয়ম্প্রকাশ, নির্ধারিতও। সমুদ্র-চর ভূমির ঐতিহ্যে লালিত এ জনগোষ্ঠী। মুজফফর মিঞা, চর ও বন্দর, শহর ও গ্রাম, সমুদ্র ও স্থল যোগাযোগ রক্ষায় সম্পত্তির মালিকানা ও বশংবদ ধারণার চর্চা করে। সে লক্ষ্যেও তার পাইক-পেয়াদা অনুসারি প্রথানুগ লক্ষণীয়। স্থানাঞ্চল পরিচয়, ক্ষীরসায়র। অতঃপর এই অঞ্চলকে ঘিরেই আরও কিছু কর্মশীল চরিত্রের সংযুক্ত

www.chinnofoundation.org

ঘটে। মন্তাজ, সোনা, করিম। সময়ক্রমে এরাও চরিত্রানুগ সক্রিয়, নানা ধারা ও ধারণায় প্রবাহিত। জীবনের সঙ্গে জন্ম-মৃত্যু, আবেগ-অনুরাগ, জয়-পরাজয়, ত্রস্ত-নিরস্ত সামগ্রিকতায় সংগ্রোথিত। তার ভেতরেই প্রাণচাঞ্চল্য ও উৎসব। সে লক্ষ্যে অভিপ্রেত কাঠামো প্রতিশ্রুতি অর্জন করে। পরিচয় মেলে। মৃত্যুও ঘটে। সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ তড়িৎপ্রবাহিত হয়। প্রতিরোধ যুদ্ধের স্বরূপ নির্ণীত হয়। এর পরিপ্রেক্ষেতটি এমন : 'oral epic tradition a synthesis, but it is not a conscious one, nor does it bigin in a pure state and then refine itself into another pure state. only the synthesis, not any one of the pure states... '– 'পিওর স্টেটে'র ধরণাটি কাহিনির অভ্রান্ত লক্ষ্য, লেখকের প্রচ্ছন্ন দর্শন-ধারণা, *সমুদ্র বাসরে*ও পরিণতির ইঙ্গিতে তা-ই নির্ধারিত : 'একে একে অনেকগুলি বছর সুখে দুঃখে কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে চরের জীবনে। সকলের বয়সের সঙ্গে চরেরও বয়স বাড়িতেছিল।' সামগ্রিকরূপে পরিবর্তন। সকলের ঐক্যের ভেতর দিয়েই পরিবর্তন। 'এই দুনিয়ার কোনো ঠাঁইই বসিয়া বসিয়া লেঙ্গুর নাড়িয়া হাওয়া খাওনের শ্বশুরবাড়ি না। সর্বক্ষণ দিনে রাইতে লড়াই, তাতে কক্ষণো ক্ষামা দেওন চলে না।' 'অরাল ট্রেডিশন' চান্দুর, মুনীষ, তালেব, কাদেরের সংশ্লেষে। সম্মিলিত প্রশ্নও উত্তাপময় : 'ক্ষেতে ক্ষেতে পানি জমছে, তা সেঁচিয়া ফেলাইতে হইবে না? ঐ যে পাড় ভাঙ্গতে আছে, সেইখানে বাঁধ দিতে হইবে না? ... যেই মাটি ফসল দেয় তার যত্ন লইতে হইবে না?' তার ভেতর দিয়েই প্রোটোগ্যান সুজাত আলীর পরিবর্তন। 'কার্নিভাল তত্ত্ব'টি সে লক্ষ্যেই আয়োজনের স্বরূপকে সম্মিলিত করে চিহ্নিত করে। তার ভেতরেই লেখকের উপন্যাস-চিন্তার দর্শন সম্বিৎ ফিরে পায়। শামসুদ্দীন আবুল কালাম নিছক উপন্যাস লেখেন না। অরাল ট্র্যাডিশনের ঐক্যকে চিহ্নিত করেন। তার ভেতর দিয়ে 'পিওর স্টেট' স্বপ্নের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু প্রবৃত্তি তো কোনোকিছুর ঊর্ধ্বে নয়। সে অবলম্বনেই আখ্যানের অগ্রগমন। তাই সভ্যতার আত্মরক্ষার রূপটি উপন্যাসে সম্ভাব্য পরিকাঠামো লাভ করে। তবে শিল্পগড়নে লেখক পূর্ণ উচ্চতা পান না, সেটি তার নিজস্ব সংস্কার– বিশেষ করে বঙ্গীয় ইতিহাসে– বিভাগোত্তর বাঙালি 'মুসলিম' চিন্তানুষঙ্গের স্রোতধারায়। কিন্তু অনিবার্য শক্তিটি দুর্নীরিক্ষ নয়।

'The popular tradition of carnival was believed by bakhtin to carry a particular wisdom which can be traced back to the ancient world. For bakhtin, carnival and carnivalesque create an alternative social space, characterised by freedom, equality and abundance. During carnival, rank (otherwise pervasive in medieval society) is abolished and everyone is equal. People were reborn into truly human relations, which were not simply imagined but experienced... Carnival is a kind

www.chintofoundation.org

of syncretic, ritualised pageantry which always a particular perspective... On an effective level, it creates a particular intense feeling of immanence and unity...'

সমুদ্র বাসরের কাহিনি বাখতিন-কথিত কার্নিভাল তত্ত্বের উপর্যুক্ত ধারণাটির অতস দৃষ্টিতে আনলে কী দাঁড়ায়? 'সমতা', 'ঐতিহ্য', বা 'আদিম সমাজব্যবস্থার ধারণা'র বিবরণটি কেন প্রয়োজন? এর মাধ্যমে কী পুনর্জন্ম ঘটতে পারে? বলতে হয় 'উৎসব-ধারণা'র কথা। যেটি প্রথা ভঙ্গ করে সত্যিকার অভিজ্ঞতাপূর্ণ প্রাচুর্যময় ও আড়ম্বরপূর্ণ সমারোহ– যেখানে সামাজিক সম্পর্ক একটি সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির জন্ম দেয়– ঐক্যই যার মূলমন্ত্র :

> একটা যুদ্ধজয়ের বীরত্ব লইয়া সুজাত আলীরা একদিকে বাঁধ দেওয়া অন্যদিকে ক্ষেত-মাঠ হইতে জল সেঁচিবার কাজে লাগিয়া গেল। কিন্তু বাঁধের খুঁটি বারংবার উপড়াইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল স্রোতের টানে, ক্ষেতে আবারও জল উঠিতে লাগিল নিচ হইতে গলগল করিয়া। সন্ধ্যায় যে কাজ সমাপ্ত করে, সকালে উঠিয়া দেখে বিধ্বস্ত। একদিকে এক নালার মুখ বন্ধ করে, তো আর একদিকে জাগাইয়া ওঠে অন্য মুখ। মনে হইতে লাগিল যেন একই জল স্থল অন্তরীক্ষ হইতে সংখ্যাহীন নানা শত্রু তাহাদের সঙ্গে সংগ্রামে নামিয়াছে। ... যে-শক্তি এ জমিন বানাইছে, সেই আবার ইচ্ছামতন ভাঙ্গতে ছানতে শুরু করছে। তারে তুষ্ট করার ক্রিয়া-কর্ম ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় তো দেখতে আছি না। ... ঐ সাগর-মেলার কাছাকাছি পীরের একটা দরগা আছে। এমন সব বিপদ-আপদের কালে মানুষ সেইখানে যায়, নানারকম মানত দেয়।... এমন নিরাশ হইয়া পড়িও না। জীবন দেছেন যিনি, উপায় দেবেন তিনি।... সেই সন্ধ্যায় একটা পুঁথি পড়ার আসর বসাইল সুজাত আলী চান্দুর মাচানে। নিজেও একেবারে বসিয়া বলিল : বয়াতি, সেইখানটা একবার ভালো করিয়া পড়ো, সেই যেখানে আসমান ফিরে আজদহা অজগর পাকে পাকে বাঁশঝাড়ের সঙ্গে জড়াইয়াছে। বড় ত্বরাত্বরি পড়ো তুমি...

এরূপে এই বঙ্গদেশের চিরন্তন ফল্গুধারায় সংগ্রাম ও স্বপ্নের আখ্যান রচিত হয়। এ প্রবণতায় tolerance, patience, understanding, effective and empathetic listening'র প্রকাশরূপ নির্ধারিত ভাষায় প্রবর্তিত হয়। এ প্রবর্তনায় কার্যত 'Death of the Auther' 'লেখকের মৃত্যু' ঘটলেও পাঠকের যোগাযোগ সুরক্ষিত হয়। তাই শিল্পিত সার্থকরূপ রচনা করে। এ লক্ষ্যে তাঁর ভাষা অঞ্চল-অনুবর্তী হলেও সার্বিক সত্যকে পুনরুত্থিত করে। পুনরুজ্জীবিত করে জীবনের সামগ্রিক সম্ভাবনার সারসত্য। *সমুদ্র বাসর* উত্তর-উপনিবেশ ধারণাটিও স্বীকার করে নেয়। যেখানে একটি অঞ্চলের স্যবলটার্ন শক্তি (সুজাত আলীর নেতৃত্বে) স্বীয় সংস্কৃতি আত্মসাৎ করে পূর্ণরূপে জয়ী হতে চায়। সে লক্ষ্যে সংগ্রামের প্রস্তুতি ও বিকাশ চলে। শহুরে

www.chirirfoundation.org

সংস্কৃতি আখ্যানের মূল কেন্দ্র পায় না। বিপরীত শক্তি অর্জনের সামর্থ (মুজফফর) হলেও তা কেন্দ্রীয়রূপে অধিষ্ঠিত হয় না। 'problems and consequences of the decolonization of a country, especially questions relating to the political and cultural independence of formerly subjugated people, and themes such as racialism and colonialism.' সেটি প্রতীকী তাৎপর্য সরক্ষিত হয় এ উপন্যাসে। সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ ক্ষীণ পর্যাবৃত্ত খুঁজে নেয় করিমন, জরিনা, সোনা চরিত্রের মাধ্যমে– সেখানে কেন্দ্র সুজাত আলী। ইদ্, ইগো, সুপার ইগোর ঈষৎ অভিপ্রকাশ (unconscious mind governs behavior) সোনা-সুজাত, করিমন-সুজাত, করিমন-সোনার মধ্যে। তবে শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিবেচনাবোধের প্রকরণে যে চরিত্র সৃজন করেন তাতে ফ্রয়েডের 'ড্রীম', ইদ্, ইগো, সুপার ইগোর দ্বন্দ্বমূলক কিছু ঘটে না। সেভাবে প্রকরণে চরিত্রায়ণও এখানে হয়নি। 'The Interaction of ID, Ego, Super-Ego'র ধর্মও সুরক্ষিত নয়। তবে চরিত্রের স্বরূপ অনুধাবনে মনঃসমীক্ষার পাঠ হয়তো আমলে নিলে জ্ঞানচর্চার আজ্ঞা তৈরি হয় বৈকি!

৪.

শামসুদ্দীন আবুল কালামের *সমুদ্র বাসর* (১৯৮৬) লেখকসত্তার পরিমিত-পরিপক্ব পুনর্বিন্যাস, তার রচিত পূর্বের অন্যসব রচনার চেয়ে। লেখকের এ ধারার শেষ রচনা *কাঞ্চনগ্রাম* (১৯৯৭)। *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসের গোড়াপত্তন যখন– তখন ১৯৫২, একটি আড়ষ্ট ও 'অপরিচিত সকাল'– বিভাগ-পরবর্তী সময়; সেটি পেরুনো সম্ভব হয়– অতিক্রমী-দর্শনের আওতায়– সেখানে চিহ্নিত এ পর্যায়ের *সমুদ্র বাসর*। অবিকল জনস্রোতের সংগ্রাম, প্রতিরোধ যুদ্ধ, জীবনের সমগ্রতায় জন-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিত সুবিন্যস্ত, শিল্পিত চিত্রণ বক্ষ্যমান উপন্যাস। বর্তমান আলোচনায় সে আখ্যানকে দেখা যায় আধুনিক ক্রিটিসিজমের আওতায়। চিনে নেওয়া চলে, আইএ রিচার্ডস, এমে সেজেয়ার, মিখাইল বাখতিন, গ্রামসি কিংবা এডওয়ার্ড সাইদ-এর চিন্তাকাঠামোর ফ্রেমে। এ চিন্তাকাঠামো সচল ও সক্রিয় জ্ঞানচর্চার আবর্ত তৈরি করে। কিছু ফ্রয়েড-বীক্ষণও তৈরির সুযোগ আছে এখানে। সর্বোপরি, কোনো কিছুরই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়, এখানে আলোচনার দৃকপাত উন্মোচন করার চেষ্টা মাত্র। বাকীটা বারান্তরে।

www.chinnofoundation.org

কর্কশ নিয়মে বন্দী চিলেকোঠা

চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাসটি উত্তর-উপনিবেশবাদী চিন্তায় আলোচনায় আনলে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন : প্রান্তিক শ্রেণি-সংস্কৃতি, কৌমসমাজ ও পরিবার, লুম্পেন শ্রমিক, প্রতিরোধী ইতিহাস-রাজনীতি, পুরুষ-কর্তৃত্ব ও নারী, ক্ষমতার বিপরীতে বয়ান প্রভৃতি। এ মতে উপন্যাসের কাহিনির অংশে দৃকপাত করে চললে দুটো অংশে ভাগ করে ফেলি এক : যার কেন্দ্রে ওসমান দুই. আনোয়ার। একটির অকুস্থল ঢাকা অন্যটি গ্রাম-মফস্বল। ১-১৩ অধ্যায় পর্যন্ত ৬৯র ঢাকার চিত্র। পরে দুটো কাহিনি সমান্তরালে বহমান, এবং রীতিমাফিক একবিন্দুতে মিলে পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এক্সপজিশানে ৬৯র মিছিলে ফোরম্যান আবু তালেবের মৃত্যু। মৃত্যুটি মহান হতে চায় 'শহীদ আবু তালেব' আখ্যায়। লাশের পক্ষ-বিপক্ষও আছে। রাষ্ট্র ঘটায় এ হত্যাকাণ্ড। রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব দ্রুত দাফনের ব্যবস্থা নিলে গণ-মানুষ– যার নেতৃত্বে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণি– তারা নানা মতভেদে আটকে যায়। রাষ্ট্রের ভূমিকাটি রহমতুল্লা বা সংশ্লিষ্ট 'নিরাপত্তা বাহিনি'র আচরণে প্রকাশ্য হয়। এর সাথে নিরিহ মানুষও যুক্ত হয়। যেহেতু মৃত ব্যক্তিটি নিরিহ ছিল। তার ভাই-বাবা-মা-বোন বা বাড়ির অন্যান্য লোকজন। এটিই মূল আখ্যান। একাংশের। অন্যটি প্রত্যন্ত গ্রামে যেটি শহর ছেড়ে দূরে। সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের শোষণ-প্রকৃতি অন্য, শ্রেণি-বিভাজন নানাস্তরে, সামন্ত-মনস্ক শ্রেণিটি আছে পাশাপাশি শ্রেণিহীন নির্মম শোষিত সম্প্রদায় আছে। চিরন্তন গ্রামীণ সমাজের চিত্র অঙ্কনে শ্রেণি ও শ্রেণিহীন মানুষের দুর্বহ পার্থক্যরেখাকে লেখক একপ্রকার দায় নিয়ে চিত্রিত করেছেন। স্কেচধর্মী কিন্তু অন্তর্ভেদী। কার্যত ৬৯ গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার যে ঐতিহাসিক সত্য সেটি এর মুখ্য প্রতিপাদ্য। তা-ই এ অংশের কাহিনি-কেন্দ্র। কিন্তু সমান্তরাল কাহিনির এ উপন্যাসে একটি চমৎকার শিল্পবোনা চরিত্র সৃষ্টি হয় যার নাম–ওসমান। সে-ই 'চিলেকোঠার সেপাই'। একে ঘিরেই শিল্পবর্ণটি স্মরিত ও চিহ্নিত। আর এখানে গোড়াতেই যে চিন্তা-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছি তা আরোপ নয় বরঞ্চ পাঠের ভেতরে খতিয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু ওসমান মুখ্য।

২. উপন্যাস ও ওসমান

বলে নিই, বক্ষ্যমান উপন্যাস ও নির্মিত ওসমান সমার্থক। এটিই হয়ে উঠেছে শিল্প। বাইরেরটি এর পরিপূরক। ৬৯-ও এ চরিত্রটির দায়ে নির্মিত! যে ঘটনা তা উদ্দিষ্ট এ-চরিত্রটির জন্য। কীভাবে? শুরুতেই সংলাপ ও ব্যাপক ঘনতলের চিত্র। স্বপ্নঘোরের বিবরণ। অবচেতন মনের ভেতর দিয়ে চেতন জগতে প্রবেশ। কিন্তু

www.chirnofoundation.org

তাতেই তার জীবন-সংস্কৃতির ক্ষেত্র চিহ্নিত। চিনে চলা যায় তার অতীত-বর্তমান ও পরিবেষ্টিত প্রজন্ম-কুশল। কহিনির স্তর অতঃপর প্রসারিত হয়, আরও গভীর-তল স্পর্শ করে, কড়া ও ক্ষুব্ধ মুহূর্ত বর্ণময় হয়– শিশ্নমৈথুনে স্খলিত বীর্যের ভেতর দিয়ে অনুভবের স্বস্তি-প্রদায়ক সহানুভূতির প্রার্থনা। এজন্য কর্পোরাল ফিগার 'মিস ইউনিভার্স' তাৎক্ষণিক এবং প্রয়োজনমাফিক কামভোগ্য। এটি একপ্রকার 'অফ'-লাইফ-এর অংশ, যেটি তার ক্ষেত্রে তুমুলরকম গোপন এবং অতীব অনিবার্য। কিন্তু এ অনিবার্যতার উপরতলে স্বপ্নে দেখা বাবার মৃত্যু বা না-মৃত্যু, সত্য বা না-সত্য কিংবা স্বপ্নই সত্য– তা হতেও পারে নাও পারে– দ্বিধান্বিত দরকষাকষিতে একপ্রকার সংস্কারের ভেতরে সে লুপ্ত হয়। স্বপ্নের দৃশ্যপটে অবচেতনে যা ধরা পড়েছে চেতন জগতে তার প্রভাব ছড়ালে কিংবা এরূপ দ্বিধান্বিত স্বর চিহ্নিত হলে এ ফ্ল্যাটের আবু তালেবের মৃত্যুর খবর তাকে প্রকট করে তোলে। তখন মৃত্যুটি সদ্যোজাত দিবালোকস্পর্শী রূপ লাভ করে। তাতে বাপের মৃত্যু না-কি এ ফ্ল্যাটের কারো মৃত্যু সত্যিই বুঝি কারো মৃত্যু হয়েছে– মৃত্যুটি তাকে তাড়া করে, ঘুম থেকেই তার ভেতরে বসতি নেয়, সবকিছু উপচিয়ে ওসমান যে ভার বোধ করে তাতে 'আরাম' হিসেবে এই কর্পোরাল ছবিটি তার জন্য দরকার হয়ে পড়ে, সে কাজটি সম্পন্ন হলেও বাইরের ডাক তাকে ভয়ে ফেলে দেয়, সে দায়ী হলো না-কি পুলিশ এসেছে, তাকে ধরবে না-কি? এরূপ পরিস্থিতি দিয়ে 'শেখ মোহাম্মদ ওসমান গনি রঞ্জু'-এর বহিঃপ্রকাশ। কার্যত এই উপন্যাসের নির্মিত স্বর। আখ্যানটি আমলে নিলে শিল্পের নিয়মটি পাঠকের হাতে এসে পড়ে। রসবন্দী হয়। আস্বাদনযোগ্য মাত্রায় পৌঁছায়। পরিতৃপ্ত-সঞ্চার হয়। তার দৃশ্যটি এবং তার অবস্থান আলোকপ্রাপ্ত হতে থাকে : ছাদের ঠিক নিচেই গুলিবিদ্ধ ১টি যুবক দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা। যুবক অল্পবয়েসী, শরীরের চামড়া কাঁচা ও টাটকা। ৩০৩ রাইফেলের একটি গুলি গেঁথে রেখেছে দেওয়ালের সঙ্গে। মাথাটা বাঁ দিকে ঝুলছে। বুকের নীচে তার দীর্ঘ শরীর রেলিঙে মেলে দেওয়া শাড়ির মতো আস্তে আস্তে কাঁপে। শীতেও কাঁপতে পারে, বাতাসেও কাঁপতে পারে।...'– এরূপ বিস্তৃত বিবরণে 'ওসমান গনি রঞ্জু' তার অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে প্রণীত আভাস 'পেখম' মেলে। [পেখম অর্থটি শিল্পিত রীতির অনুসরণ থেকে বলা] ইল্যুসনটি শুধু এক মৃতদেহ-রূপ বা প্রতিবেশ সৃষ্টির জন্য নয়, উন্মূল 'প্রাণী'র অস্তিত্বজ্ঞাপক রীতি। উপনিবেশ-উত্তর সময়খণ্ডে ফোরম্যান 'শেখ মোহাম্মদ ওসমান গনি রঞ্জু' তার বেড়ে ওঠার আর্থ-সংস্কৃতি এর সঙ্গে বিযুক্ত নয়। [পুরো নামটি ঊর্ধ্বকমায় রাখার কারণ এটি পূর্ণ উপন্যাসের কাহিনির প্রতিরূপকে চিহ্নিত জ্ঞান করে] চরিত্রটি পরিজন ছাড়া থাকে, তার বন্ধু-পরিমণ্ডল তার চেয়ে উচ্চ শ্রেণিস্তরবাহী, সেখানে ফোরম্যান হিসেবে তার অবস্থান এবং চলমান জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে সে

www.chimefoundation.org

'অস্থির', গ্যাস-ট্যাবলেট খেয়ে চলে সে, পেছনের পুরাবৃত্ত ছাড়াও যে উন্মূল একাকীত্ব নিয়ে সে চাকরির ঘানি টানছে– সেটি নিছক জীবনের ঘানি টানা ছাড়া আর কী! এ ব্যক্তি উপনিবেশ-উত্তর সময়ে আরেকটি রাষ্ট্রযন্ত্রের ভেতরে পিষ্ট ও ক্লান্ত। হারিয়ে ফেলেছে নিজের সবরকম ইচ্ছা-বাসনাসমূহ। মানুষ হিসেবে সে 'অপরাধী', অনাস্থা-সূচক ক্রিয়াকর্মে হীনন্মন্যতা যেমন আছে তেমনি সে হয়ে পড়েছে অন্তর্মুখি, মুখচোরা, অ-সাহসী, অ-উদ্ধত, অবনত। ভয় ও ভয়ংকর ভীতু। সে ভীতুর ফটোগ্রাফি অতুল্য হয়ে ওঠে রচনায়, রীতিতে– এবং শিল্পের নিয়মে গড়ে ওঠে উদ্ধত ও উদ্বাহু অনিঃশেষ আনন্দদায়ী বিরচনকলা। যা ছড়ায় এ বাস্তবতায় নিপাট, কঠিন ও তুমুল প্রতিপাদ্যে। তাতে 'শেখ মোহাম্মদ ওসমান গনি ওরফে রঞ্জু' তৈরি হয় আকর্ষণীয়ভাবে, দুর্মর পারিপাট্যে, বিশাল প্যানোরামায়। সে পাতলা শাড়িতে ব্যাপক আবহে আবু তালেবের রক্তমাখা প্রত্যঙ্গ চিহ্নিত করে, ভয়ধরা গুলিতে বা কারো ডাকের ভয়ে কিংবা পোশাকধারী নিরাপত্তারক্ষীদের বয়ে সে মনরূপকে বিসর্জন দিতে পারে না কিন্তু অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তা ক্রমশ বাড়ে। বিচিত্র বিষয়ের ভেতর দিয়ে সে বাড়ন্ত কাঠামোটি গাঢ় হয়, ঘনতলে আটকায়, উদ্ধত তবে আনতরূপে নিশ্চল পরিখা তৈরি করে। এজন্য ব্যাপক জনসমাগম চিহ্নিত হয়, তারা উঠে আসে রাজপথ ধরে, কখনোবা ইতিহাসের পথ ধরে। বিশেষ করে স্পর্শচিহ্নিত হয় আনোয়ার ও খিজির। সে প্রসঙ্গ পরে বলছি। ওসমান হরতালে- মিছিলে চিত্রিত হতে থাকে, গণজমায়েত, আবু তালেবের দাফন বা রাষ্ট্র-প্রকাণ্ডতায় সে প্রভূত হয়ে ওঠে। তার মত জানা যায়। অন্তর্মুখিতার কারণও প্রকাশ পায়। এটির ব্যাপক রূপ সামনে এলে কাহিনি চলৎশক্তি অর্জন করে। শেখ মোহাম্মদ ওসমান গনি রঞ্জুকে– সেটি একটি কর্পোরেট প্রতিবেশে চিহ্নিত হলে, দ্বন্দ্ব-পরিমণ্ডলটিতে রঞ্জুর সঙ্গে যুক্ততা নির্ণীত হতে থাকে আর এক রঞ্জুর। তার পরিচয়ে আছে, সে গওসুল আজম সু ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়েরই বাসিন্দা। প্রয়াত আবু তালেবের বাড়ির সদস্য। উপন্যাসকারের এ পরিচয় ও কাহিনির ভেতরে এরকম চরিত্র গড়ে তোলার কারণ নিশ্চয়ই শেখ মোহাম্মদ ওসমান গনি রঞ্জুর অন্তর্মুখি সত্তাটির প্রতীকবন্দী রূপটি বিবেচ্য করে তোলা। আবারও বলি, নতুন রঞ্জুর গড়ন-বৃদ্ধি-প্রকাশ-বিকাশ একটি প্রক্রিয়ায় পুনর্গঠিত– কারণটি ওই শেখ মোহাম্মদ ওসমান গনি রঞ্জু। কোন প্রক্রিয়ায়? আবু তালেবের মৃত্যুর ভেতর দিয়ে প্রণীত আখ্যানে নতুন রঞ্জুর পরিচয় প্রকৃতি নির্ধারণ এবং অতঃপর চলমান আন্দোলনে অবরুদ্ধ গনি রঞ্জুর অসুস্থতার সম্প্রসারণ (অ্যাসিডিটির মাত্রা বৃদ্ধি)– যেটি তার জীবনে হয়ে উঠছে ক্রম-অনিবার্য ও প্রতিরোধী। তার ক্রিয়া-বিন্যাসে প্রলেতারিয়েত খিজির। এ অবিনাশী ও দুরন্ত দুর্বার খিজির 'হন্ট' করে চলছে গনি রঞ্জুকে– বিরতিহীন, তার তীব্র আত্ম-সক্রিয়তার ভেতর দিয়ে। সেটি শেখ

www.chinafoundation.org

মোহাম্মদ ওসমান গনি রঞ্জুকে আরও বেশি বৃহৎ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করছে। এত সে প্রতিষ্ঠিতও হয়। চলে আসে নির্ধারিত কাহিনির কেন্দ্রে। পুনর্মূল্যায়িতও হতে থাকে আলাদা দৃষ্টিকোণে। পড়ে যায় বিহ্বল পাঠকের নজরে। এক অর্থে, শিল্পের নিয়মে পৌঁছে চলে সে। যেটি আগেই উক্ত হয়েছে "উপন্যাস>ওসমান" বন্ধনে। নজরটি দিতে চাই এমত যুক্তিতে : কীভাবে প্রারম্ভিক থেকে সে একাকার হয়েছে 'চিলেকোঠার সেপাই'-রূপে। হ্যাঁ, তাতে শ্লেষ-ব্যঙ্গ-রূপক-প্রতীক রূপনিচয় ধরে নিলেও তার কেন্দ্রেও যে তা-ই সেটি নিশ্চয়ই অপ্রস্তুত করে না কাউকে, দাবি নিয়ে বলা যায় যে কোনো মানের পাঠককেও।

উপর্যুক্ত অংশে যেটুকু পরিমণ্ডলে দুই রঞ্জু পরিচিতি পেয়েছে তা আরও নির্মল শৈলিতে গড়ে উঠতে থাকে। কেন্দ্রীয় চরিত্রটি সিজোফ্রেনিক হওয়া পর্যন্ত। তবে সিজোফ্রেনিয়া-আক্রান্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টিও আখ্যানে কঠোর ব্যাপার, সহজ নয়। সেটি অনেক পর্যায়ে, এবং বিশ্বস্তরূপে; দ্বিধান্বিত মনোগহনের তাপে জারিত। যে অবরুদ্ধতার (এখানে 'অবরুদ্ধ' শব্দটি ইমেজে পর্যবসিত, তা কোনো তুল্যমূল্য বিবেচনা থেকে নয়) সংকটটি তাকে এরূপ মনঃসমীক্ষার বাতাবরণে ঠেলে দেয়। বিচিত্রমুখি অবরুদ্ধতা, বিশ্লেষ্য এভাবে : বিচ্ছিন্ন তার পরিজন থেকে, উত্তাল গণ-আন্দোলন থেকে, সমগোত্রীয় বন্ধু থেকে, কৈশোর প্রেম থেকে (আত্মসৌন্দর্য, যেখানে তার সুখের স্মৃতি, তৃপ্তি বা আরামের আকর্ষণ বিচ্যুতি), যৌবনের জৈব সহযোগ থেকে, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তীব্র আকর্ষণের যন্ত্রণা থেকে, হস্তমৈথুনের পরে শ্যাটার্ডনেস হর্ষ-আহুতি থেকে। এ অবরুদ্ধতা ভেতরে-বাইরে অনদ্যান্ত রবে প্রকম্পিত। কিন্তু নিষ্কম্প্রও বটে। শেখ মোহাম্মদ ওসমান গনি রঞ্জু প্রবহমান ঘটনাপ্রবাহে নিষ্কম্প তবে বৃহৎরূপে সে কম্পমান এবং চীৎকারে উদ্ধত-ক্লান্ত। প্রসঙ্গত বলে নিতে চাই, চরিত্রটি যে প্রতিপার্শ্বে পাঠক সম্মুখে সমুপস্থিত তা জীবনের যাবতীয় প্রতিপাদ্যকে ধারণ করেই। সেখানে ৬৯-র ঢাকার চিত্র বা তার বাস্তব রূপ, ইতিহাসসম্মত প্রতিজ্ঞা– ওই চরিত্রেরই সারাৎসার। সে পাঠটি অমূলক নয়, গৌণও নয়। কিন্তু শিল্পের নিয়মে মিছিলের জনপদে নিখুঁত ঢাকা শহর, ঢাকার ঐতিহ্য-ইতিহাস, গণ-আন্দোলনের ঢাকা, আমজাদিয়া, আইয়ুবের ছবি ভাঙা, প্রত্যন্তে ছড়িয়ে যাওয়া আন্দোলনের স্রোত, মফঃস্বলের রাষ্ট্রযন্ত্রের পোষ্য বিডি দালাল, গণ-আদালত, নক্সা-চিত্রল গ্রামভূমি, সর্বহারার চেতনা ইত্যাকার বিষয় অবাস্তব। নিছক কালখণ্ডের দায়ে তার তুল্যমূল্য গুণ নির্ধারিত। বোঝাতে চাই, নির্ধারিত লক্ষ্যে ফ্রেমে আঁটা জনপদের নক্সা-বিবরণী আনন্দময় শিল্পকে 'পেছনের দরজায় ঢুকে ছুরিকাঘাত করার মতো' কী! হ্যাঁ, ওসমান গণি রঞ্জু তো তার ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে সেটি সত্য কিন্তু বিপরীত

www.climatefoundation.org

পীঠে ঐতিহাসিক-পদ্ধতিতে ক্রিটিসিজম তৈরি করলে ইত্যাকার বিষয়বস্তুতে নিখুঁত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাতে ওসমান গনি রঞ্জুর 'অবরুদ্ধ'শৈলি আস্বাদনে পূর্ণমাত্রার চলোর্মি-চঞ্চল রূপ যেন অপহৃত হয়। রসতৃপ্তির দান যেন অসংকুচিত থাকে না। বলে নিই, আসাদ-মতিউর-জোহা-জহুরুল আর বিপরীতে স্বাধীনতা-স্বায়ত্ত তর্কে প্রতিরোধী রাষ্ট্র ও তার দানব আইয়ুব ঢাকার অলি-গলি ছাড়িয়ে গ্রামজনপদে তার স্বরে শাসন করে বেড়ায়। আর সে ঐতিহাসিক চীৎকারে সহিংসতার সুরকাঠামোটি অতিশয় হয়ে ওঠে। উপন্যাস একটি নিয়মসূচকে বাধা পড়ে। তাই প্রতিরূপে ওসমান গণির শৈল্পিক উপহারই কাম্য এ পাঠে। পুনর্বার মনে করি, সেইটিই উপন্যাস।

৩. রঞ্জু ও রঞ্জু

প্রথমেই নিবেদন করি শিল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে, কলোনি-উত্তর কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিচরিত্রের স্বরূপ ধরবার জন্যে– যেখানে অরক্ষিত, তথাকথিত, শ্রেণি-অচিহ্নিত কিন্তু অনিবার্য ও গুরুত্বপূর্ণ জটিল চরিত্রকে উদ্দেশ্য-নির্ভর রকমে একই নামে পাঠকের সামনের উপস্থাপনায়। এ রঞ্জু আমাদের সামনে চিরপরিচিত, প্রতিনিয়ত পুনর্গঠিত, অনেকসংখ্যায় তারা সমাজের বিভিন্ন অংশে প্রকাশ্য, এর বিকাশ ও বর্ধন যেমন আছে তেমনি বিচ্ছিন্ন-অনিকেত-উৎকেন্দ্রিক-বিবরবাস-পেছনের পরিবারের ও সমাজের অন্তশ্চাপসহ বিচিত্রময় বর্ণাভায় তাদের ভাবনার ও কল্পনা আকাশ সংশয় ও দ্বিধাশীল তার অঙ্গন। কোনো প্রকারে সে স্বশ্রমে বা 'বিশ্রামে' বদলাতে পারে তার শ্রেণিস্তর। টিপিক্যাল স্বরূপ নিয়ে তার বিশ্বাস ও অহং-এর অংশগুলো। বক্ষ্যমান উপন্যাসে রঞ্জু ও রঞ্জু মুখোমুখি, উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসার সূত্রে। শিল্পের সূত্রে ঘনসংবদ্ধ এ দুটির নির্মাণ ও প্রয়োগ-কাঠামো। এই প্রথম, আমাদের বাংলাদেশের উপন্যাসভূমিতে এ কাজ। পেয়ে যাওয়া সম্ভব হয় এখানে যে কোনো উদ্দিষ্ট বাস্তবের বা ছকের বাইরের সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি বা স্থান-কাল নিরপেক্ষ একটি শিল্পদার্ঢ্য চিনে নেওয়ার। এক কথায় এ উপ-শিরোনামটিতে শিল্পভোক্তা 'নো কমপ্লেইন'। রঞ্জু ও রঞ্জুর প্রথম মুখোমুখি কোথায়? কীভাবে। পরে তার বিস্তার অংশ। তুমুল সৌন্দর্যের আলোক-সম্পাতি প্রযোজনা। পাঠ নিই বর্ণিত উদাহরণে :

(ক)

বিলের তীরে দাঁড়িয়ে ওসমান তার সর্বাঙ্গে শোনে মুনিয়ার একটানা কান্নার ধ্বনি। এই জায়গাটায় মুনিয়া বাসন মাঝে আর গোসল করে বলে এখানে কোনো পদ্মফুল নাই। পানিতে ওসমানের ছায়া পড়ে, পানির পাতলা ঢেউতে তার সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মতো ঠোঁটজোড়া বারবার স্থানচ্যুত হয়, শার্টের বুক

www.chintafoundation.org

পকেটে এম্ব্রয়ডারি-করা প্যাগোডা পানির অস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণে এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ে। দীপচাঁদের বাড়ির পেছনের আউশের ক্ষেত থেকে কালচে হলুদ রঙের গন্ধ এসে দীপচাঁদের বৌয়ের কান্নার সঙ্গে মিশে ধ্বনি, গন্ধ ও রঙের বিন্যাস নষ্ট করে দেয়। বিলের পানিতে শ্রীমান রঞ্জু তখন ওসমানের মুখোমুখি শুয়ে একটু ভয়ে ও একটু কামনায় কাঁপে। ওসমান নয়ন ভরে পানির সেই রঞ্জুকে দেখছে, রঞ্জু পানি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে তার সমানে, সে খেয়াল করেনি।

হঠাৎ রঞ্জুর কথা শুনে সে মাথা উঁচু করে তাকালো।

'আপনার ঘুম পাইতাছে। আপনি ঘুমান, আমি যাই।

(*চিলেকোঠার সেপাই* : দ্বি. মু. ১৯৯৩, পৃ. ৯৩)

(খ)

ওসমান একটু হাঁপায়। কয়েকটি মিনিটোর মধ্যে এতোগুলো বৎসর পারাপার করার ধকল কি কম? তার আর উঠতে ইচ্ছে করে না। ধীরেসুস্থে হাত ধুয়ে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালো। শওকত তখন বলি শোধ করছে। ওসমান দেওয়ালের আয়নার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। আরে একি! রঞ্জু এসে পড়লো কখন? রঞ্জুর সঙ্গে কি রানুও আছে। সামনের পারদ ওঠা আয়নায় রঞ্জুর প্রতিকৃতি, তার হাওয়াই শার্টের পকেটে এম্ব্রয়ডারি করা প্যাগোডা। রঞ্জুকে দ্যাখার জন্য সে পেছনদিকে মুখ ঘোরায়, নাঃ রঞ্জু কোথায়। রঞ্জু এখানে আসবে কোত্থেকে?

(*চিলেকোঠার সেপাই* : দ্বি. মু. ১৯৯৩, পৃ. ১৫৩)

(গ)

'খোলেন না'। রঞ্জু অধৈর্য হয়েই নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে বিছানায় তার পাশে বসে পথের পাঁচালীর মাঝামাঝি খুলে ফেললে ওসমানের চোখ পড়ে রুলটানা কাগজের ছোট ১টি টুকরা। সেখানে রানুর হাতের লেখা। ওসমান পরপর কয়েকটি ঢোঁক গেলে এবং হঠাৎ-ভয় পাওয়া ছেলের মতো রানুর লেখা চিরকুট ওভারটেক করে চোখ গুঁজে দিলো চিরকুটের নিচে বইয়ের মুদ্রিত লাইনগুলোর ওপর : দুপুরে কেহ নাই, কৌটাটা হাতে লইয়া অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বৈশাখ দুপুরের তপ্ত রৌদ্রভরা নির্জ্জনতায় বাঁশবনের শন্‌শন্‌ শব্দ অনেক দূরের বার্তার মত কানে আসে। আপন মনে বলিল– দিদি হতভাগী চুরি করে এনে ওই কলসীটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিলো!

কিন্তু দুর্গার সিঁদুর কৌটা চুরি আবিষ্কারের গ্লানি ও দুঃখ ওসমানকে একটুও আড়াল দেয় না; দুর্গার মতো বোন তার কোনোদিন ছিল না বলে তার অকালমৃত্যুর শোক থেকে সে নিদারুণভাবে বঞ্চিত। রানুর চিরকুটটা তাকে পড়তেই হয়;

www.chinnofoundation.org

(*চিলেকোঠার সেপাই* : দ্বি. মু. ১৯৯৩, পৃ. ২৩৬-২৩৭)

এতে কি রঞ্জু বনাম রঞ্জুকে চিনে ফেলা যায়? উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে দুই রঞ্জুর মাধ্যমে একটি রঞ্জু, যে কি-না ভেতরের রঞ্জু+বাইরের রঞ্জু=১টি পূর্ণাঙ্গ রঞ্জু (প্রসঙ্গত লেখক তার সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন আনোয়ার এবং ওসমান মিলে কার্যত একটি ওসমান, এখানে সে স্বীকারোক্তিটি ভুলে শিল্পের নিয়মে উপভোগ্য ওসমানকে বিশ্লেষণে আনা যেতে পারে) এখানে বুঝে আনলে কেমন দেখায়! উপন্যাসের দৃষ্টিতে রঞ্জু বনাম রঞ্জুর কারণ আরও অনেক– বলতে চাই নস্টালজিক ওসমান, অবসেসিভ ওসমান, নার্সিসাস ওসমান, আত্ম-কাতর ওসমান প্রভৃতি– যেটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প-ধারণায় বিবেচ্য। আশ্চর্য, সেটি প্রমাণের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্মরণ দুর্গার চুরি করা সিঁদূর কৌটা। এটির সঙ্গে অপার সাদৃশ্য দরিদ্রমুখি কৌম জনপদের জনজীবন– তার সঙ্গে গোয়ালঘূর্ণির ওসমানের আর কী এমন পার্থক্য আছে! এমতে আরও চিহ্নিত করা চলে, এই ওসমানই যখন উপন্যাসের কেন্দ্র আর তার প্রতিবেশ যখন ৬৯ নামক কালখণ্ড ও তৎসম্ভূত বিষয়-বিবরণী, তখন একটি প্রিজমিক দৃকপাতে ওসমান ওই সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে উঠতে পারে বাঙালি মুসলিম সমাজ-কাঠামোর ভেতরে জন্ম নেওয়া সদ্যোজাত 'ব্যক্তি'। যে ব্যাক্তি উন্মূল এবং স্বল্প-শিক্ষিত, আধা-শহরের নাগরিক (আসলেই কি নাগরিক? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞানে নাগরিক অর্থটি জানা থাকলে কিংবা পাশ্চাত্যের শহর ও তার নাগরিকত্ব আর এই ঢাকা শহরতলীর নাগরিক বা তার অর্থ-অধিকার ও কর্তব্যের পার্থক্য নিশ্চয়ই এক নয়), ব্যক্তিচিহ্নিত মর্যাদার যুদ্ধ, আত্মযুদ্ধ, ধর্ম বা পারিবারিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য বনাম নব্য-কলোনির কর্পোরেট সংস্কৃতির সুযোগ গ্রহণ করা না-করার মধ্যে প্রাত্যহিক দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ক্রম-বাড়ন্ত মনো-অভিজ্ঞতার সঙ্গে 'নাগরিক' স্বার্থতত্ত্বের বিরোধ বা আপোষ, স্বাভাবিক জীবনের দায় ও অধিকারে অনিশ্চয়তা এবং বাধা, যে রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সংশয়ের তারে বাধা সকল নাগরিকই (রহমতুল্লা থেকে শুরু করে আনোয়ার-আলতাফ)– এমনসব বিবেচনায় শেখ মোহাম্মদ ওসমান গনি রঞ্জু আমাদের পূর্ব-বঙ্গীয় কৃষ্টি-কালচার-বৃত্তি-নৃ-ইতিহাস-ঐতিহ্যে ভেতর-বাহির উন্মোচনের অবলোকন সৃষ্টি করা যায়। এবং সে সৃষ্টির ভেতর দিয়ে পরিস্রুত অনুরণন, অসীম-আঁধারবন্দী গ্রহণ-ধরা সময়, মহাবিশ্বের উত্তর-প্রজন্ম দায় ও অনুল্লেখ্য আত্মার চিহ্নিত স্বর শিখে নেওয়া সম্ভব। এ সম্ভবই সম্ভাব্যতা। যা উপন্যাসের আখ্যানতত্ত্বের অনুলিপি। এবং যা বলেছি, *চিলেকোঠার সেপাই*য়ে তার ফোকাল-পয়েন্ট ওসমান। তার ব্যবচ্ছেদে রঞ্জু বনাম রঞ্জু মুখোমুখি। এবার যা প্রত্যাশা করেছি তার যুক্তি-ইঙ্গিত তুলে ধরি।

রঞ্জুর যে বাসায় বসতি সে-কি ফ্রানৎস ফ্রানো কথিত 'জগতের ভাগ্যহত' একজন! গোয়ালঘূর্ণির ইব্রাহীম শেখের 'শুক্রানু' কী পরিবেশে বাস করে শহরতলী

www.ohinofoundation.org

ঢাকায়! ছোট্ট যে গোয়ালঘূর্ণি গ্রাম, সেখানেও দাঙ্গা ছিল, পাকিস্তান মানে মুসলমানের রাষ্ট্রে আশা ছিল, স্বপ্নও ছিল কিন্তু 'বেইমান' বনে যায় সেসব শ্লোগান। তারপর বিবরণীতে ঢাকার-উত্তাল জনস্রোতের একজন শেখ ওসমান গনি। সঙ্গে করে নিয়ে আসে মায়ামুখর জলঝরা জীবনের অনুরণন। তাকে পিছু ডাকে, তার সময়। তার ভেতরেই সে বাঁচে। সম্মুখে চলে। পেরোয়। কর্পোরাল কাঠোমোর কোনো চাহিদা তার মধ্যে দেখা যায় না। স্বার্থ নয়, মগ্নতাই তাকে ক্লান্ত করে। নিজেকে খুঁড়ে খুঁজতে থাকে। সগীর-মুনিয়া এসব নামে বৃষ্টি নামে, সুখ ভরে থাকে। কিন্তু এ সুখে প্রচুর বাধা ও বিনাশী অধ্যাস মেশানো। সেজন্য ক্লান্ত সে। অসুস্থও। লেখকের বিবরণে উপমা-উপমিতভরা অলঙ্কারসমূহ বিন্যস্ত নয়, রঙ-রূপ অস্থির-অবিন্যস্ত। দ্বিধা-দীর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু, অকিঞ্চিৎকর। এ টেন্সটাই এক সময় তাকে সিজোফ্রেনিক করে তোলে। যে কৃষ্টি-ইতিহাসের কথা বলেছি তা তাকে গড়ে তোলে– নিজস্ব রকমে। মুখচোরা বা মনচোরা যা-ই বলি, সে তো বিবর্তমান এ দেশীয় সমাজের অংশ। নাতিষিতোষ্ণ প্রকৃতির ভারে সে উন্মুখ, এ শহরে সে যুদ্ধমান– নিজেকে নিয়ে। সন্তপ্ত মরীচিকার পেছনে সে নিজেকে নিয়ে আগুয়ান। সে আবিষ্কার করে নিজেকে। প্রাচুর্যের ভেতরে সেঁধিয়ে দেয় নিজেকে। যুক্ত করতে চায় বৃহৎ ও মহৎ পরিমণ্ডলে। খিজিরকে বাছার কারণ তাই। কিন্তু সবচেয়ে বড় তার নিজসত্তা। ভাগ্যহত হলেও অস্তিত্বজাত সত্তাকেই সে নিজের প্রকরণে অভীপ্সিত মনে করে। আয়নায়, দোতরার রঞ্জুর মধ্যে, পেছন সময়ের মধ্যে নিজেকে ফেরত নিয়ে যাওয়া, অসম্ভব কামকাতর হয়ে নিজের শরীর দেখা, প্রকৃতির ভেতরে নিজের প্রার্থিত সত্তার রূপ অবলোকন করা, নার্সিসিস্টিক হয়ে সজ্জিত-আবরণের ভেতরে বা বাইরে তার অর্জিত চিত্ত-আত্মাকে স্নেহদান করা ইত্যাদি তীব্রতর করে তোলে তাকে। তীব্রতার ভেতর বাইর খুব প্রতিরোধী। প্রতিরোধ অমান্য করাও তার প্রতিরোধ। ফলে সে রোগগ্রস্ত হতে থাকে, মুক্তি পেতে চায়। মুক্তির জন্যও সে নিজেকেই বেছে নেয়। কামরতির তপ্ত শোধও থাকে ফলে তাকে ধরে ফেলে; ওই তাকেই অর্থাৎ রঞ্জুকে, তার অভ্যন্তরের সত্তাটিকে। মূলের সবকিছুকে ধরে সে মুক্তির উৎসবে মেতে ওঠে। জড়িয়ে ধরতে চায়, কান কামড়ে দেয়, ফেলে দিতে চায়, ধাক্কা মারে। অপার স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে (খিজির) অনেকভাবে এবং দীর্ঘ সময় সে একটি ব্যক্তিকে অনুসরণ করেছে। এখন সে তাকেই চায়। অনুসরিত এ ব্যক্তিই তার মডেল, যোগ্যও মনে করে। সেজন্য সিদ্ধান্তটি সে নিয়ে ফেলে। রঞ্জুর মুখোমুখি রঞ্জু, নিজেকে ভেঙে ফেলে সম্মুখের অবাধ ও মুক্ত-বাংলার প্রতিনিধি সে। তবে এখানে লেখকের মেসেজ কী? ওসমানের মুক্তিই কী উপন্যাসের বক্তব্য। না তাও ঘটে নান্দনিক অনুশীলনে। এক ধরনের সৌন্দর্যও আছে তাতে। নিশ্চিতও গ্রথিত সেখানে। ফলে মুক্ত পূর্ব-বাংলা

www.chinnofoundation.org

সামগ্রিক একটি চিত্রও বটে কিন্তু জীবনের উপভোগ্য রূপ, আত্মরতি, আত্মপ্রেম, সন্তপ্ত সংরাগ এর যে আয়োজনটি তা প্রসাদগুণের দার্ঢ্যে নিরূপিত। আমাদের সম্মুখে সে উপস্থাপনই মুখ্য হতে পারে। তবে সামগ্রিক মেসেজটি হয়তো মুক্ত-বাংলায় এক মধ্যবিত্ত অন্তর্মুখি সদ্যজাত ব্যক্তির দ্বন্দ্বাত্মক মুক্তির প্রসঙ্গ কিন্তু অনুরাগী চরিত্রের উপভোগে অসামান্য জীবনের পাঠও তো হতে পারে অন্যভাবে– সেটিও যে শিল্প অপ্রতিরোধ্য নয় তা-ই বা বলি কি করে!

৪. কলোনি-উত্তর ভাগ্যাহত প্রান্তিক জনতার নতুন পরিমাপ

ফিকশানে ওসমানের বাইরের এক আখ্যানে 'ভাগ্যাহত' প্রান্তিক জনতার বিরল বয়ান। এ নির্ণয় স্বভাবসিদ্ধ ও প্রশ্নরুচির বিবেচনায় সম্পন্ন। উপন্যাসের আখ্যান জুড়ে লেখকের দুর্বিনীত মেসেজ প্রলেতারিয়েত শ্রেণির শ্রম-মর্যাদা প্রতি সাম্মানিক দৃষ্টিপাত। ঘটনার চলমান স্রোতরেখায় তা আরোপ নয়; পূর্ণায়ত ও স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে প্রতিষ্ঠিত। কীভাবে? পড়তে শুরু করি *চিলেকোঠার সেপাই*। ওসমানের জীবন ও মনের অনুবাদ সম্পন্ন হওয়ার ভেতর দিয়েই এক রাষ্ট্র-আশ্রিত শ্রেণিশক্তির অভিব্যক্তি মূর্ত হয়ে ওঠে। নব্য-রাষ্ট্রে এদেশীয় নব-নিয়ন্ত্রণ শক্তি সে, যে রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীলতার লেজুড়বৃত্তি করে, শহীদ আবু তালেবের লাশের দাফনের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বটি সে নিজেই গ্রহণ করে। তার এ শক্তি পুঁজির দাপট। অনেক রিকসার মালিকই শুধু সে নয় অনেকের বসতভিটারও ঠাঁই তার হাতে। ক্ষমতার বলয়ে সে তাদের আবদ্ধ রাখতে চায়। সে মাফিক একটি প্রতিকৃতিও সে তৈরি করে নেয়। তার বর্ণনাও আছে উপন্যাসে। বর্ণিত বিবরণে কলোনিয়াল শক্তির উপকরণ আমাদের চিনিয়ে দেয় আন্তঃসম্পর্ক বা অভ্যন্তরে লুক্কায়িত স্বার্থ-ভোগের আকাঙ্ক্ষাসমূহ। কাহিনি সম্মুখে এগুলে দেখা যায় তার অধীনস্থরা নামে রাস্তায়-সড়কে। কিন্তু পক্ষটি তার নয়। সে যে আয়ুবের দালাল সেটি বিদ্যমান প্রতিকৃতিতে অধীনস্থদের কাছেও স্পষ্ট হয়। এখানে শহর-গ্রাম মিলে একটি দিক কাহিনির সঞ্চরণ ঘটে তা হলো, অনুগত বা অধীনস্থ প্রান্তিকসকল শ্রেণিশত্রুকে চিনে ফেলে। রাষ্ট্রের অধিকৃত চরে তারা বিদ্রোহ করে, স্বভূমির অধিকার ছেড়ে দিতে রাজী নয়। রহমতুল্লা, খয়বার গাজী, হোসেন আলি ফকির-এর বিপরীতে খিজির, চেংটু, আলিবক্স প্রতিরোধী হয়ে ওঠে জনতার সারি থেকে। প্রতিরোধী সংঘবদ্ধ শক্তির নিকট পরাজয়ও ঘটে। 'জনতার নতুন পরিমাপ' নান্দনিক-বীক্ষণে উঠে আসে। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির ভেতরে প্রভূত স্বার্থবুদ্ধির প্রাকার তৈরি হয়। তাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনতার শক্তি। জয়রথের চাকা আটকে পড়ে ভোগলিপ্সার পেছন টানে। প্রান্তিক মানুষকুলই এক হয়ে গণআদালত তৈরি করে প্রত্যন্ত গোটিয়ায়। 'সরকারী খোঁয়াড়, সরকারেক ট্যাকসো দিয়া তোমরা গোরু নিয়া যাও,

www.amarfoundation.org

কান্দাকাটি করো কিসক?'– এ-কি নির্মম বিদ্রূপ? পরের সংলাপের ধরণ : 'গোরু তো তাঁই পাবোই! তা ধরেন আইন একটা আছে, জরিমানা দিয়া খোঁয়াড় থ্যাকা গোরু খালাস করা লাগে'– এ উক্তির ভেতরে রাষ্ট্রীয় বা প্রভুত্বের রাজদণ্ড গৃহীত, যার প্রত্যন্ত প্রতিনিধিত্ব করে হোসেন ফকির ও তার দল-অনুসারী। একটা পর্যায়ে তা প্রতিরোধের দ্বন্দ্বে উৎকর্ষ লাভ করলেও সফল হয় না। ব্যর্থ হয় গণ-রায়, বিধৃত শ্রেণি-কাঠামোর ভেতরেই সুবিধাভোগীরা রক্ষা করে তাদের শ্রেণির অনুসারীদের, সেটি দীর্ঘ কলোনিয়াল শাসন ব্যবস্থার ভেতরে লুকিয়ে থাকা শক্তিই তাদের রক্ষা করে। কিন্তু কথাকার প্রতিকূলতার ভেতরে (এ প্রতিকূলতা একটি নতুন বিপরীত দৃষ্টি যেখানে সামষ্টিক জনতা একটি 'অধীনতা শক্তি'কে প্রতিপক্ষ মনে করেছে) একটি সুস্থ ও প্রগতিমুখি শক্তির সম্ভাবনার অভিমুখ রচনা করেন। সাফল্যটিও চিহ্নিত করেন। এবং সেটি একপ্রকার নান্দনিক নিয়মে। বলা চলে, এইটি এ ভূখণ্ডের বঙ্গীয় জনচিত্তের 'নতুন পরিমাপ', কোনো স্যাবলটার্ন-তত্ত্বে নয়, নিম্নবর্গীয় মানুষের সহানুভূতি নয়– প্রান্তিক শ্রমী-সংগ্রামী শোষিত সমাজের সনাতন দ্বন্দ্বাত্মক অবয়বের ভেতরে স্থির-নীরব-আনুগত্য-অসাহস ছাড়িয়ে সম্মিলিত বিস্ফারিত অবভাসিত শক্তির স্বরূপ চিহ্নিত করেন। ফর্মটির তারে বাধা পড়ে নতুন আখ্যা। সেটির ক্লাসিক মহিমা সম্পন্ন হয়। জয়সূচকে গড়ে ওঠে বিদ্যমান ভূখন্তের করুণা-কঠিন কাম্য রূপ। জয় সে চিরজীবিতের। এমন স্বর ও চিত্তস্পন্দন আমাদের সাহিত্যের জন্য অনেক আশার এবং সম্ভাবনার। 'ক্যাননশীপে'র বদলে গড়ে ওঠে প্রান্তিক প্রবণতার ন্যায়সত্য। এটিকে বড় করে দেখি, বর্তমান কর্পোরেট শক্তির আগ্রাসী পণ্যবৃত্তির ভয়কাতর সংকটের ভেতরে থেকে। যেটি প্রত্যন্তের মানুষের ভেতরে ভোগ আর অশৃঙ্খল-সংস্কৃতির অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা প্রচার করেছে। 'হলো জেনারেশান' তৈরি করে চিরায়ত শোষণের স্থায়ী বন্দোবস্তের চেষ্টায় রত। সেখানেই গণ-শক্তির জয়স্মারক গুরুত্ববহ। আমাদের নীল আন্দোলন বা বিবিধ বিদ্রোহ উপনিবেশ শাসনের ভেতরে একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তা সর্বার্থে নির্ভুল হয়তো নয়। কিন্তু নিশ্চয়ই সে জলসিঞ্চনের প্রবাহ অজর, অক্ষয়। এখন উপন্যাস আমাদের কী দিতে পারে? উপন্যাসের কাছে কেন যাই? সমাজ-কাঠামোর শক্তিটিকে জানা বা নিরূপিত ব্যক্তিটির অবস্থান চেনা– এইতো কাজ। আবার সে কাজের ভেতর দিয়ে নন্দনের নিয়ম কতোটা রক্ষিত, কীভাবে তা শিল্পরূপে দণ্ডায়মান সেটি উপভোগ বা তার অন্তিম-আতিথ্য অর্জন কম অনিবার্য নয়। উপন্যাস এ প্রতিক্রিয়াশীল সমাজে দাঁড়িয়ে শুধুই উপর-কাঠামোর চলমান চলচ্ছবি এঁকে যাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর একজন লেখক যে সময়ে লেখন তার সময় ওই নির্ধারিত ক্ষেত্র বা চরিত্রের মধ্যে বন্দী থাকবে তাও নয়। সে পুনর্গঠন করে উত্তর-প্রজন্মের অন্তর্নিহিত শক্তি, সমাজের ভেতরের দ্বন্দ্ব, প্রভু-

www.chinnofoundation.org

অধীনস্থ সম্পর্ক, নিম্নশ্রেণিস্তর বা শোষিত মানুষের ওপর অন্যায় পীড়ন-নির্যাতন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত কারণ ও প্রশ্নসমূহ, উচ্চশ্রেণির স্থবির বা স্বার্থলিপ্সু চিন্তার মনোআধার বা ক্যাননশীপ প্রবণতা– যেখানে অকুপাইড চেতনায় সে গোটা বিশ্বকে নিজের করে ভাবে প্রভৃতির বিচিত্র অভিমুখ সম্পর্কে পাঠকের জ্ঞানকে 'রিকালেক্ট' করে। প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে পাঠককেই। এবং ছড়িয়ে দেয় উত্তর-পাঠকের ভেতরে। তাই উপন্যাস ইতিহাস বা রাজনীতি নয়– সে তার নির্ধারিত শিল্পের নিয়মে প্রচলিত সমাজ ও চলমান সময়কে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। সৃষ্টি করবে নতুন ব্যক্তি। এ ব্যক্তি প্রতিরোধী ব্যক্তি। ওসমানের মতো সমস্ত জড়তা, নার্সিসাস, নস্টালজিক প্রবণতা অতিক্রম করে সে হয়ে উঠতে চায় মুক্ত-বাংলার মানুষ। সে বাংলার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন ও স্বপ্নবীজের প্রতীক্ষায় সে অস্থির ও আস্থাবান। এ চরিত্রটি কী কোনো কালের? অবশ্যই না। কারণ এ কলোনী-উত্তর কর্পোরেট বিশ্বে যে ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে তৈরি হয় বা পুনর্নির্মিত (উত্তর-ব্যাক্তি পুনর্নির্মিত হয় নানা অভিজ্ঞতায়) হয় সেখানে প্রত্যেককেই ওসমানের ঔপাদানিক রসায়নে নির্মিত। তা হতে পারে আংশিক বা ততোধিক। কিন্তু এ চরিত্রটির ভেতর দিয়েই ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ অবভাস চিহ্নিতকরণ সম্ভব। যাচাই করে নেওয়াও কষ্টকর নয়। এরূপে বক্ষ্যমান উপন্যাসে যে প্রান্তিক বা 'সামন্ত'-উচ্চশ্রেণিধর্মী চরিত্র ও তার দ্বন্দ্ব-মুখ প্রকাশিত হয়েছে তা বিধৃত সমাজের চলমান দৃষ্টিকোণ এবং সম্ভাব্য পরিণতির প্রতিচিত্রিত ইঙ্গিত। উপন্যাস সংঘাতময় জীবনেরই প্রতিলিপি, নইলে তার জন্ম পুঁজি-আশ্রিত সমাজে হতো না। সুতরাং পুঁজির সংজ্ঞার্থ অধ্যয়নই তার কাজ। তার ভেতর দিয়েই সে অনিবার্য জীবনের সম্ভাব্য রূপকে দীপিত করে তোলে। এ প্রক্রিয়ায় কর্পোরেট পণ্যবিশ্বে এর দায় ও প্রতিশ্রুতি আরও ব্যাপক। সহিংস সমাজের যে রূপ– সেখানে প্রান্তিক মানুষের জীবন আরও বিপন্ন, অসহায়। নবেজ-কবেজ-করমালি বা নাদু-পচার জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি, বরঞ্চ ব্যয়বৃদ্ধির জীবনে দারিদ্র্য তাদের জীবনে আরও করালগ্রাসী। বিপরীতে শ্রেণি-প্রতীভূরা দোর্দণ্ড প্রতাপে তাদের অকুপাইড চিন্তা সম্প্রসারিত করে চলেছে ভোগে-সম্পদে-শোষণে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি পণ্যের ফাঁদবন্দী হয়ে নিরন্তর বেদনায়-হতাশায় নৈরাশ্যে কূর্মগতিতে শ্যাটার্ড। এরূপ সদ্যোজাত ব্যবস্থার ভেতরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসখানা প্রান্তিক বা বৃত্তিয় মানুষের সংঘশক্তিকে প্রবল দার্ঢ্যে সম্মুখগামী করেছে। প্রত্যেন্তের অনেক কর্জ, লেনদেন, উৎপাদনের সম্পর্ক, উপযোগ যেমন কৌমস্পর্শী দ্যোতনায় চিহ্নায়নের প্রয়াস পেয়েছে তেমনি বেদনা-সুখ-আনন্দ স্মৃতিরও শাশ্বত ঐতিহ্যকে সূক্ষ্ম-সুবেদী চিত্রে মনোগ্রহী করে তুলেছে। লেখকের এ বয়নরূপ সমাজচেতনাঋদ্ধ।

www.chinnofoundation.org

কিন্তু প্রশ্নের পীঠে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হলো, এর নন্দনস্বর ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পুরাণকে কীভাবে সাক্ষ্য করেছে? ফর্ম বা আখ্যানের যে অভীপ্সিত পাঠ তা কতোটুকু রক্ষিত হয়েছে? এ প্রশ্নের উদাহরণ ও ব্যাখ্যাত পাঠে চিনতে চাই নিম্নের উদ্ধৃত উপশিরোনামে।

৫. অজগর ও ঘোড়ার ডাক

!)

'নীচে রোদ ও ছায়ার আল্পনার তলায় ল্যাজ ও মুণ্ডু দিব্যি মাটিতে ডুবিয়ে পিঠ উঁচু করে শুয়ে রয়েছে এক মাতাল অজগর। অজগর সাপটির বোধ হয় বোধশোধ লোপ পেয়েছে, আর এদিকে আনোয়ারের সামনে অজগরটি ছাড়া সবকিছু হাওয়া হয়ে যায়।'

!!)

'ঘোড়ার ডাক শোনেন নাই? নদীর মধ্যে কতো ঘোড়া ডাক পাড়ে শুনেছেন?'

'আমাকে ঠসা ঠাওরাস? তামাম নদীর মধ্যে ঘোড়া খালি তড়পাতিছে। বিপদ দেখলে যমুনার ঘোড়া ডাকে। বিপদ কি যমুনা একলাই করে? মানুষ মানুষের মুসিবত করে না?'

জীবনের প্রাচুর্যের ভেতর প্রকৃতসত্যটি কী? 'ভয়' আর 'জয়' এক বিশেষ জৈব-উপাদান, সেটি অনেক অভিজ্ঞতার ভেতরে মানব চরিত্রে বিশেষ প্রয়াসে ক্রিয়াশীল। হতে পারে তা চেতন বা অবচেতন সত্তায়, ইল্যুশন বা হ্যালুসিনেশনের ভেতরে কিংবা সংস্কার বা অভ্যাসবশত। সূক্ষ্মতর প্রবৃত্তীয় প্রণোদনায় তার প্রকাশ বাস্তবের ভিত্তিতে, বাস্তবপ্রসূতও বটে। *চিলেকোঠার সেপাই*য়ে ওসমান কখনো ইনার রিয়েলিটিতে কখনো আউটার রিয়েলিটিতে কখনো সে অবচেতনে তার প্রতিবেশ, অভিজ্ঞতা, আচরণিক চিন্তা-বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করে। চেতনার প্রবাহের ফর্মে বা মনঃসমীক্ষণে তার অভিব্যক্তি ব্যক্তিসর্বস্বরূপে। কথাসাহিত্যে মনোজগতের বিচিত্র প্রয়াস ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হয় বিধৃত সমাজ-রাষ্ট্রে ব্যক্তির অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য। শুধু সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির তুল্যমূল্য পাঠ নয়, আত্মসমস্যাকাতর ব্যক্তি তার যাবতীয় সমস্যাই প্রচলিত সমাজের ভেতর থেকে মুখোমুখি হয়, সচল ও প্রাণবন্ত শক্তির মূল্যায়ন ও সীমানা সম্পন্নতা যাচাই করে, সদ্যোজাত মানুষ-প্রাণীর চলমান জগতের ইচ্ছা-বাসনা-কামনার রঙময় ভূমিজালকে শিল্পের নিয়মের সারাৎসার পর্যবসিত কি-না তা পরীক্ষা করে ইত্যাদি নিশ্চয়ই একজন উপন্যাসকারের একটি চরিত্রসৃষ্টির দস্তুর বা বিধান। উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রাচীন বটগাছের শিকড় ইল্যুশনের ভেতর হয়ে গেছে অজগর। সেটি বাস্তব বিষয়ে পরিণত। আনোয়ার ঠিক দিগভ্রম নয় সে ভীত হয়ে পড়ে। অবচেতনে শেকড়কে অজগর সদৃশ জ্ঞান করলে সে কেঁপে ওঠে,

www.climatefoundation.org

হতাশার ভেতরে তাৎক্ষণিকভাবে নিমজ্জিত হয়। ফ্রয়েড কিংবা মনোবিজ্ঞানী-দার্শনিক ইয়ুঙ স্বপ্ন ও অবচেতন সত্তার যে সম্পর্কের কথা বলেছেন ['dreams give information about the secrets of the inner life and reveal to the dreamer hidden factors of his personality'] তার তাত্ত্বিক প্রয়োগে না গিয়ে অবচেতন সত্তাটি যে পরোক্ষভাবে যাবতীয় সঞ্চরণশীল অভিজ্ঞতার ভেতরেই ক্রিয়াশীল এবং তা আনোয়ারের সনাতন-সংস্কার ও মূল্যবোধের প্রাকারে বাধা– সেটি স্পষ্ট ও নিশ্চিত। সে ভয়ে লুপ্ত। হ্যালুসিনেশনের ভেতরে এক অনিশ্চিত ও অপ্রসন্ন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। কার্যত, যদ্যপি সে এরূপ সংস্কারে বিশ্বাস করে না কিন্তু অবচেতনে অনিবার্য হয়ে পড়ে– তার বোধ ও বিশ্বাস। এক কূটৈষার জালে সে বন্দী হয়। এটিতে এক ধরনের প্যারাডক্সিক্যাল প্রক্রিয়াও থাকে। সে নিরবধি জালাল মাস্টারকে ভূতুড়ে বিশ্বাস বা অমূলক চিন্তার বিভ্রমের বিরুদ্ধে প্রবল অবস্থান ঘোষণা করে অথচ নিজেই তা বিপুলভাবে ধারণ করে আছে। সে সংশয়গ্রস্ত এবং ভীতপ্রবণ হয়ে এখন 'জালাল মাস্টারের চিন্তার বিপক্ষে কীইবা করতে পারে!' এটিকে বলা যায় : immediate presentation of the unspoken thoughts of a character, এ বিবরণ-প্রয়াসে লেখক একটি পরিবেশও তৈরি করেন– যেখানে জালাল মাস্টার গাছ-ঝুরি-কাণ্ডর স্বব্যাখ্যা হাজির করে। এরূপ মনগড়া কুসংস্কার আর সনাতনী প্রাচীন-চিন্তার ভেতরে সে কিছু বলতে পারে না। 'অজগর' মাইমেটিকরূপে আনোয়ারকেও গ্রাস করে। এটি তার চিত্তের সারাৎসার : 'he is retelling a traditional story, and therefore his primary allegange is not to fact, not to truth, not to entertainment, but to the *Mythos* itself'.

একইভাবে ঘোড়ার ডাক আর একটি সক্ষুব্ধ-পাঠ রচনা করে। এখানেও 'বিপুল সংখ্যক ঘোড়ার সমবেত ডাক শুনে আনোয়ারের ঘুম ভাঙে, মনে হয় নৌকার ওপর সে শুয়ে রয়েছে, নদীর ভেতরকার অপরিচিত কোনো আওয়াজে নৌকা দুলছে। ভালোভাবে চোখ মেললে ভুলটা ভাঙে।' এর আগে সে আলিবক্সের মুখে ঘোড়ার ডাক শুনে বলেছে, 'ঘোড়ার ডাক শুনছে ... আনোয়ার বিগড়ে যায়, হায়রে, এই আমাদের বাম রাজনৈতিক কর্মী।' করমালি বলে : 'নদীর অনেক ভেতর থেকে সমবেত ঘোড়ার ডাক শোনা যাচ্ছে। সে তার বাপদাদার কাছে শুনেছে যে, নদীতে ভয়ঙ্কর বান ডাকার আগে যমুনা নদীর ঘোড়ার পাল উচ্চৈরবে হ্রেষাধ্বনি দিয়ে সবাইকে জানান দিয়ে যায়।' জালাল মাস্টার বলে : 'ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে মজনু শাহের অনুসারীদের অনেকেই আশ্রয় নেয় যমুনা খালের পশ্চিমে। আহত মজনু শাহ গঙ্গা পার হয়ে পালাবার সময় মারা যায় বিহারের কোনো গ্রামে। তার মৃত্যুর মুহূর্তে সমস্ত ঘোড়া একসঙ্গে চিৎকার করে চরম শুভসংবাদটি তার

www.chinnofoundation.org

অনুসারীদের জানাবার চেষ্টা করেছিলো।' সে আরও বলে 'সয়েন্সেই বলে ইতর প্রাণীর কোনো কোনো বোধ মানুষের অপেক্ষা বহুগুণ প্রবল।' এভাবে বিভিন্ন শ্রেণিস্তরের মানুষের ভেতরে 'ঘোড়ার ডাক' যমুনা বা তৎসংশ্লিষ্ট সংস্কার-সংস্কৃতির অংশ হয়ে পড়ে। ইয়ুঙ-কথিত সামষ্টিক অবচেতন সত্তার (collective unconscious) সামাজিক বহিঃপ্রকাশ। বিশ্বাসের এমন অনিবার্য স্বরটি যেমন চিরায়তিক তেমনি বস্তুবাদী দর্শনে এটির ভিত্তিহীনতা বা 'ক্যননশীপ' চরমভাবে অগ্রাহ্য– 'ডিসেন্ট'। বস্তুত, এটি 'ঔরশীপ'– যা মানুষকে পেছনে নিয়ে যায়, বিভ্রমে আক্রান্ত করে, ভ্রান্ত-বিশ্বসের মোহে স্বচিন্তা মরীচিকায় আটকায়। কিন্তু বিস্ময়করভাবে, এটি লক্ষণীয় যে, আনোয়ার-জালাল মাস্টার-আলিবক্স-করমালি থেকে শুরু করে সকলেই এ 'ভয়ার্ত' কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এমনকি আনোয়ারের বামপন্থা চিন্তা-দর্শনও ভুণ্ডুল হয়েছে, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিশ্বাসের এ রূপ এই ভূখণ্ডে সমাজ-ধর্ম-কাল নিরপেক্ষ। এটি এখনও ব্যক্তি-সাপেক্ষ হয়নি। এ মেসেজটি বিদ্যমান সমাজ-স্তরের চিহ্নিত রূপে। আমরা যে নাগরিক বা আধুনিক সমাজ-প্রবাহের কথা বলি– তার পূর্ণ-স্বরূপ বঙ্গীয় সমাজে এখনও 'কঠিন'; অনায়াসলভ্য নয়। এই 'ঔরশীপ' সমর্থিত সমাজ-শ্রেণিতে আনোয়ার বা আলিবক্সরা 'এক্সপ্লয়টেশনে'র বিরুদ্ধে কীভাবে এক হবে, কীসের গণ-আদালতের কথা বলে, কীসের সাফল্যের অপেক্ষায় থাকে। কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে আধুনিক মুক্ত-বাংলা। বিপরীতে বলি, 'mode of mental process' তো অব্যর্থ নয়। সমাজের দ্বন্দ্বসূত্র তো একটি প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে পুনর্নবায়নে মনকে তৈরি করে, সামনের দিকে এগিয়ে নেয়। সেভাবেই তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এ কর্তৃত্ব শোষণ বা শাসনের যেমন নয় তেমনি কোনো পূজারী বা সমর্পিত সত্তাও নয়। গণ-আদালতের রায় ও বিচারের ইঙ্গিতটি সে প্রবণতারই একটি ইঙ্গিতধর্মী সামাজিক ভিত্তি। আগেই উল্লেখ করেছি, লক্ষ্য বা মীমাংসিত সমাধানের পথে উপন্যাস বা এর ফর্ম নির্ণীত হয় না, এটি চলে শিল্পের নিয়মে। জীবনের সমগ্রতার ভেতর দিয়ে সমস্ত সম্ভাব্যতার সূত্র সে নির্ধারণ করে। চিলেকোঠার সেপাই, বাস্তবানুগ। উঠতি মধ্যবিত্ত, নাগরিক মধ্যবিত্ত, অর্থ-প্রাচুর্যের মধ্যবিত্ত, ভয়প্রবণ, সংশয়গ্রস্ত, পরিশুদ্ধ, শ্রমী মধ্যবিত্ত কলোনী-উত্তর কর্পোরাল সমাজে বিচিত্র সংস্কার ও মূল্যবোধের ভেতর দিয়ে একটি রাষ্ট্রীয় সমাজে তার অবস্থান ব্যক্ত করেছে। এক অর্থে তা পুনর্ব্যক্তও। কিন্তু এর পূর্ব-বাহিত রূপ কী? তার সংস্কারসমূহ, আচ্ছন্নতা প্রভৃতি ঐতিহ্যিক উপাদানের ভিত্তি কী? উপন্যাস তার উত্তর প্রদান করছে। যে গোটিয়া গ্রাম সেখানে রেডক্রস বা বিশ্বব্যাকের সাহায্য যেমন পৌঁছেছে তেমনি বিডি মেম্বারও আছে। কিন্তু গ্রামের আর্থভিত্তি তৈরি যেমন হয়নি তেমনি অধীনতা আর কর্তৃত্বের শোষণে স্থবির থেকে গেছে সামষ্টিক জনসমাজ। আর

www.chinnofoundation.org

তাতে মুক্তি ঘটেনি আনোয়ার-জালাল মাস্টারের মতো তথাকথিত ঐতিহ্যকাতর, বস্তুবাদী মানুষেরও। কর্পোরাল সমাজের এ চিহ্ন এবং ক্ষয়ের কঠোর ও নির্মম দাগাঙ্কন এই উপন্যাস। সে কারণে, এর পাঠ এ সময়ে একরকম কিন্তু ভবিষ্যতে তা দাঁড়াবে অন্যরকম। যার কেন্দ্র বা ফোকাল পয়েন্ট এই উপন্যাস তথা উপন্যাস-শিল্পের নিয়ম আহৃত ফর্ম। তাই বলি, *চিলেকোঠার সেপাই* সামাজিক শর্তে একটি অনিঃশেষ পাঠ। আর ফর্ম হিসেবে উপভোগ্য ও দুর্লভ পাঠ। জীবন্ত এ গল্পের চিত্রনাট্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তার কালবৃত্তের মেসেজ দিয়েছেন কিন্তু পাঠক তা গ্রহণ করবেন চিরকালের বলে। সেখানেই নির্মিত হবে উপন্যাসের গুণ তথা শিল্পের সদ্যজাত নিয়ম। কোনোভাবেই আমরা যেন এ পঠনটি ভুলে না যাই। উপসংহারের পীঠে প্রণীত এর আরেকটি উপসংহার, তাই নয় কী!

www.chinnofoundation.org

‘কী দেখিলাম এই খোয়াবে’

খোয়াবনামা প্রথম পড়েছিলুম ১৯৯৬ সালে। প্রথম সংস্করণ সেটি। বেরিয়েছিল মাওলা থেকে। আমরা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে ‘লেখকমাত্র’ চিনি তখন– আমাদের হাসান স্যারের (হাসান আজিজুল হক) সূত্রে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প/৭৬ ডি বাসায় হাসান স্যার ইলিয়াস সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত কথা বলে চলেন– প্রসঙ্গক্রমে অসুস্থতার কথাও। এম. এ. শ্রেণির ছাত্র হিসেবে ডিসার্টেশানে ইলিয়াস কথাসাহিত্য গৃহীত হলে পড়তে হয়, পড়িয়ে চলা আর এগুনো তখন, জেনে বা না জেনে বুঝে– এর ভেতরে একদিন *খোয়াবনামা* হাতে এলো, বেশ মোটা। খুব যত্নে বাল্যকালের মতো সিমেন্ট ব্যাগের মলাটে স্কচ টেপে বেধে ফেলে তারপর পড়া শুরু। প্রথম ৫০ পৃষ্ঠায় ঘোর, এরপর এ ঘোর আর ছাড়ে না, আস্তে আস্তে যেন এক প্রাসাদে ঢোকা। কতো কিছু যে তাতে! সমাজ-ইতিহাস-নৃতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব-প্রেম-কষ্ট-বেদনা-আনন্দ-দ্বন্দ্ব-হতাশা-পরিবর্তন-সম্ভোগ-রূপান্তর-প্রজন্মান্তর প্রভৃতি খুঁটিনাটি কতোকিছু! কী ছেড়ে কোনদিকে যাবো! হাফ ছেড়ে উদ্ধার আর কাঠপোকার মতো কুটকুট করে মাথার ভেতর– এটি কী পড়ে ফেললাম? অদ্ভুতরকম সে অনুভূতি। পরে আবার পড়া চলে, এবং গবেষণার জন্য খুঁটিয়ে দেখা, অতঃপর এ উপন্যাস নিয়ে অনেক সময় ভাবতে থাকি, নানা জায়গায় লিখি– কিন্তু অনিঃশেষ মনে হয় সবকিছু। এসব একান্ত কথা হলেও এখনও বলে যাই, বলতে বাধ্য হই *খোয়াবনামা*র পাঠ শেষ হয় নি, বিরামহীন তা চলছে। আর্টিস্ট-এর ‘মৃত্যু’ হয়েছে কিন্তু আর্ট বেঁচে আছে। শেষ হয় না কিছুই যেন। এ এক তুমুল মাহাকাব্যিক জীবনের বিরামহীন প্রতিশ্রুতি। সে প্রতিশ্রুতি লেখকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চিরজীবিত-চিরপ্রতিষ্ঠিত; বরাবর তা-ই হয়, লেখক লিখে যান, কিন্তু পাঠক চিহ্নায়িত করেন, চিহ্ন থেকে প্রচুর চিন্তার সূত্র পুনর্গঠিত হয়, গড়ে ওঠে ব্যাপক জীবনসূত্র, আর অনির্বাণ তার তাবৎ প্রণোদনা। তবে পাঠসূত্রটি কেন গড়ে ওঠে? এর কারণ কী? *খোয়াবনামা* উপন্যাস আর উপন্যাস (ঔপন্যাসিক) কী দেয়, কোন্ প্রতিশ্রুতিতে সে আটকায়, কেন মানুষ বার বার তা পড়ে বা তার কাছে যায়, কেন সেটি টেকে, দুর্মর হয়ে ওঠে– অনিবার্যতা পায়! দেবেশ রায়কে উদ্ধৃতিতে আনি : একজন কোনো মানুষের অকারণ বাসনা ঔপন্যাসিককে টানে, সমুদ্যত সর্বনাশ ঔপন্যাসিককে টানে। তার মানে কখনোই এই নয় যে ঔপন্যাসিকরা সর্বনাশের পরিস্থিতিই পছন্দ করেন। বরং উল্টো– ঐ সর্বনাশ আর বাসনায় তিনি এমন এক মানবসত্যের দেখা পান, যুক্তির দিকে থেকে যে সত্য, সত্য হয়ে ওঠার কথা ছিল না। কিন্তু সত্যি তো ভালোমন্দ-নির্ভর নয়। কোথাও

www.chirnofcundai.com.bd

যুক্তি বিপর্যয় ঘটে গেছে। কোথাও সম্ভাব্য সত্য ধ্বস্ত হয়েছে আর তার জায়গায় নতুন এক সত্য জেগে উঠেছে যা ভয়ঙ্কর হলেও সত্য, অনভিপ্রেত হলেও সত্য, অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও সত্য। ঔপন্যাসিকের সত্যের সেই বামমুখ দেখে ফেলেছেন।' কীভাবে? খোয়াবনামার বিবরণীতে তা বিদ্যমান। দ্যোতিত স্বরে চিহ্নিত সে প্রতি-প্রতিশ্রুতি। প্রাক-কলোনিয়াল সিনড্রোম তথা আখ্যানের-ঐতিহ্য বা মৌলস্বরটি (genuine) অন্বিত বলে। প্রভূতরূপে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিকাঠামো আর উপর্যুক্ত সমুদ্যত সর্বনাশের পরিস্থিতি নিরূপিত বিচিত্র পরিব্যাপ্ততায়। কাৎলাহার বিল, তমিজের বাপ এতদ্দিষ্ট উচ্চারণে উপনিবেশ-উত্তর ধারাটির নির্মাণ প্রয়াস। কিন্তু আখ্যানতত্ত্বের জোর ওই উৎসের। যথা : 'সিথানেতে পাকুড়গাছ মুনসিরও বসতি।/ তলায় গজার মাছ অতি হিংস্রমতি॥/ গভীর নিশিথকালে মুনসির আদেশে।/ বিলের গজার মাছ রূপ লয় মেষে॥/' মৌল-সংস্কৃতির কেন্দ্রে এমনটি রূঢ়ভাবে প্রকাশিত। প্রতিষ্ঠিত জিনিসটি প্রকাশিত। কাহিনির প্রথম থেকেই। আবারও প্রশ্ন তুলি কেন? বিবরণে আসি : সেই কতোদিন আগের কথা, কতো দিন আগের উচ্ছ্বাস, আকালের আগের খুশি, আকালের কাটাবেঁধা বছর উজিয়ে এসে কুলসুমের বুকে ছলছল করে ওঠে।... ময়মুরুব্বির কাছে শোনা গেছে, ১০/১২ বছর আগে এই গিরিরডাঙা নিজগিরিরডাঙায়, বিলের এপাড় ওপার জুড়ে ধান রোপা, নিড়ানি দেওয়া, ধান কাটা– সব কামই পাওয়া গেছে এখানেই। তখন নাকি কামলা দেওয়ার মানুষই ছিলো কম।... উঠানে ভাঙা মাটির মালসা চাপা-দেওয়া চুলার ভেতর ছাই গত রাতের বৃষ্টিতে ভিজে কাদা। এর ভেতর থেকে কয়লার দুটো টুকরা নিয়ে ফের ঘরের ভেতর দিয়ে বাইরের উঠান পেরিয়ে ডোবায় পৌঁছে খিদে মেটাবার তাড়া কিন্তু তার আর রইলো না। ডোবার ওপাওে একটু উঁচু সরু পথ, খানিকটা গিয়ে গাঁয়ের শেষে এই পথ মিশেছে গোলাবাড়ি যাবার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বড়ো রাস্তার সঙ্গে।... 'পাষাণে হৃদয় বান্ধো/ কান্দো গিরিগণে কান্দো/ ভাঙা ডিমে হলুদবরণ হইল সকল ঠাঁই'– কিছু প্রবণতায় নিজেকে চুবিয়ে নিলে বিবরণের ক্ষেত্র বা তার প্রতিবেশ-প্রবাহ চিনে ফেলা যায়। চাঞ্চল্য আনে তন্ত্রীতে। পরিচিত অস্তিত্বের স্পন্দন অনুভাব্য ঠেকে। সে অনুভবে কী আছে? বা তা কেমন। বলা যায় : অরিজিন্যাল এগ্‌জিস্টান্স (তমিজের বাপ, তমিজ, কুলসুম, বা তার আগের কথাসমূহ কিংবা তার ভেতরে কুলসুমের দাদা-পরদাদা বা আরও পূর্বের কেউ– কোনো বংশধর), পুরাণ পরণকথা (মাটির কৌমগন্ধী স্বর, ঐতিহ্যের চৌম্বক অংশ– যার দাক্ষিণ্যে ভরা উত্তর প্রজন্ম ও তার সময়), ইতিহাসের পরের কথা ('নানা বরণ গাভীর' 'একই বরণ দুধ' কিন্তু তাতেও বিভেদে ঐক্য কিংবা ঐক্যে বিভেদ)। এরূপে খোয়াবনামার বিবরণ-বয়াণ বা আখ্যান পরিকাঠামো নিরূপণে নেমে বুঝে নিতে চাই আমাদের এ কর্পোরেট সময়খণ্ডকে। কিন্তু তারও

www.chinnofoundation.org

আগে পরিষ্কার করে নিই শুরুর ভূমিকাটুকু। ছোট্ট কথায় চিনুয়া অ্যাচিবি বা গার্সিয়া মার্কেজ তৎ-প্রবণতায় যা লিখেছেন সেটি সদৃশ বা বৈসাদৃশ যাই হোক আমাদেও বসত-ভূমিপুরাণে জন্মজীনে যে প্রকৃতিলগ্নতা তা-ই *খোয়াবনামা*-কণ্ঠ। তার তাপ-ভাপ উত্তাপ-উষ্ণতা অবিলম্বে উদ্যত হয়ে পড়ে আটিস্ট-এর স্পর্ধায়-দম্ভে। আবার চিনিয়ে ফেলি প্রাচীন পুরাণ-কণ্ঠী অর্কেস্ট্রা বৈকুণ্ঠ-তমিজ-হুরমতুল্লা পেরিয়ে আজিজ-ইসমাইল-কাদের-কালাম মাঝি। প্রথমোক্ত রয়ে যায় আদি-কৌম চৌহদ্দীতে পরের অংশটুকু রূপান্তর ঘটায় কর্পোরেট-উচ্ছিস্ট কৃত্রিম কায়েমী সংস্কৃতির ভেতরে। বলেছি মিল বা গরমিলে স্মরিত বিশ্বখ্যাত চিনুয়া বা মার্কেজ দৃষ্টিতে কিন্তু আমাদের করকমলে পুণ্ড্রভূমিতে চর্চিত পুরাণ উপর্যুক্ত অংশবিশেষ বয়ানে অসীম-অরূপ বীক্ষণে এক নতুন আখ্যান-কাঠামো। তাতে আমাদের ফিকশান-তত্ত্বটি আলোচ্য করে তুলি। এটি তারই পরণবাণী।

ক. অরিজিন্যাল এগ্‌জিস্টান্স

কয়েকটি উদাহরণে আলোচনার প্রতিপাদ্যটি এ পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। তাতে দুটি শব্দ 'অরিজিন্যাল' মৌল/ যথার্থ/ অপরিবর্তিত-সত্তা; অপরটি 'এগ্‌জিস্টান্স' অস্তিত্ব-অবস্থান-নির্দিষ্ট বলে চিনে নিলে দুটি চিহ্ন পাই। এ চিহ্নের ভেতর থেকে অর্থ-সঞ্চারিত হয়, এবং তা অনিঃশেষজ্ঞাপক ও বিচিত্ররূপে বিচ্ছুরিত। অর্থটি চরিত্র নিরূপিত থাকলে পরে তা কাহিনি-গাত্র হয়ে পরিব্যাপ্ত মেসেজ তথা প্রতিশ্রুতিতে প্রকাশিত হয়। সে প্রকাশ একটি পর্যায়ে দিব্যত্বে উত্তরিত হয়ে চলে। চিহ্ন-বিচ্ছুরিত অর্থটি প্রথমত আপাতঅর্থে থাকলেও ক্রমশ তা ঘটমান বর্তমান থেকে দ্বন্দ্ব পরিপ্লুত হয়ে পুরাণ-ঐতিহ্য থেকে আহৃত করা চলমান বা প্রবহমান ইতিহাস– তার ভেতরের দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বাত্মক হয়ে বৈচিত্র্যের টানে পরিস্রুত প্রকাশ অতঃপর দিব্যত্ব-অবভাসে অনিঃশেষ আত্মার স্বরূপ-সীমা অর্জন। যেটি ক্রমাগত পাঠে নব নব রূপে উদ্ভাসিত। কাল-পরিসর সে উদ্ভাসন ছড়িয়ে চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে– পরে যা তুমুল অর্থদ্যোতকতা পেয়ে অসীমান্তের আকাঙ্ক্ষায় সৃজ্যমান আধাররূপে পুনর্গঠিত হয়। এ পুনর্গঠিত রূপ আখ্যানটিকে যে কোনো পাঠকের নিকট বর্তমানে বা তার অভিজ্ঞতায় পৌঁছে দেয়। বস্তুত, উপন্যাসের আখ্যানে সেটিই তার সার্থক প্রয়াস। যা হোক, ইত্যাকার বিবেচনায় তুলে নিই *খোয়াবনামা*র প্রথম ১০ অংশের পাঠ। স্মর্তব্য, উপর্যুক্ত দুটি শব্দ 'অরিজিন্যাল' ও 'এগ্‌জিস্টান্স'। উদাহরণগুলি এ পাঠের উপর্যুক্ত অংশে গৃহীত হয়েছে। কিংবা কাহিনি জানানোর ব্যাপারটিও এখানে তেমন কার্যকর নয়। তমিজের বাপ, পাকুড়গাছ, মেঘ তাড়ানোর ভেতর দারিদ্র্য, শোষিত, দলিত শ্রেণিস্তরের সৃজনবয়ান কঠোর কৌম-কৃষ্টিতে নির্ধারণ পেতে থাকে। ক্রমশ তার বংশ-পারম্পরিক শাখা-প্রশাখায় শোষণ-ক্ষমতার

www.chintafoundation.org

স্বরূপও চিহ্নিত হয়। কামারপাড়া, মাঝিপাড়া বা এ পাড়ার পূর্ব-ইতিহাস তারও পূর্বের ইতিহাস দ্বন্দ্বসূত্র-কাঠামোতে আদিষ্ট। এ পর্বে শরাফত মণ্ডল ক্ষমতার কেন্দ্রে। সে বিপন্ন করে তোলে উপযোগ, বৃত্তি, দূরাগত আনন্দসমূহ। তমিজের বাপ-মা, সৎমা কুলসুম, দশরথ কর্মকার, জগদীশ সাহা বা তাদের পূর্ব-পুরুষ। সোভান ধুমা, বাঘাড় মাঝি বা চেরাগআলি ফকির একইরূপে জীবিকার শেষটুকু রেখে গেছেন সন্ততির ভেতরে। টিকে থাকে কার প্রতিরোধে! প্রান্তিক জনতা কীভাবে তার অস্তিত্বকে জিইয়ে রাখে, কী তার অস্ত্র, কী তার বাঁচার সূত্র। কিংবা প্রান্তিক মানুষকুলের শক্তির আধার কী। তার মনস্তত্ত্ব কী। এসব প্রশ্নের ভেতরে আখ্যান বিনির্মাণে কৌমসমাজের দ্বন্দ্বাত্মক প্রতিকৃতি চিহ্নিত হলে, জেনে যাওয়া যায় প্রতিরোধী শক্তি। শরাফত মণ্ডল ও তার পরিবার। এছাড়া ক্রম-শক্তিতে পরিণত হয় রহস্যসূচক জীবনপ্রবাহে প্রান্তিক তমিজের বাপও। অগ্রসর আখ্যানে এক পর্যায়ে পেয়ে যাওয়া যায় যে, শরাফতের ওপরও সে দাপট চালাচ্ছে। অবচেতন ও রহস্যময় শক্তিটি বলয় সৃষ্টি করে ব্যাপক ভূমি-অঞ্চল-এলাকা জুড়ে। যেখানে ধরাশায়ী আর্থিক শক্তি। পরাস্ত অন্যান্য দাপটও। কৌমসমাজচিহ্নিত আচার-আবহে সোভান ধুমা, বাঘাড় মাঝি বা চেরাগআলি ফকিরও কম নয়। অনেক গৌণ শক্তিও পরিণত হয় মুখ্য শক্তিতে। অদৃশ্য অবাস্তব বিশ্বাস শক্তির আধার হিসেবে পরিগণিত হয়। অদৃশ্য-অলৌকিক-অবচেতন শক্তির প্রচণ্ডতায় ভেঙ্গে পড়ে যৌক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ। বিপরীতে গাঢ় হয় অন্ধকার বা পশ্চৎপদ শক্তি। এ বিশ্বাসের পিঠে কুৎসা-মিথ্যাচার-হীনন্মণ্যতা-গ্লানি-মূঢ়তার পশ্চাৎ-কাঠামো তৈরি হয়। কৌমজীবনাচার তার সংস্কৃতির ভেতরে তা স্বতঃস্ফূর্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ক্রমশ অস্তিত্বের অংশটিও এর ভেতরে প্রবহমান লয়ে এগিয়ে চলে– যেখানে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির প্রাকৃতিক সম্বন্ধ এবং বন্ধন বিযুক্ত হয় না। শ্রমে-ব্যঞ্জনে স্বকৃত বিশ্বাস অবলম্বি হয়েই তাদের অস্তিত্বের জানান দেয়। এতে এক বিশ্বাসলগ্নতায় এগিয়ে চলে জীবন। সেটি শক্তি। সোভান ধুমা থেকে শুরু করে বংশ-পরম্পরায় অনেকেই এ আদিম ও নিশ্চল শক্তির সঙ্গে যুক্ত। এটিই তার অস্তিত্ব। এগিয়ে যাওয়ারও প্রেরণা। লেখক এ ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক-অস্তিত্বের মৌল দণ্ডটি ধরতে চান। তুলে আনেন তার আবর্ত ও বিকেন্দ্রীভূত বিষয়সমূহ। এতে প্রান্তিক মানুষের সংঘশক্তি বা যৌথজীবনের দ্বন্দ্ব-সংস্কৃতির চলকসমূহ ধরা পড়ে। এই অবিশ্বাস যে বিশ্বাস, অবাস্তবই যে বাস্তব, অনস্তিত্বই যে অস্তিত্ব সেটি তো কৌম জীবন সংস্কৃতির একটি কাঠামো। কিন্তু এই কাঠামো ভেঙে পড়ে, পড়তে বাধ্য হয়, থাকে না একরকম। ঐতিহ্য-পরম্পরায় ওই বিশ্বাসের আত্মা হয়তো জীবিত থাকে, প্রাণশক্তির উৎস বা নির্যাসস্বরূপ অন্তঃস্রোতে চলমান থাকে কিন্তু তার বদল ঘটে। উপরিতলে সে গ্রহণ করে নির্ধারিত পরিবর্তনকে। তমিজের

www.chinnofoundation.org

বাপের মৃত্যুর পর সে তার অস্তিত্ব-অংশ রেখে যায় সন্তানের ভেতর, তা লক্ষণীয়ও হয় চলমান জীবন প্রবাহের ভেতরে কিন্তু তা পেশা-বৃত্তির তথা উৎপাদন সম্পর্কের আঘাতে একরকমও থাকতে পারে না, থাকা সম্ভবও হয় না। তমিজ-ফুলজানের সম্পর্কটির ভেতরে পেশা বা বৃত্তির বদল দেখা যায়, মাঝি হয় চাষী, যে কামার সেও থাকে না তার পেশায়, চাষীও চলে যায় অন্য কাজে শহরতলী বা অন্য কোনো চাকরিতে। *খোয়াবনামায়* প্রধানত কৌম-সংস্কৃতির কাঠামোটি, জাতধর্মপেশার আচরণিক নন্দনলিপিতে বয়ন হয়েছে। এটি আলাদা এবং বিপুল অস্তিত্বজ্ঞাপক। কারণ, শুরুতেই যে নন্দনবন্দী বিবরণ দিয়ে আখ্যান এক্সপোজ হয়ে চলে সেটি অতুল্য এবং অভাবনীয়। তমিজের বাপের মেঘ তাড়ানো, অর্জুন গাছ, পাকুড়গাছে মুনসির খোঁজ, বিলের পাড়চিহ্নিত মিথ পাড়ভাঙা জীবনেরই আওয়াজ তোলে। কিন্তু এ বিবরণ বায়বীয় নয়, তাতে বংশ-পরম্পরার খোঁজ, পেশা-বৃত্তিভোগী মানুষের ইতিকথা বয়ান, একে এক শোষকশ্রেণির সংঘাতশক্তির অহং-চিহ্নিতকরণ এবং বিপরীতে প্রান্তিক বা কৌম জীবনাচারের মানুষকুলের পেশা-মর্যাদা চিত্রিকরণ– একই সঙ্গে ধরিয়ে দেওয়া শ্রেণিসংগ্রামের দ্বান্দ্বিক পদবীক্ষেপ বয়ান। একে একে পরত উন্মোচন হলে পলে পলে পাল্টে যায় জীবনের সম্মুখগতি, কেউ জীবনের আহৃত অনেক কিছু ফেলে নির্মম বাস্তবতাকেই বেছে নেয়। অমোঘ পরিণতিরও যেন এক প্রকার প্রস্তুতি থাকে, নিশ্চিত করে ভাবতে বদ্ধপরিকর হয়– এই শেষ মজুরী দাম। কলোনি-উত্তর কাহিনি-ফর্মের এ রূপ পুনর্গঠিত প্রবহমান সংস্কৃতির অস্তিত্ব-আন্তর স্বরূপ। এ স্বরূপে অরিজিন্যাল অস্তিত্বের চিহ্ন কে? সব প্রান্তিক মানুষের পূর্বাপর সংগ্রামের নির্মল ইতিহাস। তা যুগবাহিত। যুগের ভেতরেই তার শক্তি সঞ্চিত। বহুস্বরিক ক্ষেত্রটিতে উঠে আসে যৌথ শোষিত শক্তির রূপায়ণ। তবে ইগো বা দম্ভ-আভিজাত্যের মজ্জাগত অধঃক্ষেপও তাতে তিরোহিত থাকে না। প্রতিকূল জীবনাচরণের ভেতরের স্বপ্নজাগর প্রলাপ চিহ্নিত হতে থাকে। অস্তিত্বের সত্যে তা দীপিত। *খোয়াবনামায়* যে কৌম-সংস্কৃতির পরিচয় মেলে, পরিচয়ের ভেতরে যে দ্বন্দ্ব-কাঠামো তা কোনো আভিজাত্য-তরঙ্গে বা ধর্ম বা শাসনতন্ত্রের শর্তে আটকান নয়। সেটি আদিম ও প্রান্তিক মনোস্তত্ত্বে কালপ্রবাহের চলকে বিন্যস্ত। এ চলকগুলো ইনডেজিনিয়াস প্রকৃতি-হাওয়ায় পুনর্নির্মিত। মনোকাঠামোতে দৈব বা নিয়তিও তার অন্যতম চলৎশক্তি। সে শক্তির স্বরূপটি উপর্যুক্ত অংশে আছে (তমিজের বাপ বা তার পূর্ব-পুরুষ)। এটি কলোনি-উত্তর সময়খণ্ডে পুঁজির প্রকোপে ভেঙে পড়ে। আরোপিত কর্পোরেট ব্যবস্থায় পেশা-চরিত্র যেমন বদল হয় তেমনি ভূমির সীমানা পাল্টায়, ভোগ আর দখলের শক্তির ভেতরে শোষণের ধারণা বিস্তৃত হয়। শোষণ মনস্তত্ত্বে চরিত্রের-আকর অবস্থান পাল্টায়। পরিবর্তন ঘটে স্বার্থ ও প্রবৃত্তিগত কার্নিশের

www.shimfoundation.org

ধারের প্রকৃতি। যেমন কালাম মাঝির বা আবদুল কাদেরের পরিবর্তন। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে চলমান প্রতিক্রিয়াশীল সময়প্রবাহে মনের অগোচরে অস্তিত্বের স্বরূপ বদলায়। পরতে পরতে যখন তার পরিবর্তন আসে তখন আদিম বা যৌথ-আচরণের ভিত্তিটুকু নড়েচড়ে বসে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ বা আমৃত্যু তমিজের বাপ কিংবা কুলসুম-ফুলজান কি তা পেরেছে? পারেনি। তারা সবকিছু হারিয়েও আদিম জীবন-সংস্কারেই স্থির থেকেছে। এ কারণে শোষণ বা বঞ্চনার করালরূপ তাদের স্পর্শ করেছে। তমিজ নিজ ভূমি-জায়া-জমি ছেড়ে শহরবাস করেছে, কিন্তু কোনো প্রতিশ্রুতিই থাকেনি। বিপরীতে সে হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রের ফেরারী। তেভাগা কায়েম হয়নি কিন্তু তার জন্য সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। খোয়াবনামার অরিজিনাল এগজিসট্যান্সের স্বরূপটি এভাবেই প্রত্যক্ষগোচর হয়। দুটি বিষয় : এক. আদিম কৌম বা যৌথ সংস্কৃতির ভেতরে অস্তিত্বের তুমুল যুদ্ধ, দুই. সেটি ধ্বসে পড়েছে কর্পোরেট কলোনির প্রতাপে। সেখানে অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচবার ফেরারি হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র তমিজ। এর ভেতরে শোষণ-ত্রাসনের আরও অনেক প্রান্তকে চিহ্নিত করা যায় (উপরের বিশ্লেষণে ইঙ্গিত আছে) কিন্তু সমাজ-রাজনীতির ঘূর্ণিজালে 'ব্যক্তি'র নাভিশ্বাস এ বাংলায় তথা এই ভূ-ভাগে সৃষ্টি করেছে শোষিত মানুষেরই ক্রন্দনধ্বনি। তার বিপরীতে ভোগ ও লালসার জান্তব দানবের ছায়াপাত ঘটেছে বিচিত্রমুখি কুৎসিত অন্ধ-প্রহেলিকায়। কিন্তু তাতেও টিকে আছে সংস্কার-অর্গলের লৌকিক আচরণের সংস্কৃতি। কেরামতের গানে তার প্রমাণ স্পষ্ট। এই অরিজিন্যাল অস্তিত্বের চিরায়ত প্রকৃতি।

পুরাণ পরণকথা

খোয়াবনামার 'পুরাণ'-বীক্ষণটি আমরা অন্যরকমে পেতে চাই। গ্রীক পুরাণ বা ভারতবর্ষীয় পুরাণে যে যুদ্ধ-দামামা বা স্বার্থচিহ্নিত প্রেমকে পাওয়া না-পাওয়ার জঙ্গচিত্র যেভাবে স্বর্গমর্তআকাশপাতালে ব্যাপৃত হয় কিংবা ঘটে চলে অলৌকিক ঘটনার বৈচিত্র্যময় কারসাজি– তার ভেতরে সত্য ও ন্যায়ের অটুট লক্ষ্যেই চলে পুরাণের কাল-আবর্তের সিদ্ধিবার্তা নির্মাণ। কিন্তু সে তো একালের নহে, আগের যুগের বর্ণিল পুরাবৃত্তের কালরেখা। বলি, উপন্যাস সৃষ্টির ভেতর দিয়ে সে পুরাবৃত্ত বা সামষ্টিক সংঘশক্তির তো বিলুপ্তি ঘটেছে। বিপরীতে 'ব্যক্তি'-সৃজনের ভেতরে গড়ে উঠেছে একক পিরামিড। যেখানে পুঁজির সংক্ষুব্ধ আগ্রাসন ব্যক্তি-সংশ্লিষ্ট সব-শক্তিকে (হোক তা আনন্দের বা বিষাদের) বিনষ্ট করে তাতে গড়ে তুলেছে শোষণের অনিবার্য প্রাকার। যাতে মিথের পরণকথা হয়ে উঠেছে পুনর্নির্মিত কালের বর্ণিল কিম্ভূতমূর্তি, আদিম কারুকলার নিরন্ধ্র প্রকোষ্ঠের অট্টহাস্য-হৃতোচ্ছ্বাস–

www.chinnofoundation.org

বিশেষ করে এই– এমতো বঙ্গীয় সমাজে। সমাজ নিয়মের ভেতরে তা উঁকি দেয় আবার মুখ ফেরায়, অনিকেত আলোছায়ায়, সত্যের লাস্যে ক্রন্দনের হাস্যে একরূপ ল্যাজারসের অভিনয়ে কুঁকড়ে যায়, কানাকড়ির দামে ক্রয়-বিক্রয়ের পর অনর্গল সস্তা পুঁজিতে ধ্যানে-মানে-'গুণে'-'গরিমা'য় প্রাচুর্যতরো হয়ে উঠলে পরিস্রুত সমাজে যে বরমাল্য সে পায় তা এক অভীপ্সিত পরণকথা রচনা করে– গুমরে ওঠা তীক্ষ্ণ প্যারাডক্সে, কূর্ম প্যারাডাইমে– এক অনিঃশেষ প্রতিক্রিয়াশীল খুনি মধ্যবিত্ত শ্রেণি-অবলম্বি অকালপক্ব সে 'ব্যক্তি'। তাই ব্যক্তি-পুরাণ। তাকে পুরাণে ফেলি পরণকথা আখ্যানের মোড়কে বাধবার জন্য। *খোয়াবনামার* লেখকের নিকট কৃতজ্ঞ 'ডেথ অব অথার' অভিব্যক্তিতে তার অকালপক্ব ব্যক্তির রূপনন্দনকলা ব্যাখ্যায়নের প্রয়াসে প্রবৃত্ত হলে বের করা সেই 'ত্রিশূল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মহাদেব নিজের হাতে মোষের দিঘি খুঁড়েছেন এক রাতের মধ্যে' পুরাণকথা। ভয় ও ভক্তির পুরাণ। জাত-ধর্ম ভেদে আছে পার্থক্যরেখা। মানা না-মানার কাণ্ডকারখানা। হিন্দু জমিদার পরে হাত বদল হয়ে মুসলিম জমিদার এক একভাবে স্বার্থের দোহাই পেড়ে একরাতের দিঘির ভক্তিপ্রণাম করেন। পরে কোনো কোম্পানির মালিকের কাছে তা বাধা পড়লে সবকিছু ক্রমাগত উঠে গিয়ে (ভয়-ভীতিসহ) এবার পূর্ণমাত্রায় মালিক-মজুর ভয়-ভক্তি শুরু করে। আশা-আশ্বাসে, স্বপ্ন-নিয়তিতে সে ভয়-ভক্তির সবটুকু মালিকের পকেটে উঠে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সবাই তার পক্ষে হয়। নিয়তিও তার পক্ষে কাঁসর বাজায়– বাদ্যি আনে। দেখা গেছে, কালাম মাঝির ইলেকশন করা বা আবদুল কাদেরের তেভাগার প্রতিশ্রুতির কথা। আরও ভয়ঙ্কর ভাবে জানা গেছে হিন্দু হওয়ার কারণে কিংবা তার সম্পত্তি ছিনিয়ে নেবার কারণে কোনো এক বর্ষণ-রাতে বৃষ্টির কান্নার ভেতরে মার্ডার হন বৈকুণ্ঠ। সে মৃত্যুমিথ ছাপা হয় *খোয়াবনামার* অনেকটা অংশ জুড়ে। কলোনি-উত্তর যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সেখানে এ খুনের বিচার বা আইন-আদালত সাক্ষী কিছু নেই, কেউ তা বলতেও পারে না কিছু কিন্তু তেভাগা চাওয়ার কারণে পুলিশের নজর এড়াতে পালিয়ে বেড়াতে হয় প্রত্যন্ত পর্যন্ত প্রান্তিক চাষি তমিজকে। আইনের 'বিপরীত যুগ্মপদে'র ঘটনা কোনো মুহূর্তে রটনা বলেও চালানো বিচিত্র কিছু নয়। রাষ্ট্রশক্তির এ প্রকৃতির অনিঃশেষ পুরাণবাণীর পাদপীঠ বক্ষ্যমান উপন্যাসটি আর মিহি স্বরে আটকায় তমিজের বাপের কর্মনাশা শক্তির স্বয়ম্ভরতায়। পুরাণের পুরণবাণী ধৃত উপন্যাসের গোড়া থেকেই। ফর্মের ভেতরে আছে পৌরাণিক বিভা। সেটি তরঙ্গপ্রবাহে ছুঁয়ে যায় আখ্যানের কাঠামোতে। তমিজের বাপ, কুলসুম, তমিজ, ফুলজান, কেরামত, বৈকুণ্ঠ, শরাফত মণ্ডল, আবদুল কাদের, আবদুল আজিজ, ইসমাইল মুসলিম এরা অধ্যুষিত জনজীবনে পূর্ব-বাহিত প্রজন্মের উত্তরসূরি। তারও আগের কিংবা পূর্বের ধারা বহন করে চললে এদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল,

www.chinnofoundation.org

সংস্কারবোধ, কৌম-আচার-আনুষ্ঠানিকতার পর্যায় ব্যাপকভাবে মিথ-অনুষঙ্গি হয়ে পড়ে। কেরামত ও তার পূর্বসূরি চেরাগ আলি ফকির কোন্ উদ্দেশ্যে গান বাঁধে! তার গানের সুর ও স্বর কোন্ তারে বাধা। একটি উদাহরণ :

খোয়াবে দেখিল মুসা শয্যাতে মশারি।
শুনিয়া মজনু কান্দে আছাড়ি পিছাড়ি ॥
হায় হায় নাহি মোর পুত্রেরও হায়াৎ
কেমনে সহিব পুত্রবিয়োগ আঘাত ॥
আজরাইলে তিন রোজ তিন রাত দিবে।
তওবা কর‍্যা আসো বেটা দরগাশরিফে ॥

এটি পুরোটা পৌরাণিক-সংস্কৃতি। এর বিশ্বাসমুখী প্রয়োগ ও সংস্কার জনচিত্তের গভীরে প্রোথিত। এটি মৌলিক ও সম্পূর্ণরূপে দেশিয় ভাবনার বিন্দু। কোনো পাশ্চাত্য প্রভাব বা আদেশ এতে নেই। এমনটি শুধু একটি প্রজন্ম বা সময়ে নয়– তা যেমন পূর্ব-বাহিত তেমনি উত্তর নিরূপিতও। 'মুসা শয্যাতে মশারি', 'মজনুর কান্দন', 'পুত্র বিয়োগের আঘাত', আজরাইলে তিন রোজা তিন রাত, তওবা কর‍্যা আসো দরগাশরীফে এসবের ভেতর দিয়া জীবন-চলার শক্তি অর্জিত হয়। ঐতিহ্যানুগ হলেও বিস্তর মিথ প্রয়োগে প্রতিটি পংক্তি বিশ্বাস আর আস্থার সূত্রে গাথা। কার্যত মিথ প্রয়োগ কোনো আরোপিত বা অনুসরিত বিষয় নয়। একপ্রকার প্রবহমান চিন্তার ভেতরেই তা নিঃশ্বাসবায়ুর মতো চলমান। আখ্যানের সততা ও যুক্তির জন্য সেটি গৃহীত। মিথ চিন্তায় 'ইমেজ' আছে। সে ইমেজ বৃহৎ ও ব্যাপক, অনেক বেশি প্রত্নমুখি চলকের দানে তা সংঘবদ্ধ। বয়ে আনে চিরজীবিতের প্রাণশক্তি। এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-অনুগ্রহ-সংশয়-অনুমান-আক্ষেপ-সমর্পণ সবকিছুই পুরাণের পরণকথা। *খোয়াবনামায়* তা অনেক বেশি নিরীক্ষিত ও চরম সত্যে আরোপিত, অস্থির। পুরাণের এ রূপটি কৌম-সংস্কৃতিধৃত। অবশ্যই কৌম সমাজে দ্বন্দ্ব আছে। দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে সে সম্মুখে চলে। এর গ্রহণ-বর্জনও যে কম, তা নয়। আর প্রতিপাদ্য মিথটি এ সমাজের চলৎশক্তি। তা স্বতঃস্ফূর্ততায় গৃহীত। জীবনের প্রাত্যহিক উপকরণ বা ঔপাদানিক চিন্তা-দর্শনের সঙ্গে তা যুক্ত। কুলসুম নারী হিসেবে কন্যা-জায়া-জননী। নামহীন তমিজের বাপ তাকে কিছুই দিতে পারেনি। প্রাত্যাহিক জীবনের সংস্রবে সুখ-আনন্দ-শান্তির জৈবিক চাহিদা সম্পর্কে সে ছিল উদাসীন। এই ঔদাসীন্যের ভেতর চলতি জীবন-সংসার বা ক্রিয়াকার্য বিবরণীতে যে অনর্থ আয়-ব্যয় তাতে মিশে থাকে ন্যূব্জ ও অসন্তোষের বেদনা। তমিজ সেটি নানাভাবে পূরণ করে। প্রচলিত রীতির কারণে তা নিয়ে সৎমায়ের সংসারে সন্দেহ আছে, কিন্তু বাঁচার জন্য জীবন প্রবাহের যে অনিরুদ্ধ তরঙ্গ তা অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে। প্রকৃতির উপযোগও তাতে অপচয় নয়, ইন্ধনই যোগায়।

www.chinmofoundation.org

সুতরাং সামগ্রিক পরিবেশটি চলমান নিগূঢ় বিশ্বাসে রচিত। পুরাণ-কাঠামোটি তাতে সংবদ্ধ। ফর্মের সে আয়োজন বা উপভোগ্য কাঁচামালটুকু দৃষ্টান্তে এনেছি উপর্যুক্ত পংক্তিতে। বিবৃত ঊর্ধ্বকমার চরিত পুরাণস্থিত। কিন্তু দৈনন্দিনতার ভেতরে যে পুরাণস্রোত তা পরতে পরতে প্রকাশ্য। কুলসুমের স্বামী তমিজের বাপের ঔদাসীন্যে সংসারের গৃহস্থালি কৃত্য কিংবা আবেগ-অনুরাগের ভেতরের স্পন্দন প্রতিবেষ্টিত প্রকৃতিতে স্বভাবমতই ধৃত হয়। শরম-লজ্জা-সংস্কার ছেড়ে কুলসুমের সঙ্গে তমিজের শারীরিক সংসর্গ পৌরাণিক অনিবার্যতারই দ্যেতনা। শুধু জৈবিকবৃত্তি নয়, আহার-অন্ন-কর্ম-কুণ্ঠায় সে হয়ে পড়ে বিপরীত লিঙ্গের অনুবর্তী। কর্মানুষঙ্গেও তার দায়টি রক্ষিত। প্রকৃতির প্রতিবেশও অনুগ্রহদাত্রী। পুরাণমহিমা সেখানে কৃশ নয়। যথাবিহিত। তমিজের বাপের উদাসীনতাও এর কার্যক্রিয়ার অন্যতম কারণ। আবার তমিজের বাপের উদাসীন চিন্তাপ্রসূন নির্মাণ করেছে আরেকটি মিথ। যে মুনসির সন্ধান সে করে তা বায়ুচারি হলেও স্বপ্নপ্রবণ এ মানুষটির বিবেচনা বা বিশ্বাসমুকুরে মনভোলা অতিথি মেঘ-বিল-পুকুর-পাকুড়গাছ-বাঘাড় প্রভৃতি। এতে জনবসতির স্বরূপ ধরা পড়ে। নিত্যজীবনাগ্রহের স্মৃতিতে আটকে পড়ে পুরাণ-মানুষ। সে বিল সরে যাওয়া, পেছনে আরও পেছনে– একসময় শেষ থেকে নিঃশেষ– অধীকৃত এ অংশ কার দখলে। কর্তৃত্ব কার? শরাফত বা পরে হয়ে ওঠা কাদের-আজিজ, দলিল-প্রমাণ ছাড়া পেশীশক্তির অধীনতা গ্রহণ। বিল দখল, ভূমি দখল, দখলীমাটিতে মিল-কারখানা স্থাপন। সেই বিলে একসময়ের পাকুড় আর বাঘাড় নিয়ে তমিজের বাপ ব্যস্ত হয়ে পড়লে– সে ইতিহাস-পুরাণের প্রত্নদর্শনে প্রতীকী মিথে পরিণত হয়। মুনসীর খোঁজ তার চাই, এ মুনসী বিরতিহীনভাবে তাকে টানে, হৃৎটানে তুলে নেয়, জগতের সকল অধীনতা বা অধিকারের বাইরে নিয়ে চলে। সে বিবাগী-বেভুলো। অন্তরায় তার জগৎসংসার। চরিত্রটি অনুক্ত, প্রতিপাদ্যহীন, অনুপযুক্ত, উপযোগহীন। ফলে সে সংসারঘরে দিনরাতসময়হীন। যখন-তখন সে বেরিয়ে পড়ে, ধ্বনিহীন-অব্যক্ত-অনুচ্চ স্বরে। এটি এভাবে সময়সাক্ষ্যে পৌরাণিক আখ্যার যুক্তিতে তুলে নিলে চিনে ফেলা যায় এই জনপদে পেশীশক্তি তথা ধনবাদের জন্মপরিচয় সংজ্ঞার্থ। ভূগোল পাল্টায়, পেশা বদলায়, শ্রমিক শ্রেণি সৃষ্টি হয়, শ্রমশোষণ চলে, শরাফত গংদের শহরে বাড়ি হয়, গাড়ি আসে বৈদ্যি আসে, কর্পোরেট সুবিধা হাতে নিয়ে একপ্রকার অধ্যাত্মশক্তিকেও ক্রয় করে ফেলে, তমিজের বাপ রুহানী শক্তি জাহির করে, ভ্রান্ত প্রতিপাদ্যে সে হয়ে ওঠে ধনিক বাড়ির তোয়াজ ও অনুগ্রহের ছাচে প্রভুপ্রতিম ব্যক্তি। তাতে এর পৌরাণিক বিভাটুকু আরও বিস্তৃতি অর্জন করে। আমৃত্যু তা গিরিরডাঙা গ্রামে প্রতিনিধিত্ব করে। অলৌকিক প্রতীভূ বনে গেলে তমিজের বাপ একই মেজাজে অপরিবর্তনীয় রূপে একদিন উধাও, মৃত্যুতে

www.chinafoundation.org

আসীন। কিন্তু প্রভাব রয়ে যায়– ওই বাড়িতে বা বাড়ির মানুষদের ওপর। পুরাণশক্তির সারমর্মে শুধু তমিজের বাপ নয় কেরামত বা বৈকুণ্ঠও আছে। সে প্রতিবিধান পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। তাই পুরাণের পরণকথা *খোয়াবনামা*র ভেতরে অমোঘ শক্তি যা বহুভঙ্গিমায় অনেকান্ত।

ইতিহাসের পরের কথা

ইতিহাস বয়ান তো উপন্যাসকারের কাজ নয়। কিন্তু ইতিহাসকে তিনি গ্রহণ করেন তার উদ্দিষ্ট শিল্পের আনুকূল্যে। এবং তা উত্তর-প্রজন্মের দায়ে। উপন্যাসকারের আখ্যানটি অমোঘ ও কালান্তরের প্রতিবিধানরূপে পাঠ্য। '*খোয়াবনামা* স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন দেখা মানুষ'– কীসের স্বপ্ন? বাঁচার, বেঁচে থাকার রপ্ত সংগ্রামে বাঁচার, বাঁচার পথ চিনে নেওয়ার পথ, বাঁচার ইতিহাস ধারণ করে এগুনো, বাঁচতে চাওয়া দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে সম্মুখে চলা, বাঁচা মানে অস্তিত্ব ও মর্যাদার পুরাণটি রপ্ত করা। এতেই উক্ত স্বপ্নটি সংগ্রথিত। অতঃপর প্রোথিত তার জীবনস্বপ্ন। ইতিহাসটি ওই অন্তঃস্তলে। ইতিকথার সারাৎসারটি সে মর্মবিন্দুতে। ওই তার-টি কে? ব্যক্তি। সে ব্যক্তিই তো ইতিহাস। চিরপরিচিত ইতিহাস। *খোয়াবনামা*য় ইতিহাস বা রাজনীতি দুটোরই স্থনাঙ্ক চিহ্নিত ও পরিজ্ঞাত। 'সেই কবেকার কথা... সোভান ধুমা...' তাতেই এ জীবনের লক্ষ্যগাথা নির্ণীত নয়, বরঞ্চ রচিত হয় অনন্ত পথরেখা। জীবনের-সংগ্রামের-প্রতিষ্ঠার। এবং ওই ব্যক্তির ভেতর-অভিমুখে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, দুর্বহ সংকট, উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, আশরাফ-আতরাফ, হিন্দু-মুসলমান, কালো-সাদা বিচিত্রতা এ পৃথিবীর স্বর। কিন্তু বাঁচার পর্যায়ে ক্ষাত্রশক্তি কায়েমী হয়ে উঠলে ভেদ বাড়ে, সৃষ্টি হয় বিভেদ। প্রভু-দাস, অধীন-পরাধীন, কর্তৃত্ব-সমর্পিত দ্বৈত বিপরীতাত্মক তত্ত্বটি চলমান চিন্তা-ইতিহাসে আরোপিত ও অবধরিত হয়ে পড়ে। বস্তুত এর মূলে আসলে ক্ষমতা ও পুঁজির মনস্তত্ত্ব। এ পর্যায়ে *খোয়াবনামা*র আখ্যানে হিন্দু-মুসলমান, কলু-মাঝি, মালিক-শ্রমিক মনস্তত্ত্বটি প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। এতে রাজনৈতিক মর্জিটি পর্যাপ্তরূপে গুরুত্ব পায়। গৃহীত হয় উপনিবেশ-বৃত্তের রাজনীতির উত্তরাধিকার। 'ডিভাইড এন্ড রুল', সাম্প্রদায়িকতা যার উৎসমূল। তার সঙ্গে এ উপমহাদেশীয় কৌম-কাঠামোভুক্ত সমাজের কৃষ্টি-কুসংস্কার-সংস্কার-রিচুয়াল যুক্ত করা। বর্ণভিত্তিক সমাজ কাঠামোয় ছোঁয়াছুঁয়ির ভেদ পুঁজি করে দুরভিসন্ধি আঁটে– ওই উপনিবেশবাদী-তন্ত্রে। তাতে বিচ্ছিন্নতা বাড়ে, ঐক্য ভেঙে যায়, আলাদা হয় সকলি। বঙ্গীয় জনপদে জমিদারী সামন্ত ব্যবস্থা শেষ, হিন্দু জমিদার দেশ ছাড়ে, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে অন্য ধর্ম-বর্ণের মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণিতে পরিণত হয়। প্রতিনিয়ত মানবতার ইতিহাস পাল্টায়। ধর্ম রক্ষিত হয় রক্ষণশীল আচারনিষ্ঠ ধার্মিকের ঘরে। বিবেকের বদলে ধর্মতন্ত্র

www.chinnofoundation.org

কায়েমী হয়ে ওঠে। প্রচল প্রথা আর গৎবাঁধা সনাতন রীতিই ধর্ম-রাজনীতির লক্ষ্য। বর্ণভিত্তিক সমাজের নিশ্চল তিমির হননের কাল পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোতে আরও দুর্বহ হয়ে ওঠে। উপন্যাসে বৈকুণ্ঠ কিংবা দশরথ কর্মকার খুন হয় প্রতিপক্ষের হাতে। সাম্প্রদায়িকতার দাবানলে তারা হত, মৃত্যুর পর ওই চরিত্রের কাহিনি স্থির হয়ে পড়ে। জীবনের মূল্য বাধা পড়ে ধর্মের গোড়ায়। সাম্প্রদায়িকতার আড়ালে ওদের সম্পত্তি হরণ যেন শোষণের এক নিপুণ দণ্ডচিত্র– যার দায় রাষ্ট্রের, কিন্তু রাষ্ট্র আইন-আদালতের মারপ্যাঁচে আটকানো। *খোয়াবনামা* মানুষের ম্যাজিক ইতিহাস যেমন পুনর্নির্মিত করে তেমনি রাজনীতির নিষ্ঠুর বলিচিত্রও তুলে ধরে। এটি একটি অবিশ্বাস্য কিন্তু বাস্তব ইতিহাস! যার ভেতরে প্রোথিত নিরাপরাধ মানুষ। এছাড়া এতে আর একটি অনন্য দিক তেভাগা-মনস্তত্ব। তমিজ যেখানে কেন্দ্র। শহর আর গ্রামের কিংবা কেন্দ্র আর প্রান্তের মানুষের আশা আশ্বাস কোন্ তারে বাধা সেটি 'ডমিনেট' শব্দে আকর্ষণীয় মাত্রায় আখ্যানে উৎকীর্ণ হয়। কাহিনিতে আবদুল আজিজ, আবদুল কাদের তেভাগার আশ্বাসে আপ্লুত করে কিন্তু তেভাগা কায়েম হয় না। তমিজ ব্যর্থ মনোরথে জীবনের সমস্ত আয়োজন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে, রাষ্ট্রের বানানো আইনে সে হয় ফেরারি। উপন্যাসটি বিচিত্র রঙে আঁকা হয়ে ওঠে প্রান্তিক তমিজ আর তার ব্যবচ্ছেদ-উত্তর সংগ্রামের দুর্বহ জীবনবীক্ষণে। ব্যক্তিটির বিকাশ-পরিণতি, স্বপ্ন-আনন্দ প্রাণবন্ত যেমন তেমনি তার শেষ দৃশ্যে যে হতাশার চিত্র তাতে ভেঙ্গে যায় পাকিস্তানের স্বপ্ন। ইতিহাসের পরের কথায় আর্থ-সামাজিক শোষণ-কাঠামোর ভেতরের ব্যক্তির সুস্থভাবে শ্রমীরূপে বাঁচার স্বপ্নটুকু অপহৃত হয়। বিপরীতে মিথ্যার বেসাতির সৌধে গড়া অপ-রাজনীতির সংস্কৃতি হয় দৃঢ়বদ্ধ, উচ্চবিত্তের স্বার্থ রক্ষা পায় কিন্তু শ্রম-আকাঙ্ক্ষী, শ্রমী মানুষ মূল্য পায় না এ প্রতিক্রিয়াশীল উপনিবেশ-আদৃত সমাজে। রাষ্ট্রের এ চিহ্নিত রূপ অবলোকন প্রয়াসই তো উপন্যাসের কাজ। ফর্মের ধরণে সেটি নান্দনিক আখ্যা অর্জনে সক্ষম হয়। *খোয়াবনামায়* উত্তর-উপনিবেশ রাষ্ট্রে শোষণ বন্ধ হয় না। জমিদারের বিরুদ্ধে জমির অধিকার কায়েমের ইতিহাস ন্যায্য পথে থাকে না। প্রতিশ্রুতি, প্রত্যাশা, আশা-স্বপ্ন-কল্পনা অবাস্তব রয়ে যায়। জমির অধিকার, তেভাগা কায়েম, শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা রাজনৈতিক নেতাদের মুখের বাণীরূপে প্রচার চলে, আশ্বাস আসে বৃটিশ চলে গেলে, উপনিবেশ শেষ হলে, স্বরাজ কায়েম হবে। তখন তমিজের মতো মজুর-কৃষক ন্যায্য মজুরি পাবে, মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবে। কিন্তু হয়নি। তমিজের তেভাগা পাকিস্তানে কায়েম হয়নি। আবার সে আন্দোলনে নেমেছে, এদেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে। শ্রেণিস্বার্থের ইতিহাস তাই। কিন্তু তার পরের কথা কী? উপন্যাসে যে ইতিকথা রচিত হয় তার পরের কথা কী? তমিজ-ফুলজান-কুলসুম

www.chimofoundation.org

যে প্রকৃতিতে বেঁচে থাকে সংগ্রাম করে– তার ভেতর থেকেই আজিজ, কাদের, কালামমাঝি বুর্জোয়া রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করে উচ্ছিষ্টের ভাগ পেয়ে কর্তৃত্ব গ্রামে শুরু করে। আলাদা মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠে। আন্তঃসম্পর্কের প্রান্তগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষমতার মৌরসীপাট্টায় তারাই হয়ে জনসমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এ পর্যায়ে সাহিত্যকার যে গ্রাম-ইতিহাস তুলে আনেন, স্মৃতিতে যে যৌথ জীবনব্যবস্থার ইতিহাস বয়ান করেন তা ক্রম-পুঁজির হাতবদলে স্বরূপ পাল্টায়। মনস্তত্ত্ব বদলায়। জীবনের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। ব্যক্তির ভেতরের ক্ষত বাড়ে। অস্তিত্বশূন্য হয়ে পড়ে। পুঁজির এ অনচ্ছ-অজাচার কর্তৃত্বের যে দণ্ড হাতে তুলে নেয় প্রাত্যহিক জীবনে তার গটে অপপ্রয়োগ। ফলে তমিজ ও তার পরিবার অনিশ্চয়তার মধ্যেই রয়ে যায়। যে ভুইফোঁড় নেতার আদেশ-আশ্বাসে সে তেভাগার ন্যায্য আইনের কথা ভেবেছে, জমিদারী-কর্তৃত্ব অবসানের ভেতর দিয়ে শ্রম-অধিকার কায়েমের স্বপ্ন দেখেছে তা প্রলম্বিত হয়নি, পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিড় ধরেছে। এ ইতিকথার পরের কথায় আমরা নতুন স্বপ্নের রাষ্ট্রের পরিসংখ্যানে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিশক্তিকেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেখি। বহির্বিশ্বের রাজনীতিতে যে শক্তি তৃতীয় বিশ্বের অধীনস্থ তার কেন্দ্রে আছে ওই উচ্ছিষ্টভোগী শ্রেণি। কার্যত, কর্পোরেট প্রতীভূদেরই আদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করে এদেশীয় শ্রেণিশক্তি। দৈশিক স্বার্থ কানাকড়ির দামে বিকিয়ে স্বার্থবুদ্ধির শেরপা অক্ষুণ্ন রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে আর্থনীতিক স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করছে। সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্ব, পারস্পরিক ভেদ-বিভেদ স্বাধীন দেশে বেড়েছে। ভোগলিপ্সু, পণ্যবৃত্তি, কর্পোরেট দালাল বৃদ্ধি পেয়ে চলছে, বিপরীতে প্রান্তিক ও নিঃস্ব মানুষের কাফেলা ঊর্ধ্বমুখী রেখাচিত্রে পৌঁছে গেছে। খোয়াবনামা সার্বিক জীবনচিত্রের এক অন্তর্বয়ন। চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে বিচিত্র পেশা-শ্রেণির মানুষের মন আবার একই সঙ্গে পারস্পরিক সংঘাত সংঘর্ষের স্বরূপও নির্ণয় করা হয়েছে। এজন্য নির্ধারিত ফর্মেরও আবিষ্করন ঘটেছে উপন্যাসে। প্রসঙ্গত, বক্ষ্যমান উপন্যাসের কোনো চরিত্রই ইতিহাস-ঐতিহ্য-কিংবদন্তী-পুরাণের বাইরের নয়, প্রত্যেকের বিধৃত জীবন এক শাশ্বত স্বপ্নে বাঁধা। কিন্তু সেই স্বপ্নের মুক্তি কোথায়? আর মুক্তির পথই বা-কি! তাই নির্ণীত হওয়ার দায় কিংবা তার ভেতরের সংগ্রামের অনিবার্যতার প্রেক্ষাপট আকর এ প্রত্ন-আখ্যান। ৪৬র দাঙ্গার পটচিত্র বা অনতি-নবরাষ্ট্র উন্মেষকাল হয়তো এর কালখণ্ড কিন্তু রূপান্তরের যে সময়স্বরূপ মানুষ ও তার শ্রেণি-পেশা-বৃত্তির ভেতর দিয়ে নির্ধারিত হয়েছে তা একালের পণ্যায়ণের যুগেরও অবয়বপ্রতিম অন্বিষ্ট। আর মানব চরিত্রের মানসভূমে যে ধর্ম-পুরাণ-কিংবদন্তীর প্রত্নমুখ জলতলে স্পন্দিত– তা এ ভৌগোলিক কাঠামোর প্যাশন ও প্রেমধর্ম। তবে সেটিও স্থির নয়, গতি-তরঙ্গে বেগবান। এরূপ ফ্রেমবন্দী আখতারুজ্জামানের শেষ

www.chinnofoundation.org

উপন্যাসটি। পুনর্পঠনের ক্ষেত্রে লাভ হয় এর দর্পিত সত্যচিত্রে, যেটি বাংলাদেশের সমাজকাঠামোর নীরব সত্য। পাঠে-পুনঃপাঠে ফিরি ইত্যাকার বিভূতিময় সত্য-মনস্তত্ত্বে কিন্তু দ্বন্দ্ব তো চলবেই; তমিজদের স্বপ্ন ফিরিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন আর তার বিপরীতে কর্পোরেট ক্রুদ্ধ-কাতর কণ্ঠের অমোঘ অট্টহাস্যে। সুতরাং *খোয়াবনামা*র পুনর্পাঠ চলবেই, আখ্যানের নবায়ণ-রেখায়; কর্মনাশা কথাচ্ছলে নয়, নির্মম বাস্তবের অমসৃণ পীঠে।

www.chinnofoundation.org

সাবিত্রী উপাখ্যান : পন্থা ও পরিণাম

১.১

উপন্যাসরচনায় কথক থাকেন। কথক কখনো-কখনো সর্বজ্ঞ (Omniscient observer)। কখনোবা নন, কথকই চরিত্রকে দিয়ে বলায়– 'আমি লেখক। আমি সর্বজ্ঞ'। এ সূত্রে কাহিনিও কখনো ঘটনাপ্রধান হয়, কখনোবা চরিত্রপ্রধান। *সাবিত্রী উপাখ্যান* নিশ্চয়ই চরিত্রপ্রধান, কথকও সর্বজ্ঞ– ওই লেখকই তা বলেছেন। লেখক বলে চলেন 'সাবিত্রী-কথা'। সাবিত্রী আখ্যান-কেন্দ্রে (pivotal point in the monologue, as the direction of thought turns from unworthy or unsuitable considerations or feelings to worthy or suitable ones)। তাকে ঘিরে আছে পুরুষময় কিছু পুরুষ– আর তাদের নিয়ন্ত্রিত (oppressors-oppressed distinction), স্বশাসিত সমাজ– 'exploitation refers to social relations where an 'actor or character of actors uses others for their own end and because of a fundamentally asymmetric power relatioship between them" শ্রেণি-পরিচয়, বর্ণ-পরিচয় মিলিয়ে সমাজের মর্যাদাও তাদের মতো করেই গড়া, তাদের হাতেই তৈরি। আলো-অন্ধকারও সৃষ্টি করেন তারাই। সমাজ ও স্বকাল ওই চরিত্রটিকে সুখ-অসুখ, আঘাত-অপবাদ, আলো-অন্ধকার গড়িয়ে মিশেল করে। মর্ত্যের বিচিত্র স্বাদ-আহ্লাদ ক্রিয়াশীল হয়। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও। সাবিত্রীর পরিবেষ্টনে অনেক পুরুষ। মনের বাইরে শরীর-দেহ যাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সেরূপ সংবাদও তৈরি হয়, এলাকায় এলাকায়– অঞ্চলে অঞ্চলে, তল্লাটে তল্লাটে। বিপর্যস্ততা অথবা সমর্পণের শর্ত-সীমানাও সেভাবে ঠিক হয়– ওই 'মানুষ'টির জীবনে। নারীও মানুষ– সেটি বিধৃত অঞ্চলে বা গ্রামে ঠিক চলনসই নয়। রিচ্যুয়ালে তা নেই। সমাজেও নেই। শুধু তার শরীর প্রত্ন-সম্পন্ন। কারণ, ওতে ইন্দ্রিয়সুখ মেটাতে পারে পুরুষ-সম্প্রদায়। এই পুরুষরূপী সমাজ, আদিম সমাজ, আলোহীন সমাজ, ইতিহাসে-ঐতিহ্যে ভরা সমাজ গড়ে ওঠে সাবিত্রীকে কেন্দ্র করে। হাসান আজিজুল হকের উপন্যাস *সাবিত্রী উপাখ্যান*। সাবিত্রীই প্রধান, তাকে ঘিরেই ক্ষরিত উপনিবেশ-উত্তর সমাজ নির্মিত। প্রসঙ্গত, এখানে চলতি অনেক তত্ত্বের ভেতর দিয়ে এই উপন্যাসটি দেখা যায়। যদিও তত্ত্ব ভারাক্রান্ত করা নয়, বরং বক্ষ্যমান কাহিনিই বলে দেবে কোন তত্ত্বটি এতে পরিগৃহীত হয়েছে। তাই যে দৃষ্টিকোণেই এ পাঠ হোক সাবিত্রী-কাহিনিই সর্ব-অনুষঙ্গের অকুস্থল। আর সে লক্ষ্যেই তার ডিকনস্ট্রাকশন তত্ত্ব ধারণায় 'ডেথ অব অথারে'র পরিণাম ও পন্থা নির্ধারণ হতে পারে।

১.২

www.chirnofoundation.org

উপন্যাসে কাহিনি-ভূগোলে নির্ধারিত নিয়মমাফিক প্রথা, প্রচল রূপ ওই চরিত্রকে নিয়েই আশা-উচ্চাশা সংকীর্ণ সংকুচিত পথনির্দেশ করে। সে প্রথার নাম– সমর্পিত, অনুশাসনমান্য ও স্বীকৃত তাবৎ– যা প্রথানুবর্তী সকলই। কী নিশ্চুপ ছায়াবৃত তখন ওইসব গ্রামের নাম [শ্রীকৃষ্ণপুর, চৈতন্যপুর, বেলগ্রাম, ধানকুঞ্জি]। কিন্তু খুব কঠোর অনুশাসনের শক্ত তারে সবটুকু বাঁধা, ছিঁড়তে গেলেই গড়ে ওঠে প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জ। সাবিত্রী সেখানে নিষ্পাপ, নির্বিবাদী, অবুঝ-প্রতিক্রিয়াহীন– কিন্তু কাহিনির এক পর্যায়ে সে পরিবর্তিত হয়ে ওঠে, পরিবর্তনে রূপান্তরের দাগ ওঠে মনে– তখন সে বিরক্ত ও অশান্ত [শহরের তথাকথিত ভদ্রলোকী চাল নেই বলে ঠিক বিব্রতকর বলা যায় না], পরে পেটানো প্রতিরোধে গড়া। সেটি গড়ে ওঠা চাই-ই যেন, বিশেষত হাসান আজিজুল হকের উপন্যাসে। হাসান আজিজুল হকের ভাষাও তাই বলে। কারণ, সে রূপই তাঁর উপন্যাসের প্রত্যাশা। ক্রিস্টোফার কডওয়েল, গিওর্গী লুকাস প্রমুখ বলেন, প্রতিরোধটুকু চাই– যা সমাজ পরিবর্তন কিংবা শ্রেণি-কাঠামোর বৃত্তে গড়া। উৎপাদন-সম্পর্কের সূত্রও সেখানেই। চেনা যায় তখন, স্বরূপ-অন্বেষণ ঘটে সে প্রকারে। পার্থক্য বোঝা যায়। ছোট-বড়, উঁচু-নীচু সমাজে-মর্যাদায়– আর সেখানেই শক্তি ও ক্ষমতায়নও সংযুক্ত। রাষ্ট্রের আইন-শাসন-বিচারও সে মাফিক। হাসান আজিজুল হক সবটুকু গেঁথে ফেলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর বিস্তর অসঙ্গতির বিস্তার রচনা করেন। ব্যক্তি-মানুষের কার্যকারণের অভিপ্রায়ে। বিবেচনাবোধের আলোকসম্পাতে, নিমিত্ত তাঁর কাণ্ডজ্ঞানের দর্শন। কিন্তু সাবিত্রী কী একা পারে? সাবিত্রীর বিপরীতে যে চরিত্রগুলো আছে সেগুলো ছাঁচ আছে। এক নিয়মে ঠিক গড়া নয়। লেখক যে ওদের প্রতিপক্ষ করে গড়েছেন তাও নয়। নিরেট মন্দও নয়, ভালোও নয়। ঠিক উপন্যাসের চরিত্র যেমনটা তেমনই। উপন্যাস তো শুধু কাহিনি নয় বা চরিত্র নির্মাণও নয়– এতে সমাজ-দর্শন থাকে, কাল পেরিয়ে তা যুগান্তরের বার্তা বহন করে প্রজন্মান্তরের অভিমুখে। সমালোচকগণ তাই বলেন। আর 'ডেথ অব অথার' কথাটা তো আরও সত্য। সেটি কালগুণে-দিনগুণে পাঠকের কাছে কতো ব্যাখ্যা নেবে– তার সীমাসংখ্যা নেই। সে প্রশ্নটুকু ওই লেখকের ভাষ্যে বিবৃত ও অর্জিতও। যা হোক, এখানে প্রতিজিজ্ঞাসা যে, সাবিত্রী তো প্রতিকূলতায় থাকে। আহারে-বিহারে-চলনে-বলনে কিংবা করায়-চলায়, কখনোবা নিজেই নিজের শত্রু, প্রতিপক্ষও। 'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরি'– বিপদেই থাকে। পরে তো ইচ্ছাবিরুদ্ধ আপত্তিকর পরিবেশে সর্ব ধর্ষণের পর ধর্ষণে প্রাণহীন 'মরায়' পরিণত করে তোলে সবকিছু– পরিবেশকেও। সব যেন উঠে-পড়ে লাগে– 'কুলাঙ্গারের দল'। সব 'পুরুষ'শক্তিতে বাধা। পুরুষের চোখে নারী। আবার নারীর চোখেও নারী। কী যে অমানিষা! চতুর্দিকে ঘোরাল অন্ধকারময়– আঁধার। এ লক্ষ্যে প্রস্তুত লোকেশান।

www.shuno foundation.org

তাইতো তা বাস্তববাদী উপন্যাস। তবে তার উল্টোপীঠে তো রাজনীতিও আছে। জীবনের গভীরতম ও অপ্রত্যাশিত সত্য চকিত উদ্ভাসনে সত্যসন্ধ। নির্মিত ওই উপনিবেশের গ্যাড়াকল। উপনিবেশিতের মন। শাসকের থানা-আইন-পুলিশ সে লক্ষ্যেই ক্রিয়াকর। তবে এও প্রশ্ন, বাস্তববাদ কোনো উপন্যাসের পূর্ণ সত্য নয়। রাজনীতিকও নয়। আবার উভয়েই সম্ভবপরতার সত্যে নিহিত। *সাবিত্রী উপাখ্যান* সে লক্ষ্যেই পাঠযোগ্য বিবেচ্য।

১.৩

সাবিত্রী 'কুলটা'। মনে আসে, রোহিনী-বিনোদিনী-কিরণময়ী-কুসুম-জমিলা-সখিনা-জারুনার মা-ফুলজান-সাবিত্রী জীবনের ধারাপাতের ধারা। কতোটা এগিয়েছে সমাজ? নারীর মূল্য সমাজে কেমন? হাসান আজিজুল হক ধরে নেন এ পরিবর্তন ধারা সমাজসূত্রে কতোটা! আদৌ কী স্বীয়-মন অধিকৃত নারী মানুষ গণ্য হয়েছে। উল্লিখিত চরিত্রই তো সময়। পুরুষ রক্তচক্ষুতে তা কতোটা শোধন হয়েছে। আঘাতে কী উন্মত্ত নয়? সবাই মিলে শকুনের দলের মতো শোষকের ভাগাড়ে একপংক্তিতে বসে দেহ শুকতে থাকে কেন? উঠে দাঁড়ালেই যেন তিলক এঁটে দেবে। ওসব আবার সবার সম্মুখেই বয়ে বেড়াতে হয়, প্রাণধারা বহে যতোকাল! আর চুপকথার নানা ব্যঙ্গও তো আছে। *সাবিত্রী উপাখ্যানে* 'কালচার অব সাইলেন্স' অনেক কথা বলে। ব্রাজিলিয়ান তাত্ত্বিক ফ্রেইরির 'সাইলেন্স তত্ত্ব' : 'the system of dominant social relations creates a 'culture of silence' that instills a negative, silenced and supressed self-image into the oppressed'। সেটিই ঘরে-বাইরে সাপের ফোঁসফাঁস ধ্বনি করে। হুল ফোটানোর চেষ্টায় তৎপর থাকে। নির্মম সব ভয়াবহ প্রতিকূলতায় সাবিত্রী ['supressed self-image'] দাঁড়াবে কেমন করে? প্রতিবাদ করবে না? স্ব-অপমানের শোধ নেবে না কিংবা ফিরিয়ে আনবে না তার পুনরুদ্ধার করা মান-অপমান-সম্ভ্রমসমূহ– যেটা পরবর্তী সময়ে নারীরা সেই 'অনুকরণীয় ক্রিয়া'র পথ ধরে চলতে পারবে কিংবা মুক্তি পাবে, পূর্ণ-প্রাণে শ্বাস ফিরে পাবে, আস্থার আশ্বাসে বাঁচবে– অন্তত কিছুটা হলেও, সব বিপর্যয় সত্ত্বেও। বা নিতে পারবে নিজের আনন্দের ভার! তারই উত্তর পেতে চান লেখক। সেইটিই লেখকের দর্শন বা বার্তা। আর এমন ভাবনার মধ্যে পাঠক চিনে নেন বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ। ভঙ্গুর আধা-সামন্ত সমাজের বস্তাপচা বাসী জীবনের সারার্থ। সাবিত্রী উপাখ্যানের ভেতরে সবটুকু ধরে ফেলার অবকাশ আছে। চেনা যায়, ওরা কারা! কীরূপে কোন পর্যায়ে প্রোথিত বিষবৃক্ষের শেকড়। ভূমি-প্রান্ত-শোষণ বা প্রতিরোধের সংস্কৃতি কীরূপে স্বচ্ছ আলোকময় জীবনসজ্জার দর্পণে পেতে পারে ছায়া-কায়ার প্রতিরূপ, কীরূপে উত্তর-উপনিবেশ

www.shimfoundation.org

সংস্কৃতি পূর্ণতর দাঁড়াতে পারে, নিজের সবটুকু নিয়ে– নিজস্বতা ধরে সমুন্নত করে ইত্যাদি। ভেতরের ভাঙ্গন তাতে বুঝি পেরুনোর পথ বাতলে দেয়, মনের পাড় ভাঙ্গার শব্দ তাতে সমস্বরে উঠে আসে– আর শক্ত প্রতিরোধের জন্য, ঝড়ো হাওয়ার বিপরীতে নতুন অভিমুখের প্রসার ও প্রয়াসে গড়ে ওঠে সাবিত্রী নামের এই সন্নধ্য পথে– তাই ওর প্রতিপাদ্য এই দর্শনের উপাখ্যানরূপে। খুব অনিমেষ বার্তা নিয়ে এটি সমাগত। আগামীর ও একালের জন্য। বিন্দুমাত্র পরাজয় নয়, আবার সহজ জয়ও নয়, অনেককালের একক হাতের প্রতিবন্ধকতা পেরুনোর, অতিক্রমণের সম্ভাব্য অভিপ্রায় পুনর্গঠিত। গল্প যদি ঘটনাকে চায়, সে ঘটনা *সাবিত্রী উপাখ্যানের* হাতেই নির্মম। নির্ধারিত দর্শনে সেই চরিত্রায়ণ– ওই সকল প্রথান্ধকারের বিরুদ্ধে, সেইটিই তো মেসেজ!

২.১

লেখকের *শামুক* উপন্যাসের মতো এ ঘটনাটিও থার্টিজের, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের। মেলে আদালতের সাক্ষ্য। অনেকের সাক্ষ্য। তাই-ই প্লট-অনুসৃত কৌশল। খুব সন্তর্পণে কথক গেঁথে ফেলেন সচিত্র ঘটনা-রজ্জু। সেটি সাবিত্রীর মন, মুহূর্ত, বেদনা, স্বপ্ন-আনন্দ-কষ্ট-গ্লানি একদিকে যেমন দুর্মর করে তোলে তেমনি অন্যদিকে বটা-সবুর-দুর্গার পাশব-পৌরুষ প্রবৃত্তিত্রাস আচরণীয় সমাজের নির্গলিত তাপে সুদূরের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিনির্মিত। এটি নিছক কাহিনি নয়। 'নেচার অব মিনিং'রূপে ন্যারেটিভ। কার? পুনরুক্তি করি 'supressed self-image'র। তাই সে একাকী। একা। 'সাবিত্রীর চারপাশে সব একা। কেমন থেমে আছে। সাবিও একা হয়ে গেল।' কথাশিল্পীই তার প্রবক্তা। তখন প্রবক্তার দৃষ্টিকোণে, সাবিত্রীকে ঘিরে নির্ধারিত সমাজ ও সমাজের দ্বন্দ্ব কিংবা সাংস্কৃতিক অভিঘাতসমূহ আর মূল্যবোধের গভীরতর টানাপড়েন তৈরি হওয়া। তাইতো সাবিত্রী খুব সাধারণ, ব্রাহ্মণ কিন্তু শরীর-সোহাগী আর অভূতপূর্ব শারীরিক গড়ন। সুশ্রী, সৌন্দর্যময় প্রত্যঙ্গ। নিপুণও। মনোলোভা ও আকর্ষণীয় অন্যের [অপর/ পুরুষ/ 'বল'শালী পুরুষ/ 'ক্ষমতা'শালী পুরুষ] কাছে। বর্ণনার ভেতরেই কথক সে ইঙ্গিতটুকু গেথে দেন। গভীরে পুঁতে দেন তা– যা আখ্যানের চলৎশক্তি। সেটি সোজা, সরল একমুখো। বৃত্তাকার নয়। নিশিবালা বা হাড়িদিদির প্রশ্রয়-চ্যুত হলে 'একাকী হওয়া' সাবিত্রী নিজেকে নিরপেক্ষরূপে সমর্পন করে, মান্য করে স্বপ্নময় পুরুষ-স্বামীকে [দুকড়ি চট্টোপাধ্যায়]। এক অর্থে, তা যে শৃঙ্খল– সেটি কথক বিবেচনায় নেয় কিন্তু কথক-নিঃসৃত চরিত্র তা ঠিক বোঝে না, বোঝার শক্তি নেয় না– কারণ এ সমাজে তা যুক্তিসিদ্ধ নয়। সে লক্ষ্যেই আখ্যান-বর্ণিত ও বিধৃত। সে নিঙরানো সম্বল অনন্তটুকু দ্বিধাহীন দিয়ে দেয়। যে কোনো মূল্যে তা স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছে– তার

www.chinnofoundation.org

ধর্মমূল্যে। তাতেই অলক্ষুণে নিয়তি নির্বন্ধে বাঁধা পড়ে। 'অনেক চেষ্টায় দশটা টাকা জোগাড় করিয়া লোক মারফত পাঠাইলাম। বন্ধক অনন্ত ছাড়াইয়া লইও। কাহাকেও এসব কথা বলিও না। পৌষ মাসে বাড়ি আসিব'– তবে সবকিছু সঠিক ফলে নাই। অনন্ত ছাড়ানো যায় নি, সাবিত্রীকে পাওয়া যায় নি। ঠিক, যে পর্যায়ে কথক অনিমেষ সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন, তা সুরক্ষা হয় নি। দুকড়ির দৃষ্টি ফ্যাকাশে হয়েছে নলিন কেওটের মধ্যস্থতায়। ভূমিকা নেয়, তিনজন। উল্লিখিত সময়টা সুনির্দিষ্ট, ১৯৩৮ সালের ৮ নভেম্বর। তারপর বিস্তৃত ঘটনারাশি জড়ায়, স্তূপীকৃত হয় ছিন্ন ও কণ্টকীকৃত বিকট সব চিন্তাজালে। সাবিত্রীর জবানীতে মেলে : 'তেলা, বটকৃষ্ণ ও সবুর আমাকে মাটিছাড়া করিয়া লইয়া চলিল।' তার পর সময় বয়ে চলে। 'তরতাজা, ছটফটে, জ্যান্ত খাবার' অজয় পারের জঙ্গল অভিমুখে চলতে শুরু করলে একের পর এক যুক্ততার অশনি দানা ধারাবাহিকভাবে স্ফটিকস্বচ্ছতা পায় : 'দুর্গাপদ, সবুর, নলিন কেওট, বটকৃষ্ণ চক্রবর্তী, ধান্যগ্রামের সৈয়দ, বগুড়ার হুদা, বগুড়ার ধানকুঞ্জির মওলা বখশ এবং অন্যান্য' কেউ বিযুক্ত নয়। সাবিত্রীর বর্ণিত শরীরের সবটুকু পাশবপিণ্ডে পরিণত। এ পরিণতি ওই 'supressed self-image' গড়ায়। তবে এর পেছনের সমাজসত্যটি কী? কিংবা তার দার্শনিক ব্যাখ্যা? কথক তো শুধুই কাহিনি বলেন না। *সাবিত্রী উপাখ্যান* ফলে শুধু সাবিত্রীর আখ্যান নয়, সমাজ-দর্শন ও ভূমি-মানুষের ইতিহাসে পরিণতির ইঙ্গিত কিংবা তার দ্বান্দ্বিক পুনর্গঠনে আর্থ-সাংস্কৃতিক কাঠামোর রূপ বা আরও নির্বাচিত-মনস্তত্ত্বে তা এই ভূমি-মাতৃকার বীজাঙ্কুরে প্রতীকী সাবিত্রীর টোটেম-ট্যাবুর প্রত্নমায়ার প্রপঞ্চ– যা এক জনপদের চিরন্তন রিচ্যুয়ালে অনুষ্ঠিত। এভাবে পরখ করলে, সাত বছরের সাবিত্রী যখন ষোল-সতেরয় পৌঁছয়– তখন অপহরণের কাল, বলাৎকার, ছিন্ন-ভিন্ন শরীর বা মান-অপমান ও আঘাতের পর আঘাত নিয়ে বিচ্যুতিপ্রাপ্ত সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের সত্তা শূন্যতায় এক অবসেশন নিয়ে দাঁড়ায় নিজের শর্তে, পেতে চায় অনির্বাণ অনলমুখো প্রতিরোধের শক্তি। তাতে কথক মনোলগ এক অভিপ্রায়ে থমকে দাঁড়ায় এবং বিবৃত করে :

> সারা মুখে তার আঁকিবুকি, সেখানে কিছু জল আছে, কিছু কাজল আছে, কিছু সিঁদূর আছে, বলা যায় না। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সাবিত্রী, তিনদিকে তারা তিনজন, তিনটে ষণ্ডা শুয়োর। একমাত্র সাবিত্রীরই মাথা উঁচু, বাকিরা মাথা নামিয়ে আছে। ... দুর্গাপদরা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। সাবিত্রীর দিকে চেয়ে দেখারও সাহস পায় না তারা। তাদের শিশ্নগুলি একেবারে গর্তে ঢুকে পড়েছে। নিরেট তালাবদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারা! (পৃ. ৪২)

এতে কাহিনির জন্য কথকের নান্দনিক স্তরান্তরও আছে, আছে অতিক্রমের উদ্ভাস এবং অভিপ্রেত পর্যায়ও। যেহেতু সে 'does not belong merely to the

www.sumnofoundation.org

individual, rather it is shared by all'– তাই সাবিত্রীকে কার্যত এক পরিবেশে অনুস্যূত রেখে, সূক্ষ্মতর তরঙ্গে এগিয়ে নেওয়ার অভিমুখ তৈরি হয়। কী করে আত্মঅবমান ক্ষয়িষ্ণু অভিমুখ পাচ্ছে, একের পর এক খানা-খন্দ, নদী-জলাশয়, বন-জঙ্গল, ভূমি সমতল-অবতল পেরিয়ে শুষ্ক জীবন পাওয়া– তাকে নিরানন্দ গ্রহণ-বর্জন, কঠিন-নম্র পাদভারে নিরীক্ষণ, ভার ক্রমশ ভারাক্রান্ত– অতঃপর আরও অতিশয় তীব্র ও কঠোর ধর্ষিতা-জীবনের পারাবার– তার পীঠে আরও অন্য গল্পের রচনাক্ষেত্র। সেখানে নারী শুধুই এক শরীরে, পণ্যে, সবটুকু নিভন্ত– শুধুই বেঁচে থাকা যতোক্ষণ শরীরের তাপটুকু একের পর এক পুরুষ গ্রাসাচ্ছাদন করতে না পারে। এ এক চরম ধারাবিবরণী– রাত্রি-দিনের চলতিক্রমে। হাসান আজিজুল হক (কথক) স্থান-বিবরণী দেন, পরিবেশ তুলে ধরেন, শত্রু-মিত্র, পাপ-পুণ্য, ভয়-নির্ভয়ের চাঞ্চল্যের পারিপাট্যে। সেই পটভূমে কর্কশ জটাজালের ক্ষয়িষ্ণু বেদনাভারে পালাক্রমে ধর্ষিতার ওপর ধর্ষণক্রিয়া সুযোগ ও পরিবেশের যোগানে সংশ্লিষ্ট করা চলে। আমবাগান, খড়ের গাদা– একটু আড়াল হলেই দুগ্‌গা বা তেলার ও তৎ-স্যাঙ্গাতরা কাম চরিতার্থ করে। আর বটা তো কিছুটা পথ উন্মুক্ত পেলেই 'পণ্য'টি সুরক্ষার নামে শারীরিক দলন-মর্দনে আরক্ত– ওতেই শান্তি (কারণ ওর বেশি শারীরিক সামর্থ্য নেই), আর সবুর ধর্ষক-ধারায় মেয়েটিকে হাতে পেলেই স্থান-কাল (একরাত-দুরাত) খুঁজে নিয়ে, সব্বাইকে একরকমে মানিয়ে– নিজের কাম ও উদ্দীপনাকে চরিতার্থ করার যাবতীয় ব্যবস্থায় দৃঢ়তর। তারপর প্রয়োজনহীন সাবিত্রীকে অন্যের কাছে ছুঁড়ে ফেলা। সেটিরও বিবরণ পরিবেশের ভরাটচিহ্নের বর্ণনা। ন্যারেটর 'I-for-the-other' নিয়ে সর্বরকম বয়ানে সংযুক্ত, তাতে বিপরীত লক্ষণসমূহও যেন লক্ষ্যচ্যুত নয়। ভয়, আশঙ্কা, দ্বিধা নিয়ে মনস্তত্ত্বের স্তর সেখানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, থানা-পুলিশ-ইউনিয়ন বোর্ড বিস্তর রাজদণ্ডের মানদণ্ডে দৃশ্যমান। আখ্যানে বিচিত্র বিভঙ্গে তরঙ্গের দোলায় অবধারিত। এবং এর পরিবেষ্টনও নির্ধারিত 'চরিত্র'কে ঘিরে– যেহেতু নায়করূপে তার অধিষ্ঠান। শৈলিও তাই নির্দেশিত। উপন্যাসটির নামও সেই 'pivotal point'-এ– বস্তুত অকুস্থলেই তার বিবেকোচিত দর্শন। তাই এখানে কথক-অনুসৃত সাবিত্রী এক 'architectonic' মডেল– মানবমনের তিনটি উপাদানের প্রতিষ্ঠায় যা সম্পন্ন বলে মনে হয় :

> 'I-for-myself', 'I-for-the-other' and 'other for me'. The 'I-for-myself' is an unreliable source of identity and Bakhtin argues that it is the I-for-the-other through which human beings develop a sense of identity because it serves as an amalgamation of the way in which others view me. Conversely, other-for-me describes the way in which others

www.chinnofoundation.org

> incorporate my perceptions of them into their own identities. Identity, as Bakhtin describes it here, does not belong merely to the individual, rather it is shared by all.

এ সম্পৃক্ততা সত্তা-তত্ত্বের। কিন্তু সাবিত্রী 'supressed self-image' হলে তার 'পলিফোনিক' বার্তা অবশ্যই ফ্যাকাশে ও ধূসর। সেটি সবটুকু প্রতিরোধ নিয়েই নিরেট মানুষ-স্বরূপে উপাখ্যানে প্রতিষ্ঠিত। প্রকাশিত বার্তায় তার সে অভিপ্রায় ইঙ্গিত করেন লেখক। তাই তার 'infinite capablity, worth and the hidden soul' তো অস্বীকার করা যায় না! কারণ, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজে গ্রামগুলো অবিকশিত। গ্রামের প্রজা-মনস্তত্ত্ব ভূস্বামী-বর্জিত অস্তাচলগামী আলোর পরিত্যক্ত অপক্ষমতার আস্ফালন ও বিকারগ্রস্ততায় ভাঁড়ামিতে পূর্ণ। স্থানীয় সরকার প্রশাসন সমাজস্তরের মূলীভূত সংস্কার ও প্রথাগত মূল্যবোধে ব্যক্তিসত্তাকে অস্বীকার করে তার বিপরীতে সামন্ত-অপসৃত সংস্কার চাপিয়ে দেয় বৈষম্যগ্রস্ত সমাজের ওপর। সেখানে বৈষম্য বাড়ে, পুরুষের বিপরীতে নারী তুচ্ছ পণ্যে পরিণত হয়, বলদর্পী মুষ্টিমেয় মানুষের ভোগের সামগ্রীতে পর্যবসিত করে, আশা আর স্বপ্ন বিক্রি হয়ে যায় যে কোনো মূল্যে। নামসর্বস্ব (শিবানী/সাবিত্রী)। 'আমি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। খোঁজ নিতে এসেছি, গভ্‌মেন্টকে জানাতে হবে কাকে নিয়ে তুমি এসেছ'– এ রাজদণ্ড সাবিত্রীকে রক্ষা করতে পারে না। বরং সরকার ব্যবস্থার খবরদারি একপ্রকার ত্রাস তৈরি করে। সাবিত্রীর সমস্যা নিরসন বা নিরাপত্তার বাইরে এঁটে দেয় ধর্মীয় পোশাক। সেটি ভঙ্গুর সমাজে প্রকাশ্য হলে পুরুষতন্ত্র আরও শক্তি পায়, ভেতরে-বাইরে গুঞ্জন বাড়ে– আরও কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে সাবিত্রীর 'আই-আদার' সম্পর্ক। পরিত্রাণ নয়, বরং ধর্ষিত-লাঞ্ছিত-নিপীড়িত-মর্যাদাহীন সাবিত্রী ততোধিক সমস্যায় অধিকৃত হয়। তাতে জন্মপাপও নিষ্কৃতিহীন, অস্তিত্বহীনতার (unauthentic) চূড়ান্ত প্রকাশ :

> গাঁয়ে গাঁয়ে হিঁদু ভদ্দরলোকেরা লোকের মনে বিষ ছড়াচ্ছে। তোমরা তো মাথামোটা নেড়েজাত, শুধু জানো হোঁকামো করতে আর লাঠি আনতে। গভ্‌মেন্টের টোটা বন্দুক দেখেছ? এলাকায় হিঁদু-মোসলমান দাঙ্গা হয়ে যেতে পারে। ভদ্দরলোকেরা তাই চায়। ওরা শুধু ফন্দি-ফিকির খুঁজছে। ভালো একটা ফিকির বানিয়ে দিয়েছিস।

বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৈয়দ, বেলাত, হুদাসমেত এক ছোবলের ইতিবৃত্ত কলকাতা-বগুড়া রোডম্যাপে যুক্ত হলে সেখানে সাপ-বেজি প্রতীকী সারার্থ শিল্পের কাঠামোতে আর অব্যর্থ থাকে না। কার্যত, বেজির যা অনুধাবনের শক্তি আছে– মানুষের নেই। বিশ শতকের পৃথিবীতে এ অভিপ্রায় নির্ধারিত আছে জার্মান লেখক ফ্রাঞ্জ কাফকার উক্তিতে : 'Enclosed in my own four walls, I found myself as an immigrant imprisoned in a foreign country, ... I saw my family as

www.chintofoundation.org

strange aliens whose foreign customs, rites and very language defied comprehension,... though I did not want it, they forced me to participate in their bizarre rituals, ... I could not resist.' একইভাবে ক্যেমু (Albert Camus) বিশ্বযুদ্ধ-আক্রান্ত পৃথিবীতে *দ্য স্ট্র্যাঞ্জার* (১৯৪২) লিখে বলেন 'I only meant that the hero of my book is condemned because he does not play the game' সময়সূত্রে *সাবিত্রী উপাখ্যানে*র সমসাময়িক এ বৈশ্বিক পৃথিবীর 'ব্যক্তি'র 'Enclosed in my own four walls' অপরিচিত কিছু নয়। হাসান আজিজুল হক এই ব্যক্তিকেই এগিয়ে নেন, তাঁর কালের দৃষ্টিতে। এজন্য ব্যক্তি-বিরুদ্ধ চরিত্রটির বিপরীতে দাঁড়ানো সমাজ-রাষ্ট্র ও আইন-বিচার 'রক্ষক যেখানে ভক্ষক' সে প্রত্যয়টি নির্ধারিত দৃষ্টিকোণে (point of view) প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য তিনি প্রতীকী স্যাটায়ার ও বিদ্রূপকে তাৎপর্যময় অভিব্যঞ্জনা দেন : 'মরা সোসাইটিতে একটা তৈরি করা শুকনো গাছে যে অজগরটাকে জড়িয়ে রাখা হয়েছিল, সেটি এখন কুণ্ডলী পাকিয়ে চিড়িয়াখানার সরীসৃপ-লেখা ঘরটার কাচের ঘরের মধ্য থেকে ছাড়া পেয়ে এগিয়ে আসছে।' এই নিস্পন্দ সাবিত্রীর প্রতিপক্ষ। কে তাকে রক্ষা করবে? কথক বলেন :

> একমাত্র পুলিশই তাদের চরিত্র কোনোদিন বদলায়নি, নীতিরক্ষা করছে খুবই বিশ্বস্ততার সঙ্গে। সে হলো রক্ষকের ভক্ষক নীতি। পুরো উপনিবেশিক আমল জুড়ে তৈরি হয়েছে এই ঐতিহ্য, এখনও একই রকম বজায় আছে। গুরুদাসের বিবরণ থেকে জানা যায়, সাবিত্রী নিখোঁজ হবার মাসচারেকের মাথায় চোত মাসের শেষদিকে গুরুদাসের অভিযোগের ভিত্তিতে আর তারই সাহায্যেকলকাতার দুর্গাপদ দাঁ (তেলা) ধরা পড়ে। এই কথার পরেই গুরুদাসের সাক্ষ্য পরের বাক্যেই রয়েছে, কদিন পরেই সে ছাড়া পায়। এই মূল আসামি-টি ফের গ্রেফতার হয় বোধহয় সাবিত্রীর খোঁজ মেলার পরে। আমরা জানতে চাইছি উনুনের ওপর জলভর্তি হাঁড়ি আস্তে আস্তে ড়রম হয়ে ফুটতে শুরু করেছিল কবে থেকে? কত ডিগ্রি তাপ উঠল শেষ পর্যন্ত। সাঁইত্রিশ সালের পৌষ থেকে আটত্রিশের আশ্বিন-কার্তিক পর্যন্ত ন-দশ মাস ধরে যে সময়টায় সাবিত্রী নিখোঁজ ছিল সেই সময়টায় অসন্তোষ কতোটা ধুঁইয়ে উঠেছিল? জল কি শেষ পর্যন্ত টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছিল?

সাবিত্রী তখন ব্যক্তি শুধু নয়, তাকে ঘিরে সমাজ-রাষ্ট্রের সম্পৃক্ততায় তৈরি। বেরিয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং আরও সম্প্রসারণে শ্রেণিমর্যাদায় জমিদার-মহাজন বনাম প্রজাদ্বন্দ্ব, তৃতীয় দশকের উপনিবেশিক শাসনের আওতায় জাতীয়তাবাদ থেকে সাম্প্রদায়িকতার উদ্‌গীরণ এবং এর কার্যকারণ প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে উপন্যাসের উপাখ্যানে। তাতে সাবিত্রীই কেন্দ্র। কিন্তু ওই টগবগ করে ফোটা পানির গতিবিধি নিরূপিত হয়। কথক তার বাস্তব গুরুত্ব নির্ধারণ করেন। ফলে

www.chinnoroundation.org

সাবিত্রী কাহিনি আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে। পায় আরও শ্লেষাত্মক অনুরণন। যা এ উপন্যাসের শিল্পে যুক্ত করে নতুন মাত্রা। আর সে লক্ষ্যেই তৈরি হয় উপন্যাসের ভাষা। কলকাতা থেকে বগুড়া, অঞ্চলভিত্তিক সংস্কৃতি– ওই আঞ্চলিক ভাষায়।

২.২

'What is character but the ditermination of incident? What is incident but the illustration of character? What is either a picture or a novel that is not of character? What else do we sick in it and find in it? It is an incident for a woman to stand up with her hand resting on a table and look out at you in a certain way; or if it be not an incident I think it will be hard to say what it is.'– এ রকম অভিপ্রায়ে সাবিত্রী মুখোমুখি হলে, সে পেয়ে যায় নির্ধারিত শ্রেণিস্তরের ভাষা। সেটি কথকের। এবং কথক এমন 'ইনসিডেন্ট' তৈরি করেন যা জটিল-কঠিন (নিশ্চয়ই তা বাস্তব অনুসৃত এবং লেখকের দৃষ্টিকোণে)। কেন? এই প্রক্রিয়াটিকে শৈল্পিক সম্পূর্ণতা দানে লেখক/কথক– একপ্রকার রীতির আশ্রয় নেন। তা তেমন? 'narrative analaysis in which the chahacter's thoughts are filtered through the mind of the narrator with more or less interpretive commentary' কিংবা 'the more direct and dramatic interior monologue.' হাসান আজিজুল হক ন্যারেটর– তিনি সাবিত্রীর পুরো অংশটুকু বলার সুযোগ পান নি (যেখানে জীবনের সম্ভাব্য রূপ অরূপময়), সেখানে 'chahacter's thoughts are filtered', জানি না সে এতোবার ধর্ষিত হয়েও কোনোবার তার শরীরে অন্য কিছু ঘটে নি– তার কারণ বোধ করি জানার প্রয়োজন পড়ে না, শিল্পের গতি হয়তো সেদিকটা আহরণ করে নি। একইভাবে যখন অনেক হতে পারা না-পারার প্রশ্ন তোলা হয় তখন যা প্রত্যক্ষ তাই লেখক বলেন, নিজের কথনে। সেটুকুই তৈরি করে সাবিত্রীকে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম থেকে আজ পর্যন্ত যে নারীচরিত্র আমাদের মন ও মনন অধিকার করেছে– সাবিত্রী সে ক্ষেত্রটুকু পাবে কি-না– এমন প্রশ্নে ১৯৩৮ সালের ঘটনাটি কী করে আমাদের হয়ে উঠলো, তার পরিবেশ-প্রণয়ন হলো কীভাবে, কোন ভাষ্যে তা প্রণীত হলো– সে পঠনটির জরুরি প্রয়োজন হয়। চরিত্রের 'মিমেটিক' স্বরূপটিও তাতে দরকার হয়ে পড়ে। এজন্য 'the uses of irony in narrative art range from a simple effect such as the effects of extraordinary complexity; and the control of irony is a principal function of point of view'– ধারণাটি প্রতিষ্ঠা পেতে দেখা যায় । আবার পড়ে নিই *সাবিত্রী উপাখ্যানে*র কিছু অংশ :

www.chintafoundation.org

হাসি শোনা গেল একটা আর কী আশ্চর্য এই অন্ধকারের মধ্যেও শাদা দাঁত দেখা গেল হুদার। বাঃ দোস্তোর হয়্যা গেল! এখন চলো বিবিজান ওই ঘরোত যাই। আমরা দুই বন্ধু– যা পাই ভাগ কর‍্যা লিই, সবুরের বিবিজানেও আমার ভাগ আছে। আসো, একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে হুদা সাবিত্রীকে বিছানা থেকে নামিয়ে ফেলল। অন্ধকারের মধ্যেই টানতে টানতে তাকে পাশের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। শাড়ি লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে। হয়তো নিচের অংশটা খুলেই পড়েছে। একবার হুদার পায়ে বোধ হয় জড়িয়েও গেল। পাশের ঘরে ঢুকে সেখানকার খাটটাতে সাবিত্রীকে ফেলে দিল হুদা। কোনো কোনো জন্তু কামে বা ক্রোধে উন্মত্ত হলে ভয়ানক গন্ধ ছাড়তে পারে। সাবিত্রী টের পায় একটা উৎকট দুর্গন্ধে ঘরটা পূর্ণ হয়ে গেল।

আয়রনিটা অনুধাবনযোগ্য। এরূপ অসংখ্য স্যাটায়ার ও পরিহাসসূচক অর্থতা দিয়ে আয়রনির সৌধ সাজানো হয়। এর লক্ষ্য সাবিত্রীর 'মিমেটিক ভিউ'। যেখান থেকে প্লটের চূড়ান্ত লক্ষণ উঠে আসে।

এই 'মিমেটিক ভিউ'-এর জন্য প্রকরণে আয়রনির সংযোগ অনিবার্য। যেটি চরিত্রের 'ডিসপ্যারিটি অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং' দ্বারা নির্ধারিত। *সাবিত্রী উপাখ্যানের* সম্পূর্ণ কথক-বিবরণী 'employ this disparity to make effects of various kinds'– এখানে নারীবাদী ডিসকোর্স কিংবা ডিকনস্ট্রাকটিভ তত্ত্ব কথনের ভেতরেই অভিপ্রায় খুঁজে পায়। সে বিবরণীটি পাওয়া যায় সাক্ষ্য-বিবরণীতে। *সাবিত্রী উপাখ্যানের* বড় অবলম্বন এই সাক্ষ্যগুলো। সাক্ষ্যের ভেতরেই নির্ণীত আখ্যানের বেগ ও অভিপ্রেত গতিপথ। প্রকরণে কথকের এ অবলম্বন খুলে দিয়ে মিমেটিক রমণীর নির্মম ইতিবৃত্ত দানা বাধে। এই নির্মমতার কারণ তো বর্ধমানের প্রত্যন্ত গ্রাম ও গ্রামীণ কৃষ্টির ভেতরে আটকানো। স্বামী দুকড়ি থেকে শুরু করে দুর্বৃত্ত দুগ্‌গা ও তার স্যাঙ্গাত সকলেই নারীর রমণভোগ পালাক্রমে যাপন করেছে– নিকৃষ্ট ও অমানবিক পন্থায়। এইটিই আখ্যানের 'principal function'। এখানে সে প্রতিরোধী নয় কিন্তু 'unspoken speech' আছে– যা ততোধিক নতুন পাঠ তৈরির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। তবে সাক্ষ্য-বিবরণী উপন্যাসের কাহিনিকে বাঁচিয়েছে এ কারণে যে, একই চরিত্রের পুনরাবৃত্তি বা বলাৎকারের পৌণপুনিক অবরুদ্ধ ভাষা পাঠকের মননে আঘাতের এতোটুকু অবসর পায় নি। সে ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও পরিবেশের সূক্ষ্ম বিবরণী অনিবার্য সম্বল হয়েছে– যা পুরো আখ্যানকে অনুপুঙ্খ সহানুভূতি দিয়েছে। প্রসঙ্গত, এখানে সহানুভূতি কথাটি সহজঅর্থে নয়, পাঠকের প্রতি শিল্পের এক ধরনের দায়বদ্ধতার চ্যালেঞ্জ থেকেই নির্ধারণীয়।

৩.

www.chinnofoundation.org

শামুক, *আগুনপাখির* পরে *সাবিত্রী উপাখ্যান* হাসান আজিজুল হককে যে অন্য উচ্চতা দিয়েছে– তা বলতে দ্বিধা হয় না। তবে তার সঙ্গত স্বরূপ কী? উপন্যাসে ক্রমিক কথক বিবরণীটি আদালতের সাক্ষ্যকে অবলম্বন করে যে রিমার্কেবল [‘clear distinction between the narrator and the author’] পরিবেশ প্রস্তুত করেছে– আর তার এমন উচ্চতার সমার্থক বিবেচনা করলে, স্বজ্ঞার দর্শনটিই প্রতিষ্ঠিত হয়। চরিত্র-প্রধান হওয়ায় চরিত্রই এর ঘটনাদর্শন। তাতে করে সে নিমিত্ত কথকের অভিপ্রায় সুনির্দিষ্ট পরিবেশে দার্ঢ্যময়। আলো-ছায়া বা অন্ধকারের বিপ্রতীপ বলয়, আলোর প্রতিসরণ, ‘সন্ত’ সাবিত্রীর কিম্ভূত পরিবেষ্টন– সবই এক চমৎকার নান্দনিক প্রজেকশান। এটি তুল্যমূল্য কথা নয়, *সাবিত্রী উপাখ্যান* সাবিত্রীর ঘোরে কাটলেও শ্রীকেষ্টপুর থেকে বগুড়ার জনপদের নিখুঁত নৃ-ইতিহাস বা প্রত্নচোখে সংস্কার-মূল্যবোধের অর্বাচীনতা চিনে ফেলা সক্ষম হয়। সেখানে কিছু একরকম পুরুষচোখ দিয়ে পুরনারীর চোখও মেলে। কিন্তু সবৈব সমাজের চোখই সংবাদপ্রবণ হয়েছে। কথকের প্রশ্নও সেখানেই। এই প্রশ্নটিই উপন্যাসকারের চলতি সমাজের সংক্ষোভ ও মেসেজ। প্রসঙ্গত, বলতেই হয় সে কারণেই হাসান আজিজুল হক একুশ শতকে বসে প্রায় শতবর্ষ পূর্বের এ অঞ্চলের সংস্কৃতি ও সমাজদ্বন্দ্বের স্বরূপকে চিনিয়ে দেন– সাবিত্রী তার অবলম্বন। কারণ, এ চরিত্রটি তো এখনও সমাজবিচ্যুত কেউ নয়!

www.chinnofoundation.org

‘অপ্রাতিষ্ঠানিক’ বয়ান-কাঠামোর শিল্প : প্রসঙ্গ সেলিনা হোসেন

উৎস থেকে নিরন্তর গ্রন্থটি ১৯৬৯-এ বের হয়। সেখানে “গৈরিক বাসনা” গল্পে বলা হচ্ছে : ‘সাবানীর মনে হোল গনু ভাইর মনটা বুঝি কচুপাতার মত। বৃষ্টির পানি যেমন কচুপাতার মসৃণ শরীর থেকে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনি গনুভাইয়ের মনটা গা বেয়ে সবকিছু আপনা থেকেই ঝরে যায়। কোন দাগ কাটে না সেখানে।’ এই কথন দিয়ে গল্প শুরু হলে তা ঠিক গড়িয়েও পড়ে ওইরূপ তেলতেলে মসৃন শরীরের মতো, শেষ প্রান্ত অবধি। তরতর করে গল্পকে তীরে ঠেলে দেন লেখক, তখন আমাদের সাহিত্যের সময়টা নির্ধারিত হয় ষাটের শেষার্ধ্ব। স্থবির গ্রামে বাসনপত্র ঠিক আগের মতোই। তখন গরু- জোয়াল আর জনতা কুয়াশা ঘিরে জমির আলে ঘোরে আর স্বপ্ন দেখে, জমির ধানে মেয়ের বিয়ে কিংবা টুকটুকে বউ আনা বা কোটা ঘরটার কাজ শেষ করা। বিপরীতে শহর তো শহর নয়, ডিস্ট্রিক্ট-এ মানুষ যায় অনেক সওদা নিয়ে নয়, কোর্ট-কাচারি, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটগণের পাড়ায়, কখনও যুবারা টকি দেখতে। ঢাকা তখনও ঢাকা নয়। তবে আন্দোলন হয়, মন্ত্রী বা চৌধুরী-জমিদাররা ঢাকায় থাকেন। রাষ্ট্র চালান। সামন্ত স্বরে কথা বলেন। ওইমতে শাসন ও শাসকের কলকাঠি পুনর্গঠিত হয়। কেন্দ্র আর প্রান্ত নির্ণয় তো দূরের কথা, দেখারই সাধ্য কম। এরকম ভূগোলে এই গল্পের স্থানটি অনুরুদ্ধ, বিবরণ এরকম : ‘চরগাজলা খুব নীচু জায়গা। বর্ষার পর তিনচারমাস পর্যন্ত অনেক জায়গা পানিতে ডুবে থাকে। পতিত জমি বেশী। তাই ফসল কম হয়। যে ক’ঘর বাসিন্দা আছে তারা সবাই খুব গরীব। দিন আনে দিন খায়। আর এদের পরিশ্রমের উদ্বৃত্তে দিনে দিনে বর্ধিত হচ্ছে তালুকদার আর চৌধুরী বাড়ির সম্পদে।’ এই লিংকটি গ্রাম আর শহরের মাঝে অর্থ-সংযোগে, যোগসূত্র শ্রেণির। মার্কসকথিত ‘থিওরি অব সারপ্লাস ভেল্যু’– উদ্বৃত্ত তত্ত্বটি শ্রেণিতে নির্মিত। সেখান থেকেই শ্রেণির তত্ত্ব। শ্রেণিশোষণ। শ্রমচুরি। বৈষম্য-বঞ্চনা। কথকের কথায় এটি পূর্ব-বাংলা ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের বিকৃত চিত্র। চিত্রই নয়, নিমর্ম প্রতিচ্ছবি। প্রতিরোধী বাস্তবতা, সংগ্রামশীলতার পূর্বাপর সম্মুখগামি তৎপরতা। এরপর লেখকের ১৯৭২-এর প্রজেকশন ‘জলোচ্ছ্বাস’। এ উপন্যাসটি পূর্ব-বাংলার গ্রামীণ বাস্তবতার দ্বান্দ্বিক স্বরূপে নিরূপিত, আলেখ্যটি ধরতে সক্ষম হয়, সেটি লেখক বর্ণনায় গ্রহণীয়। ব্রাত্য জীবনায়নে কলিমন-আলেয়া-মতীন চরিত্রসমূহ যখন স্বাভাবিক, তখন ‘হাশেম চৌধুরী হাজী দানেশের মুরীদ হয়েছে’ সংবাদ কাহিনিতে তথা সমাজভূমে নতুন ইঙ্গিত পরিবৃত্তময়। নিস্তরঙ্গ কাহিনিতে সাড়া দেয়, সাজেদা-শরীফা ও করম আলীর মধ্যে আলোচনা

www.chinnofoundation.org

চলে, ঘরের সংবাদ বা আলোচনা বাইরের ঘটনাকে প্ররোচিত করে, দ্বন্দ্বময় হয়ে ওঠে। লোকায়ত পরিবেশটিতে বা ব্রাত্য পরিচর্যায় জীবন হয়ে ওঠে প্রথানুবর্তী, গড়-কাঠামোভুক্ত। তবে করম-করিমন প্রণয়, সাজেদা-হাজী দানেশের বিয়ে, লতীফ-শহীদের বিদ্রূপ, জালাল মাওলানার স্ত্রী মৃত্যু, কলিমনকে বিয়ের আগ্রহ, করম আলীর কর্মব্যপদেশে বাইরে গমন উপন্যাস-আখ্যানে উৎকর্ষের অভিক্ষেপ। এক্ষেত্রে ভূমি-মাটি-মানুষের সংস্কৃতি চরিত্রশক্তিতে গৃহীত। গ্রামীণ জীবনচেতনার সঙ্গে লোকজীবন, লোকরুচি, লোকঅভিজ্ঞতার অঙ্গীকার সমুন্নত। প্রথাগত বা পুরনো মূল্যবোধ মানুষের সামষ্টিক ঐক্যের জন্ম গড়ে তোলে। ভূমিকেন্দ্রিক বা কৃষক জীবনাচরণে সামষ্টিক কর্মপরিধিতে সংঘশক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। *জলোচ্ছ্বাসের* কাহিনিস্থান : 'পটুয়াখালীর দক্ষিণে– আরো দক্ষিণে– আরো দক্ষিণে এগিয়ে গেলে এক সময় মানুষের কোলাহল শেষ হয়' সেখানে, সে পরিবেশ ও প্রতিবেশ থেকে– নামকরণটি *জলোচ্ছ্বাস*। নামের কেন্দ্রে ওই কাহিনির প্রণালীকাঠামোটি চিহ্নিত : 'নিঃসীম শূন্যতা এক সময় মানুষের মনকে উদাস করে তোলে। বাতাস বয় শোঁ শোঁ। আরো আছে গাছ-গাছালীর অস্পষ্ট কানাকানি আর আছে সাগরের নিরবধি হাতছানি। যতদূর চোখ যায় সীমাহীন ঘোলা জল কেবলই মাতম করে। দক্ষিণ বাঙলা বঙ্গোপসাগরের কোলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে-আদরে-সাহাগে-বঞ্চনায়-হতাশায়। বিলাসে অতৃপ্ত রমণীর মত দক্ষিণ বাংলার মুখ– বয়স্ক রমণীর অভিজ্ঞতার মত দক্ষিণ বাংলার হৃদয়– বেপরোয়া ধর্ষণে বিপর্যস্ত রমণীর মত দক্ষিণ বাংলার শরীর।' *জলোচ্ছ্বাস*-এর গোড়ায় ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপটি গঠন অর্জন করে। উপন্যাসগদ্যতে যা দাঁড়ায় কিংবা যেমনটি অনিবার্য তাই। প্লটের গড়নটি লেখকের হাতে আর এক্সপোজিশনে 'জলোচ্ছ্বাস'-এর ভিত্তিটি পুনর্গঠিত। ভেতরের স্তরের আর্থনীতিক বাস্তবতা বা নির্ধারণবাদ (economic determination) যেটি উপরের স্তর কাঠামোটিকে নির্ভরতা বা প্রণোদনা যোগায়। স্মর্তব্য করে বলা যায়, উপর্যুক্ত "গৈরিক বাসনা" গল্পটি। সেই ধারায় করম আলীর সাংস্কৃতিক যুদ্ধটি এমনতরো শুরু। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপটিও সেখানে প্রবলময় হতে থাকে। উপর্যুক্ত বর্ণনার প্রতিশক্তি আলতাফ চেয়ারম্যানকে আঘাতের আকর হিসেবে দেখে। কারণ শ্রেণিশক্তিরূপে তার আবির্ভাব। প্রতিক্রিয়াশীলতার আবর্তে সে প্রধান, কেন্দ্রে থেকে সে বৃত্তকে বাজায়। বুর্জোয়া শোষণের রূপটি চেনা যায় আর ইতিহাসের পাক সেখানে দৃঢ়তায় দণ্ডায়মান। আখ্যানের কল্পনায় অবচেতনেই চেতনসূত্র রচিত, তার ইন্ধনও সেখানে উৎকর্ষময় দ্যোতনায় রঞ্জিত। চরিত্রকে উত্তপ্ত করতে যে উপাদান আমাদের দ্বান্দ্বিক ভাবনায় গৃহীত তার গাঠনিক রূপটি আমাদের প্রচলিত সাংস্কৃতিক কাঠামোতেই নিরূপিত। উপনিবেশ-উত্তর আমাদের সমাজ-বিন্যাসের আধা-সামন্ত বা আধা-

www.chinfoundation.org

পুঁজিবাদী বিন্যাসটি ইতিহাস, সংস্কৃতি বা রাজনীতির পাদপীঠে বিরূপরূপে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ব্যক্তির পরিগণন আত্মসর্বস্ব। সমাজে তার নৈরাশ্য, অবক্ষয়ী বা বৈনাশিক বীক্ষণটি দ্বন্দ্বময়তায় উৎসারিত। করম সেরূপ ব্যক্তিভূমে সক্রিয় ও সংগ্রামী। সেরূপেই তার ভেতরের বাঘ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। 'ওর জঙ্গুলে স্বভাবের রন্ধ্রপথে চেতনার এক বিষাক্ত সাপ অনবরত ছোবল দিচ্ছে'– প্রকৃত সত্যটি পেয়ে যাওয়া চলে, ওইরূপ সমাজ পরিমণ্ডলে, এরূপ প্রতীকী প্রত্যয়ে। আর সেখানে লেখকের প্রবণতাটিও নিজস্ব তাণ্ডবে আখ্যান-প্রতিষ্ঠা লাভ করে। লেখক সৃজনধারায় *হাঙর নদী গ্রেনেড* (১৯৭৬) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। হলদী গাঁয়ের মানুষের মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্তি, সলীমের যুদ্ধে যাওয়া, কলিমের আহত হওয়া, বোবা রইসের প্রতিরোধ তীব্রতা নিয়ে অধিভুক্তি এ উপন্যাসে। উপন্যাসটির সবচেয়ে বড় শক্তি, প্রধান চরিত্র বুড়ির মাতৃত্ব; যা অতিক্রম করে সে বোবাসন্তান রইসের হাতে যুদ্ধের জন্য এল.এম.জি তুলে দেয়। যেখানে তার অন্য দুই সন্তান (বুড়ি বিমাতা হলেও)ও জীবনের মায়া ছেড়ে যুদ্ধে গেছে। হলদী গাঁয়ের বুড়ির পরিবারের এ ত্যাগ একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সংশপ্তক দৃষ্টান্ত :

> রইস আমি তোর মা ডাক না শোনা মা। আমি কত নির্মম, নিষ্ঠুর হয়েছিলাম তা তুই বুঝতে পারিস নি। আমি তো জানি যে ক'টা দিন বাঁচবো তোর কষ্টে বুক পুড়িয়ে বাঁচবো। তবু এই কষ্ট থেকে আমি পার পেয়ে যাইরে যখন দেখি হলদী গাঁ তো আমারই নিঃশ্বাসের। আমারই প্রতি রোমকূপের। আমি তখন আর সবুকছু ভুলে যাই। রইস, তোর মাতৃত্বে আমার যে অহঙ্কার হলদী গাঁও আমার তেমন অহঙ্কারই।

শ্রেণিচরিত্র শাসিয়ে লেখক মুক্তিযুদ্ধের ধারণাটিকে এখানে নতুন মাত্রা দেন। প্রসঙ্গত শিল্পমান অধিক উচ্চতা না পেলেও অবধারিত চেতনার প্রকোষ্ঠে তা অতুল্য। মুক্তিযুদ্ধটি কোনো শ্রেণির নয়, ভূখণ্ডের নয়, ধনী-দরিদ্রের নয়, সম্মিলিত ও নায্যময় যুদ্ধ। নায্যতা সকল প্রবর্তনার। সর্বমুখি। সর্বপ্রবণতার বিরুদ্ধে। সমস্ত স্থিরতার বিরুদ্ধে। অচলায়তনের বিরুদ্ধে। কূপমণ্ডূকতার অভিঘাতে সংস্কারমুক্ত চিন্তার প্রবাহ আর সে মতে দাঁড়ানো অনেকানেক বণ্টনময় জীবনের প্রতিশ্রুতি। কেউ পেছনে নয়, হবেন সম্মুখগামি– গতিময়। বুড়ি তাই বহুদূর পর্যন্ত ভাবতে পারে। প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। শত্রুকে চিনতে পারে। তার নাশের জন্য সবটুকু দিতে তৎপর হয়। সর্বময় হয়ে ওঠে তারই সন্তানের নিমিত্ত, তারই সন্তানকে দিয়ে, তাকেই পাঠিয়ে, তার মাধ্যমেই ছিনিয়ে আনে রক্তময় জয়ের স্বপ্ন। কাহিনি সরল বলে ভাবলেও কিছুই সারল্যে আটকায়নি, মর্ত্যে-ত্রিদিবে সম্পূর্ণতা পায়, রাশি রাশি স্বপ্নসম্ভার গড়ে ওঠে, শ্রেয়োতর প্রতীক্ষা প্রগাঢ় হয়, নেতৃত্বটি নিয়ে নিয়ে গ্রাম, গ্রামই তো এ বাংলার লোকরূপ, প্রেমময়রূপের প্রসিদ্ধিও তাতেই।

www.chirnofoundation.org

সেটিই মূল ও মৌলবিন্দু। সেলিনা টান দেন ভূখণ্ডের রাশ ধরে, সংস্কৃতির শেকড়সুদ্ধ, তারই প্রকৃতি ধরে। সে প্রকৃতি নারীর, কোমলপ্রবণতার শক্তিতে সাধনময়, তান্ত্রিকতার সম্ভোগে আতপ্ত– 'বুড়ি', আটষট্টি হাজার গ্রামের কেন্দ্রে সে, তাদেরই প্রতিনিধি, তাদেরই চিহ্নিত শক্তি, স্ব-শক্তির সাক্ষ্যে তীব্রময়, গড়নে গঠনে সংঘময়– সে পেছনে চলে না– মত্ততায় অবরুদ্ধ হয় না, রক্তচক্ষুতে পেছপা ধায় না বরং বিপরীতে আরও ক্রুদ্ধময়, প্রতিরোধে শাণিত, সংগ্রামে ঋজু, দৃঢ়তায় কৌলিন্যমুক্ত, সাধনায় প্রখর, চিন্তায় সূচ্যগ্র। বুড়ি মা, মাতৃত্ব ও মাতাধর্মের ভেতর দিয়ে আভ্যন্তরিক শক্তিতে দীপ্তিময়, এ যুদ্ধের ভেতরে সেটি প্রমাণিত, সেলিনার সার্থকতা সেখানে, মর্মের উচ্ছ্বাসটি চিহ্নিত করায়। সমাজের দিক-নির্ণয় করায়। সমাজের প্রতিরোধশক্তিটি আনকোরা অভিষেক ঘটানোয়, নারীর হাতে, নারী প্রতিরোধে, নারীর অনুশীলিত সংস্কৃতির ভেতরে। এভাবেই নারীর রূপটি দাঁড়ায়, অভিষিক্ত হয়, চিহ্নিত শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, স্বোপার্জিত সত্তাটি নির্ণীত হয়। ঠিক সে ঘাটেই ভেড়ান লেখকের আরেকটি রচনা *যাপিত জীবন* (১৯৮১)।

এ উপন্যাসের গঠন-নির্মাণ সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর। এখানে লেখক সময়ের ইতিহাসকে চরিত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করান। কার্যত 'সময়'ই নির্মাণ। নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞায় কাহিনির অবলম্বন। সোহরাব হোসেন, মারুফ ও তার স্ত্রী সুমনা, জাফর, আঞ্জুম মধ্যবিত্ত চরিত্র পারিবারিক ও দৈনন্দিনতার ভেতরে নিজস্ব মূল্যবোধে সৃষ্টিশীল। বিষয়গুলো মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেন্দ্রিক, কমিটমেন্ট ও প্রয়াসও এ শ্রেণির ভেতরেই। প্রসঙ্গত, সেলিনা হোসেন মধ্যবিত্তের রচয়িতা। সে এই বঙ্গের। গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত। চলতিপাঠের মধ্যবিত্ত। প্রথম বা দ্বিতীয় প্রজন্ম, যে এসেছে তাঁর শহরে, চাকরি নিয়ে বা জীবনান্বেষণের সন্ধানে। শহরে এসেই সে শেখে বৈশ্বিক হওয়ার পথ। পুনরায় মর্যাদায় নিষিক্ত হওয়ার পথ। শহরকেন্দ্রিক জীবনের সম্পৃক্ততা। শহরের রূপও রসায়নে প্রজন্মের নতুন আবর্তন। সেলিনা এই রূপকাঠামোয় চরিত্র সাজান, গড়েন, ভাঙেন, সঙ্কুলতার প্রতিরোধে অধ্যয়ন করেন। অনেক রচনার ভেতর দিয়ে তিনি এ পদক্ষেপে ঋজু। সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ গড়েন, নিজেই হয়ে ওঠেন এর প্রতীভূ। সে রূপেই তাঁর কাহিনি পরিচালিত। এবং রাষ্ট্রের আন্দোলন-সংগ্রামও তাতে সেঁধিয়ে যায়। ঘটে তুমুল সম্পৃক্তি। সর্বরকমে তা হয়ে উঠতে থাকে নিয়ন্ত্রিত ঘটনার অংশ। 'সময়'কে চরিত্র করতে গিয়ে লেখকের শিল্পের নির্ধারিত ফ্রেমের আবর্তে তা অবরুদ্ধ। সম্মুখের অচলায়তন পেরিয়ে অনেকদূরের আলো অধিকার করে। সীমা পেরিয়ে যায় সীমিত আলো। অন্ধকারের বিপরীতে ঝড়ো অভিসার থাকে অপেক্ষমান।

প্রায় একই ধারার গ্রন্থ *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি* (১৯৮৭), একই উপলক্ষ বিষয় ও প্রবণতাকে ধরে এর প্রবাহ। তবে এরূপে গুরুত্বপূর্ণ *গায়ত্রী সন্ধ্যা* (১৯৯৪-

www.chinnofoundation.org

১৯৯৬), ত্রয়ীরূপে (trilogy) যার অভিষেক। এর বিস্তৃতি সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে পঁচাত্তরে স্বাধীন বাংলাদেশে। সিভিল রাষ্ট্রশাসক শেখ মুজিবের পতন পর্যন্ত। প্রজন্মান্তরের চরিত্র দিয়ে গড়ায় এদেশের জাতীয় রাজনীতির গ্রন্থিমুখ। সে অবয়বে সৃষ্টি হয় উপন্যাস। পর্যবেক্ষণে ঠিক আলাদা না হলেও সবটুকু চিহ্নিত জীবনসায়রের বাঁকে, প্রতিশ্রুত তার উত্থানপতন, দৈনন্দিনতার খড়কুঁটো আকড়ে সম্মুখগামি, অগ্রদূত যেন বয়ে আনে বিজয়ের পতাকা। নিরপেক্ষতা তাতে প্রধান। কোনো দলীয় নয় এ কাহিনি, কোনো রাজনীতির নয় এ কাহিনি, কাহিনিটি সময়ের, সে সময়ে প্রবিষ্ট জনতা, আর ওই জনতার আভ্যন্তরীণ শক্তি, জঙ্গমি রূপ, শ্রেয়োতর এগিয়ে চলার প্রশিক্ষণের দর্শন। এরূপেই এতে প্রভূত লেখক। আলী আহমদ থেকে প্রদীপ্ত প্রতীকবন্দী; বাংলাদেশ সৃষ্টিজাত প্রক্রিয়ায় সমস্ত প্রতিরোধ এগিয়ে আসে। উপন্যাসটিতে ধরা থাকে মধ্যবিত্ত পরিবারের রাজনৈতিক আশ্লেষা, সীমাবদ্ধতা এবং একই সঙ্গে আছে পুনর্গঠিত ওর ভেতরে তৈরি হওয়া স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার অনবধান সুলুকসন্ধান। একটি স্বাধীন দেশের জন্মবৃত্তান্তই এই *গায়ত্রী সন্ধ্যা*, তা-ই মূল প্রতিপাদ্য। তেইশ বছরের পাকিস্তানি শাসনের নিগড় থেকে মুক্তির প্রক্রিয়া—তার কার্যকারণসূত্র; অতঃপর স্বাধীন দেশ, রাজনৈতিক নেতা, নেতৃত্ব ও ইতিহাসসিদ্ধ হয়ে উপন্যাসে চরিত্রের আন্তঃপ্রবাহ। স্বাধীন দেশের দুরূহ পুনর্গঠন, দুর্ভিক্ষ, অব্যবস্থার সুযোগ মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী অপশক্তির হাতে দেশনায়কের মৃত্যু; সিভিল শাসনের অপচয়। উপন্যাসটি পরিসমাপ্ত।

২.

নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮৩) বাঙালির সংগ্রাম ও চেতনাদীপিত অন্য ধরনের লেখা। এতে পুনর্গঠন জমাট বাঁধল। সেই প্রধান চিহ্নিত মানুষ, কত্তোকাল আগের চিরপরিচিত পিতামাতারা কাহ্নপা বা শবরীর বয়নে বর্ণিত। সেলিনার এটি অনবদ্য কাজ, কয়েকটি কারণের উল্লেখে জেনে নিতে পারি : এক. পুনর্গঠিত জীবনসত্য, যেটি লেখা ছিল কোনো কালের ধুলোয়, দুই. চিরপরিচয় দিঙনির্ণয়, তিন. আবার তাদের পরিচয়ে চূর্ণীকৃত দর্পণে দাঁড়ানো, চার. কতোকালের ভেতরে শ্রেণিময়তার অপরিবর্তনীয় রূপনির্ণয়, পাঁচ. এই সেই জীবন যা চিরতরে সত্য, ছয়. সংগ্রামের অভিমুখ সকাতরে দেখা, সাত. উত্থান পতন শুধু সংগ্রামের সড়কে নয়, মনের সড়কেও প্রভৃতি। নামকরণেও প্রতীকী প্রতিপাদ্য, শৃঙ্গার উপরোধ, এই ভূমির চিরদস্তুর। শ্রেণিচেতনার স্বরূপটিও তাতে নির্ণিত। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের শ্রেণিদ্বন্দ্ব। 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী'—ভুসুকুর এ আত্মপরিচয়ের স্বীকারোক্তি সমস্ত সংগ্রাম-আন্দোলন ও অধিকারের ভেতরে। ব্রাহ্মণ প্রতিরোধে দেবল ভদ্র, দেশাখ, ডোম্বীর অস্তিত্বের সংগ্রাম বাঙালি চিরচেতনারই স্বীকৃতি। উপন্যাসটি শেষ হয়েছে স্বাধীন

www.chinnofoundation.org

রাষ্ট্রের ইঙ্গিতে। অপূর্ব এর উত্থাপন। এইটিই পুস্তকের উদ্ধত প্রয়াস। এবং পুস্তকসূত্রে সেইটিই প্রকাশিত বক্তব্য। বক্তব্যের ভেতরেই এর জনতারঐক্য তথা স্বাধীনতার অভিষেক। *চাঁদবেনে* (১৯৮৪)র চাঁদ শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি, সংগ্রামশীলতার প্রতীক। মধ্যযুগের জনপ্রিয় কাব্য *মনসামঙ্গলের* চাঁদসদাগরের চেতনায় রচিত *চাঁদবেনের* চাঁদ চরিত্র। বিপরীতে আজু মৃধা প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র। চম্পাইগঞ্জের মানুষ শোষণ-নিপীড়নের ভেতর প্রতিরোধী। সেলিনা হোসেন কহিনি-আবর্তে চাঁদের ব্যক্তিত্ব, অদম্য সাহসী রূপকে প্রত্নদৃষ্টিতে রূপায়ণ করেন। সেলিনা ইতিহাসের খাঁজে দাঁড়ান। বাঁক বদলান। ফিরে দেখেন। এবং সে মতে তুলে আনেন। সে ক্ষেত্রটি তিনি সৃজনের কাদামাটিতে গড়েন। তাতে থাকে নিজস্ব ধারণার ভুক্তি। কী তা? চাঁদকে নতুন অর্থের ভেতরে দাঁড় করানো। প্রতিরোধী করে তোলা। মঙ্গলকাব্যের সূত্রটিকে বাড়িয়ে দেওয়া, পুনর্গঠিত করা, সে পুনর্গঠনে নৃ-ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রলাপনে যুক্ত করা। তাতে ঐতিহ্য আর আধুনিক শর্তটি সম্পৃক্ত। ব্যাপকভাবে। মনে হয় চাঁদ নিম্নবর্গীয় কিন্তু অশেষ আত্মবিশ্বাসে, অনবদ্য শক্তিতে প্রখররূপে উঠে এসেছে। সে একালের। এ সময়ের মানুষের প্রতীকী, তাদের প্রতিনিধিত্বকারী। সাহসে সে প্রখর সম্ভাবনাশ্রয়ী। এই অর্থারোপ, আর বিপরীত প্রতিরোধ, শ্রেণিবিচ্যুতির পরিখায় দাঁড় করানো সম্ভব। চাঁদ চরিত্রটি তার শ্রেণিবিচ্যুতির ভেতর দিয়ে অনেক শক্তি সঞ্চয় করে। ভাষাও অর্থ পাল্টায়। ভাষার স্থানচ্যুতি ঘটে। উগ্র এ স্থানচ্যুতির বৈপরীত্য (bionary opposite) দ্বারা এটি নির্মিত। পুনর্গঠন ধারণায় চাঁদ প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। স্বভাবশুদ্ধ রূপেই তা চিহ্নিত। আরোপিত নয়, কিন্তু অর্থারোপিত– বিশেষ দর্শনে। অর্জিত শক্তিতে সে সমাজ অধিকারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত। এটি অর্জিত শক্তি, একালের আত্মমর্যাদার সোপার্জিত চিহ্ন। বিপরীতে আজু মৃধা শক্তিহীন সত্তায় পরিগণিত। উচ্চ/নীচ, ক্ষমতা/ ক্ষমতাহীন, কর্তৃত্ব/ কর্তৃত্বহীন এই বৈপরীত্য সমাজের তত্ত্বসূত্রে এখন নতুনভাবে নির্ণীত– মানবাধিকারের শর্তে, শ্রেণিচেতনার আনুকূল্যে এবং আত্মমর্যাদার অধিকারে। সেখানে মানুষ শ্রেণি-বর্ণ-গোত্রের ঊর্ধ্বে। চাঁদ সে প্রবণতায়, বিশেষ অর্থে সেলিনার উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা পায়। কার্যত, ভাষার এ স্থানচ্যুতির ভেতরে সে তৈরি করে নিয়েছে 'ডিজেয়ার' বা 'মুক্ত এলাকা' (free play)। এভাবে আগের উপন্যাসেও 'ভুসুকু বাঙাল' কে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। সেও উঠে আসে স্বাধীকারের চিন্তায় ও স্বপ্ন-প্রতিষ্ঠার প্রখরতায়। যে সাতটি কারণ অনুরুদ্ধ ওই উপন্যাসসূত্রে সেখানে এই অবয়ব লগ্নতা লক্ষণীয় বলে মনে হয়। একইসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাস্বরূপে উত্তর-উপনিবেশবাদী চিন্তনও তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে :

www.amarfoundation.org

> Have you ever felt that the moment you said the world 'I', that 'I' was someone else, not you? That in some obscure way, you were not the subject of your own sentence? Do you ever feel that whenever you speak, you have already in some sense been spoken for? or that when you bear others speaking, that you are only ever going to be the object of their speech? Do you sense that those speaking would never think of trying to find out how things seem to you, from where you are? That you live in a world of others, a world that exists for others?

উদ্ধৃতিটিতে বৃটিশ উত্তর-উপনিবেশবাদী চিন্তক রবার্ট জে সি ইয়ং কিছু প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন। যেখানে 'আমি'/ 'অন্য' দর্শনে নিজস্ব (obscure) সংস্কৃতি-দর্শন-ইতিহাস সম্পর্কে দ্বিতীয় ধারণা বা প্রথাগত চিন্তার বিপরীত ধারণার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। প্রাচ্য প্রাধান্যের বিষয়টিও আসে, যেখানে উর্বর ও উদ্বেগময় সংস্কৃতির অর্থ দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। এর গুরুত্ব 'বস্তুগত উত্তরাধিকার' ও 'সাংস্কৃতিক সাফল্য'– যেখানে পৃথিবীর সব মানুষের অধিকার সমান। বণ্টন সমান। বৈষম্য নেই। আধিপত্য নয়। কর্তৃত্ব নয়। সব মানুষ সমঅধিকারে মর্যাদাবান। এতে শ্রেণিপার্থক্যও থাকবে না। 'অপর'কে তুচ্ছ করে 'আমি'র প্রাধান্য দেওয়া নয়। শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক উচ্ছেদ করা। সেলিনার উপন্যাসে সে চলটি দেখা যায়। ভুসুকু এদেশীয় বাঙ্গাল। সে এক স্বরাজ্যের স্বপ্ন দেখে। স্বরাজ্যের কারণে সে বণ্টন ও উৎপাদনের অধিকারের দায়টুকু তার মতো করে কায়েম হতে পারে। স্বপ্নটি তেমনই। তা কখনো একাত্তরের আগে ছিল না। এই সেই একাত্তর। মুক্তির একাত্তর। স্বভূমির একাত্তর। একটি দেশজন্মের ভিত্তি। কলোনী-উত্তর দেশ– যেখানে অর্থের সমবণ্টন হতে পারবে সুনিশ্চিত। সেই স্বপ্নটি পুঁতে দেন আখ্যানে। অন্য উপন্যাসে চাঁদও উত্তর-উপনিবেশ চিন্তায় সেরকম শক্তি অর্জন করে। কলোনি-উত্তর ধারণায় ভুসুকু বা চাঁদ 'অপর' চেতনা থেকে উঠে আসা প্রতীকী চরিত্র। এখানে চাঁদ অর্থায়িত হয়, নতুন অর্থে তার মানবী শক্তির ঘোষণা দেয়, অভিপ্রেত শক্তিতে হয়ে ওঠে সংগ্রামী, আঘাত হানে বিপরীত শক্তির অভিমুখে; চাঁদের এ অর্জিত শক্তি দিয়ে তার শ্রম-অধিকার সামাজিক অধিকার দায়িত্বের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করে। উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিক ফ্রাৎস ফ্রানোন এর *Black Skin White Masks* গ্রন্থের কথা, যেখানে বলা হয়েছে : 'That, in a white society, such an extreme psychological response originates from the unconscious and unnatural training of black people, from early childhood, to associate "blackness" with "wrongness". That such unconscious mental training of black children is effected ... which are

www.chinnofoundation.org

cultural media that instil and affix, in the mind of the white child, the society's cultural representations of black people as villains.' এভাবেই গড়ে ওঠে অবচেতন আধিপত্যের চেতনা। যেটি নেগ্রিচুড প্রবক্তা এমে সেজেয়ার ও তার শিষ্য ফ্রানোন উল্লেখ করেছেন। সেলিনার উপন্যাসে বৈপরীত্য তত্ত্বে এ ভূখণ্ডের আপামর জনতার প্রতিনিধিত্বকারী মানুষের উপেক্ষিত সংস্কৃতির পুনর্নির্ণয় করা হয়েছে। গড়ে তোলা হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিশক্তির বিপরীতে স্বীয় সংস্কৃতি ও শক্তির আভ্যন্তরীণ স্তরকাঠামো। সেলিনা সে প্রশ্নটি তুলে ধরেন স্বতঃস্ফূর্ততায়, আরোপ করে নয়। তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাও নয়, স্বভাবসুলভ রঙে রেখাচিত্র দান করেন। তাতে এ কলোনিশাসিত বঙ্গীয় জনপদের স্বরূপটি সেখানে নতুন মাত্রা পায়, ঘোষণা করে তার আত্মমর্যাদার অধিকারের স্বরূপে। এ সূত্রে আরও কয়েকটি বিষয় উপন্যাস-নন্দনে যুক্ত হতে পারে। অ্যালা রবগ্রীয়ে-কথিত নব্যউপন্যাসতত্ত্বে নৈর্ব্যক্তিকতা ও চলমান ঘটনার অবিকল উপস্থাপনার যে আখ্যা নির্ধারিত হয় তাতে প্রকরণ ও রচনাবৈশিষ্ট্য ভিন্ন বস্তুপ্রজ্ঞা অর্জন করে। সেলিনা আলোচ্য উপন্যাসসমূহে পূর্ণাঙ্গরূপে সে দায়ে প্রতিষ্ঠিত না হলেও নৈর্ব্যক্তিকতার ভেতরে যে জ্ঞানপাঠটি উঠে আসতে পারে তা উপনিবেশোত্তর চিন্তার ধারণা। যেখানে মানবস্বরূপের চিহ্নায়ক ধারণা পুনর্গঠিত হয়।

ঠিক একইরূপে সমুদ্রদ্বীপে বাসকৃত মালেক-সাফিয়ার ঝিনুক সংগ্রহ এবং মুক্তা আহরণ, শক্তিধর তোরাব আলী-গণি মিয়ার উত্থান ও নিয়ামক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া, মালেকের সমুদ্রজয়ী সংগ্রাম, স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রেম-প্রবৃত্তি ইত্যাদির শিল্পআবহ *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৮৬) উপন্যাস। মালেক প্রতিজ্ঞায় হাঙর শিকারের সমস্ত উপকরণ নিয়ে জীবনযুদ্ধে জয়ী। মালেক ছাড়াও সালেক, বসির আলী, সুজা প্রাণবন্ত চরিত্র। খলচরিত্র তোরাপ ও সহযোগী গণির অর্থানুকূল্যে অনেকেই তাদের অনুচর হলেও শাহপরি দ্বীপে মূলত সৎ মানুষের সংগ্রাম ও বৃত্তি-অনুষঙ্গই জয়ী হয়। এই বৃত্তি-অনুষঙ্গধৃত মানব-মানবী শ্রেণিহীন। নামেই তার স্বস্প্রকাশ। লেখকের অন্য উপন্যাস *কালকেতু ও ফুল্লরা* (১৯৯২)ও সংগ্রামের অভিমুখ রচনা করে। স্বৈরশাসনের রাষ্ট্রে জনতার স্বাধীনতা নির্বাসিত। স্বাধীন নগরের প্রত্যাশা কালকেতুর; স্বপ্ন দেখে শাসকশক্তির সমস্ত স্বেচ্ছাচারিতা অবসানের। ফুল্লরাও নারী অধিকারে, লৈঙ্গিক বৈষম্যের অবসানে, জনকল্যণকর রাষ্ট্রের প্রত্যাশা করে। এটি বঙ্গাল ভুসুকুর রাষ্ট্র নয়, তার চেয়েও আরও জটিল হওয়ার রাষ্ট্রের শোষণের ভেতর থেকে উঠে আসা ব্যক্তিচরিত্র। এমে সেজেয়ারকথিত 'নেগ্রিচুড' ধারণা কালকেতুকে সমগোত্রীয় করে তোলে। এক্ষেত্রে কালকেতু পুনর্নির্মিত হয়, সেখানে সে শুধু তার অধিকার নয়, গণতন্ত্র ও অধিকারের সংস্কৃতির কথা বলে। নগর নির্মাণের যে স্বপ্নদ্রষ্টা সে, তা শুধু এই

www.chirafoundation.org

বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের তাবৎ অধিকারচ্যুত জনতার। যারা স্বেচ্ছাচারির পদাঘাতে পদদলিত, বৈষম্য আর শোষণের করালগ্রাতে জর্জরিত। সেখানে সে নিজ শ্রেণির বিচ্যুতি ঘটিয়ে উঠিয়ে আসে গণতন্ত্রের নেতৃত্বদানকারী শক্তি হিসেবে। এই স্থানচ্যুতি বা শ্রেণিবিচ্যুতির শক্তিটি অর্জন করে বৈপরীত্য তত্ত্বে। এ শক্তির ঐক্যে তৈরি হয় বাখতিনকথিত 'কার্নিভালে'র। সেটি সংস্কৃতির সূত্রে যূথবদ্ধ। উচ্চস্থানচ্যুতির ফলে সে এ শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়। ফুল্লরা নারী, তার প্রতিষ্ঠা এখানে আরও জঙ্গমশাসিত। নারীবাদ নয়, নারীর প্রথাগত চিন্তার বিচ্যুতি ঘটে। সে লৈঙ্গিক ধারণার ঊর্ধ্বে অর্জন করে মানুষের শক্তি। সেখানে বৈষম্য নয়, সমঅধিকার-সমবণ্টন শ্রম-উৎপাদন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মর্যাদা যুক্ত হতে সক্ষম হয়। একই ধারায় সেলিনার চরিত্র ইলা মিত্রও। কেন এ নির্বাচন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'হোয়াইট মাস্ক' খুলে ফেলে, সংস্কৃতির ধারাবাহিক হীনন্মন্যতার বিপরীতে এক সংগ্রামশীল অভিঘাত। সে ঘোষণা করে প্রান্তের টান। কেন্দ্রকে অস্বীকার করে। কেন্দ্রচ্যুতিই প্রধান লক্ষ্য। তাই ভুসুকু, কালকেতু, চাঁদ পুনর্গঠিত হয়। সেখানে প্রতীকী ও নির্বাচিত ইলা মিত্রের কঠোর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেটি তৃতীয় বিশ্বের গণ-মানুষের চিন্তাতত্ত্বে। ব্যাপক অর্থে এটি এশিয়া আফ্রিকা ল্যাতিন আমেরিকার স্থানিক সংস্কৃতির জয়ধ্বজা, ইউরোপীয় কেন্দ্র ধারণাকে অস্বীকার করে। সেলিনা উপন্যাসের চরিত্র বিন্যাসে ততোদূর না পৌঁছালেও যেসব প্রান্তিক চরিত্রকে তুলে আনতে সচেষ্ট হন তা 'নেগ্রিচ্যুড' প্রবণতায় ভূমিষ্ঠ। সংগ্রামের ঝলক বিচ্ছুরিত, প্রতিবিম্বিত চিন্তার পৈঠা স্যবলটার্ন গোত্রের সংস্কৃতির উৎসবজাত। বঞ্চনা সেখানে বাতিল। শোষক একাকী। শোষিত ঐক্যবদ্ধ। এই ঐক্য একদা শুষে নেয় শোষকের রক্তচক্ষুর প্রতাপ। তুমুল শক্তি অর্জন করে– তার সংস্কৃতির ভেতর থেকে। এই সংস্কৃতির উৎসবই কৌম জীবন এক হয়। কালকেতুরা প্রাণ পায়। ফুল্লরা একা থাকে না। স্মর্তব্য, শুধু অধিকার বা মর্যাদাই নয়, সংস্কৃতির লোকায়ত অবয়বটুকুও আসন করে নেয়– উচ্চতা পায়, বুর্জোয়া বা 'হায়ারার্কি' ভেঙে পড়ে। চিরদিনের অভ্যাসের ব্যত্যয়ে প্রান্তের এই স্থানিক বিচ্যুতি শুধু কলোনি-উত্তর ধারণাই নয়, মার্কসীয় চিন্তাতত্ত্বেরও অভিব্যক্ত রূপরেখা। আফ্রিকার চিনুয়া অ্যাচিবি, ন্গুগি ওয়া থিয়োংগো আর এদেশে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। সেলিনা সে প্রবণতায় সিদ্ধিতা না পেলেও স্পর্শ করে পেরেছেন সেই বলয়ের উপনিবেশিতের আকর উপাদানসমূহ। তাঁর রচনাও আত্মসচেতনতার সংবেদবাহি। সে কারণেই চরিত্র নির্বাচন এই ভূখণ্ডের কৌমসমাজ অনুসরিত।

৩.

www.chinnofoundation.org

সেলিনা হোসেন তেভাগানেত্রী ইলা মিত্রকে অবলম্বন করে লেখেন *কাঁটাতারে প্রজাপতি* (১৯৮৯)। চরিত্র হয় ইলা মিত্র (১৯২৫-২০০২)। নাচোলে স্থিতি, শোষণমুক্তির সংগ্রামে একাত্মতা। ওয়াজেদ মোড়লরা বেপর্দার কথা বললেও কৃষক কায়েস মণ্ডলরা বুঝে ফেলে শ্রেণিচেতনার স্বর। তেভাগার সংবাদ এলে কহিনির নেত্রী পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠেন। জাতপাতনির্বিশেষে সবাই ইলা মিত্রের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ। তাদের 'রানীমা' বন্দি। অকথ্য নির্যাতন। সেলিনা হোসেন পূর্ণাঙ্গ সত্য ও সৎ সহানুভূতিকে চিত্রিত করেন, যেন প্রজাপতির কাঁটাতারে অবস্থান; অর্থদ্যোতকতা অর্জন করে। উপন্যাসের কাজ কী? প্রথাকে ভাঙা। কেন্দ্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শ্রেণিচরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করা। সংস্কৃতির প্রধান স্বরূপটি শ্রেণির আখরে প্রতিষ্ঠিত করা। নবায়ণ করাও। মিথ ফ্যান্টাসীর দৃশ্যকেও করে তোলেন তাৎপর্যময়। *জ্যোৎস্নায় সূর্যজ্বালা* থেকে কিছু অংশ পর্যবেক্ষণে আনা যেতে পারে :

> ওসমানের যেদিন জেল হলো সেদিন রশিদা কাঁদেনি। কাঁদতে পারেনি। যে জীবিকার প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না, স্বামীর ধরা পড়ায় তার বিবেকচেতনা তাই তেমন করে কঁকিয়ে ওঠেনি। বরং বহুদিন ধরে রশিদা যেন এ দিনটির প্রত্যাশায় কাঁটা হয়ে ছিল। ওসমানের সঙ্গে ওর শেষ দেখা হয়েছিল জেলখানায়। বুড়ি শাশুড়ী কেঁদে কেটে অনর্থ বাঁধিয়েছিল আর রশিদা স্থির দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছিল একটি মানুষের অভাব ওকে কতোটুকু বিড়ম্বিত করবে। ওসমান গরাদের ফাঁক দিয়ে ওর হাতটি ধরেছিল এবং তখনিই ভয়ানক কান্না পেয়েছিল রশিদার। ও বুঝেছিল– ওসমান নেই ওর দেহের কাছে মনের কাছে এবং সমগ্র অস্তিত্বের কাছেও। ওসমান ফিস ফিস করে বলেছিল ধৈর্য রাখিস। আবার তোর কাছে ফির‍্যা আসুম।

প্রান্তিক মানুষের যুদ্ধ এবং নারীর মন ও সংস্কৃতির স্বরূপে গাঁথা হয় কাহিনি। সেখানে সরল ও সহজ পংক্তিতে বুনে দেন লোকগানের ছন্দ : 'দকখিনে বাতাসেরে/হারে নারীর যইবন কাঁনদেরে/ কাঁনদে যইবন প্রাণ বন্ধুর লাগিয়ারে/ ও প্রাণ বন্ধুরে।' সত্যের সামূহিক সন্ধান যেহেতু মূর্ত সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সেখানে লোকায়ত জীবনের অনভিজ্ঞাত স্বতঃস্ফূর্ততায় উদ্ভূত হতে পারে অনেকার্থ দ্যোতনা, সেটি জনপ্রিয় সংস্কৃতির মধ্যে তা প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ্য হতে সক্ষম। মিখাইল বাখতিন বলেন : 'Folk-carnival debates between life and death, darkness and light, winter and summer etc. permeated with the pathos and change the joyful relativity of all things, debates which did not permit thought to stop and congeal in an one-sided seriousness or in a stupid fetish for definition or singleness of meaning... ' কার্যত, উচ্চরা কৃত্রিম ও একরৈখিক, তারা বিপরীত ভাবনায় নিম্ন বা

www.chinnopriofoundation.org

প্রান্তিকদের অকৃত্রিম স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিকে সর্বদা তাচ্ছিল্য করে থাকে। সেলিনা হোসেনের ধারাবাহিক পঠনে প্রধান্য দেখা যায় প্রান্তিক বা লোকায়ত জীবনের স্ফূর্তিজ্ঞাপক অভিব্যক্তি। যেখানে 'ওসমান', 'রশিদা', এই আর্থ-সমাজের সংগ্রামশীল সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিভূ– যারা ঐতিহাসিকভাবে ভুসুকু, চাঁদ বা কালকেতুর উত্তরসূরি। বাখতিনের দ্বিবাচনিক ভাষ্যে তিনি বলেন 'জনপ্রিয় সংস্কৃতির প্রকরণ থেকে উৎসারিত বেসরকারি রচনাপুঞ্জ' কিংবা 'একবাচনিকতা ও রুদ্ধতাকে মোকাবিলা করতে দেখা দেয় কার্নিভালের বিপ্রতীপায়ন'। কারণ 'কার্নিভালের ধারণায় রয়েছে মুক্ত পরিসর, রয়েছে তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক অন্তঃস্বর'। আধিপত্যের বিপরীতে এ অপ্রতিষ্ঠানিক স্বরের ভেতরে নির্ণীত হয় বঙ্গীয় সংস্কৃতির বিশাল উৎসবের আয়োজন– যেখানে সর্বগ্রাসী প্রতিরোধ তৈরি হয় অন্তেবাসীর অভিপ্রায়ে। এমনটা এদেশে, এই এশিয়ায় বাণিজ্য পুঁজি এবং এখনকার কর্পোরাল দাপটের বিপরীতে অনদ্যান্ত। তবে প্রশ্নও রয়েছে। সেলিনার শিল্পে তা আরও প্রকট, পাঠ ও পাঠককে করে প্রশ্নশীল। অনেক প্রশ্নের ভেতর দিয়ে বিস্তৃত ও ব্যাপক জীবনের সুস্থতার দিঙ্‌নির্ণয় চলতে থাকে। আধুনিক সময়ের ভেতরে তা গড়ে ওঠে রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে। সে অভিপ্রায়টি চিহ্নিত করে কেন্দ্র-বিপরীতে প্রান্তিক মানুষকে। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রগাঢ় করে তোলে। তাতে সেই চিহ্নিত শক্তির অনুপ্রেরণা, বহুস্বরিক প্রণোদনা, বেসরকারি সাধ ও সামর্থ্য অনেক বেশি স্ফূর্তি নিয়ে পরিবেশিত হয়। এরূপে উপর্যুক্ত চরিত্রগুলোই প্রধান দৃষ্টান্ত। যে লোকায়ত চিন্তার ভেতরে কার্নিভালের স্বর প্রতিলিপিত হতে থাকে, সেখানে খণ্ডিত আচার নয় সম্পূর্ণ স্বরূপটিই স্ফটিকস্বচ্ছ রূপক পায়, ক্রিস্টাল অবয়বে সে প্রকাশ করে দ্বন্দ্ব বা জঙ্গমের প্রতিপাদ্য রূপ। বাখতিনকথিত 'দ্বিবাচনিকতা' তাঁর উপন্যাসে চিহ্নিত স্বর। কীরূপে। সরকারি, কেন্দ্র, উচ্চ, পুরুষ এর বিপরীতে বেসরকারি, প্রান্ত, নীচ, নারী অভিপ্রেত, সংজ্ঞার্থও চিহ্নিত কিন্তু এ স্বরটি কেন চিহ্নিত? স্বরূপ নির্ধারণে। বঞ্চনার সমীকরণে। বণ্টনের অপব্যয়ে। বিভক্তির উচ্চাশায়। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে। কর্তৃত্বের প্রয়াসে। এর ভেতর দিয়েই চরিত্রায়ন হয়। চরিত্র চিহ্নিত হয়। চরিত্র বুঝে নেয় দৃষ্টিকোণ। তাতে কেন্দ্রীভূত হয় মেসেজ। দ্বিবাচনিকতার (bionary opposite) ভেতরেই মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়– বঞ্চনার অভিপ্রায়ের কর্মে। উচ্চতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আর কার্নিভাল, প্রতিরোধ সংস্কৃতি, ভাঙার ভেতরে গড়ে ওঠে পরিবর্তমান 'বাচনিক তত্ত্ব'। বাখতিনকথিত এ তত্ত্বের ভেতরেই কথাসাহিত্যের আয়তনের স্বরূপ নির্ধারিত হয়। উপরের উদ্ধৃতির ভেতরে যে পরির্তমান সমাজচিত্র বিবরিত তাও দ্বিবাচনিকতার অভিপ্রায়ে নির্ণীত। তাকে সে আয়তনে চিহ্নিত করা যায়। বাচনিক অভিপ্রায়ের ভেতরে অতিরিক্ত পাঠ রচিত হয়, সেখানে শ্রেণিতত্ত্ব বা সমাজভিতের স্বরূপে

www.chinnofoundation.org

নির্ধারিত হতে সক্ষম জীবনের তল উন্মোচন ও স্বভাবের আয়তনকে নির্ণয় করা, শ্রেণি-বর্ণ-গোষ্ঠীর নৃচিন্তার মুখ্যস্বরূপটিও তাতে হয় পুনর্গঠিত। সেলিনা হোসেন বাচনিক কথকতায় দাঁড় করান পূর্ণ বাঙালি জাতিসত্তার সংগ্রামী পটচিত্র– সেখানে কৌম-নৃসমাজের পাশাপাশি তৈরি হতে থাকে বর্ণবিভাময় দ্বান্দ্বিক প্রতিবেশ, পূর্ণ সংগ্রামী প্রয়াস, কৃষি-শ্রম থেকে উঠে আসা স্বাপ্নিক অভিপ্রায় ও সংস্কৃতির দস্তুর চিহ্নিককরণ, বণ্টন-বঞ্চিত মানুষের স্বর ও সংস্কৃতি প্রভৃতি দ্বিবাচনিকতায় প্রয়াস পেলে মার্কসকথিত শ্রেণিটির-সংস্কৃতিও দাঁড়ায়। এভাবে সেলিনা-পাঠ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। পাশাপাশি আর একটি তত্ত্বেও তৈরি করে নেওয়া সম্ভব তার শিল্পের আয়তনিক স্বরটি নির্ণয়ের জন্য। নিম্নবর্গের তত্ত্ব। আন্তেনিও গ্রামসী (১৮৯১-১৯৩৭)র উত্তরসূরি গায়ত্রী স্পিভাককথিত 'inferior rank and station, whether because of race, class, gender, sexual orientation, ethnicity or religion' –সেলিনার বেসরকারি বয়নকাঠামোটি এ প্রবণতার ভেতরেই প্রকাশমান হয়ে ওঠে।

৪

সেলিনা হোসেনকে বেসরকারি আঙ্গিক-কাঠামোয় যুক্ত করা সম্ভব আরও এসব উপন্যাস দিয়ে : *পদশব্দ* (১৯৮৩), *মগ্ন চৈতন্যে শিস* (১৯৭৯), *ক্ষরণ* (১৯৮৮), *খুন ও ভালোবাসা* (১৯৯০), *উত্তর সারথী* (১ম উপন্যাস), *যুদ্ধ* (১৯৯৮), *ভালোবাসা প্রীতিলতা* (১৯৯২), *টানাপড়েন* (১৯৯৪), *দীপান্বিতা* (১৯৯৭), *মর্গের নীল পাখি* (২০০৫) প্রভৃতি। অদ্যাবধি তিনি প্রচুর লেখার ভেতরে যে সৃজ্যমান উচ্চতাটি রচনা করেন, তা প্রভূতরূপে কর্তৃত্ববিরোধী রাজনীতি কিংবা প্রান্তিক মানসতার ভেতরে পুনর্গঠিত জীবনের দ্বান্দ্বিক রূপটি চিহ্নিতকরণে। প্রশ্নশীলতায় তিনি তুলে বসেন, কখনো ভুসুকু, কখনও মধ্যবিত্ত সুদীপ্ত শাহীন, কখনও ওসমান-সাবানীদের। এরকম আরও অনেক চরিত্র তৈরি করলেও প্রধানত যে শৈল্পিক বিশ্বাসটিতে তার অনুরক্তি তা এদেশীয় ভূমি-ঐতিহ্য-পুরাণশক্তির মানুষকে ঘিরে। তবে বাঙালির সদ্য বিকশিত পুঁজির আওতায় যে পুনর্গঠিত মধ্যবিত্ত যার সদম্ভ রূপ ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে কর্পোরাল প্রবণতার ভেতর দিয়ে, তার গরল-গ্লানি-অসহিষ্ণুতা কিংবা তথাকথিত রাজনৈতিক শক্তির স্বরূপ বাচনিক অভিধায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একই সঙ্গে পরিশুদ্ধ মধ্যবিত্তও তিরোহিত নয়– তাঁর লেখায়। কিন্তু লেখকের কাজ কী? শুধু সমাজকে বা ব্যক্তিকে চিহ্নিত করাই তো মূল কাজ নয়। যে সমাজ-ভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকে চরিত্র, তার অভ্যন্তরীণ কাঠামো– এ সময়ে অনেক জটিল। মনস্তত্ত্বও অস্বাভাবিক, উদ্ভটত্বে পরিপূর্ণ। যেমনটি ষাটের দশকের বিশ্বসাহিত্যে চিত্রিত। বিভিন্ন ইজম বা আন্দোলনের সৃষ্টিও সেই বাস্তবতা থেকেই। আর সে

www.chinafoundation.org

বাস্তবতার ভেতরেই চরম শিল্পের জন্ম দিয়েছেন, কবি-উপন্যাসকার-গল্পকারবৃন্দ। সেলিনা হোসেন ষাটেই শুরু করেছেন, যে সাবানী তার লেখায় উঠে এসেছে, সে এই বাংলার– কৃষিজভূমির কৌমসমাজের প্রতিবেশে আর্থ-কষ্টের অনুকণায় শাণিত তার মন। সেটি তাঁর লেখায় অনেকটা বাইরের (external) প্রবণতায়, ভেতরের কুটিল কৌশলে পুনর্নবায়িত হতে পারে। গড়ে উঠতে পারে শ্রেয়োতর অভীপ্সার দেয়াল, কঠোর কর্তৃত্বের বিপরীতে অধিকারের স্বীকৃতিস্বরূপ। ব্যক্তির বিনাশী ক্ষয়ের উৎস আত্মশক্তির উচ্চাশা নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। ফ্রাৎস্ কাফকা, চিনুয়া অ্যাচিবি বা মিলেন কুন্ডেরার লেখায় তার দর্শন মেলে। সেলিনা অনেক ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন লোকজ সংস্কৃতির অভিমুখ। লোকগানে তথা ছড়ার ভেতরে তুলে আনেন চলমান সংস্কৃতির সৌন্দর্য, যেটি বেসরকারি আঙ্গিকের পুনর্নবায়িত উপাদান। এমনটা খুব বেশি একটা কেউ করেননি, এদেশের উপন্যাসশিল্পে। ব্যপকতায় চেনা যায় শুধু আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে। সেলিনাও এক্ষত্রে অনেক পরিপক্ব, তবে চরিত্রের শ্রেণিচরিত্র নির্ণয়ে প্রথানুগ, সরলীকৃত চরিত্রই তার লক্ষণীয়। কার্যত, লেখকের ব্যাপক শিল্পভিত্তিটি গড়ে ওঠে কারুকাজের ভেতরের অভিপ্রেত টেক্সচারে ও তৎ-উদ্ধৃত পৌরাণিক কাঠামোয়। নিছক বয়ান সেখানে মুখ্য নয়। আর এই মতে যে, ইজম বা তত্ত্ব নিয়ে কাহিনি বয়ানে লিপ্ত সেটি এ উপাখ্যানে প্রয়োগ হলেও, সিরিয়াস আখ্যানে আরও হয়ে ওঠে নতুন পাঠ, গভীর দৃষ্টিকোণ চিহ্নিত। সেলিনা সরল বয়ানে, অনেক লেখার ভেতরে সর্বদা তা সম্ভবপর নয়, যদিও প্রভূতরূপে উপন্যাসের সারাৎসারে তা কাম্য থাকে কিন্তু প্রাচুর্যময়তার ঘাটতি অপ্রকাশমান নয়। পুনরাবৃত্তির দেয়ালও কড়া নাড়ে, উপস্থিত মানুষের স্পন্দনশক্তি গুরুতর হয়ে উঠতে পারে না– এই ত্রুটির কথা বলতে চাই শিল্প উপভোগের তারতম্য বিবেচনায় এনে। তবে যে 'বেসরকারি' বয়নটি দীর্ঘ সময়ের লেখালেখির ভেতর দিয়ে সেলিনা রচনা করেছেন তা বাংলাদেশের উপন্যাসে তাৎপর্যময়, অন্যতর; অন্যদের অনুসরিত বা অনেকভাবে অনুসরণের পথের নির্মল অবমুক্তি। এ প্রবন্ধে আলোচিত কিছু তত্ত্ব ও নির্বাচিত বোধের ছায়াপথ সেলিনার লেখাকে জীবনের গমন-প্রত্যাগমনের নিরিখে চিনে নেওয়া চলে, ওই প্রান্তিক মানুষদের বেসরকারি বুননস্তম্ভে দাঁড়িয়ে। আগামীতে তৈরি হতে পারে সেটির ডিটেল পাঠ তেমনি আরও লেখকও তৈরি হতে পারেন তাঁরই অনুসরিত পথে, চলতি নতুন ক্রিয়ার সংসর্গে– যেখানে বেসরকারি কার্নিভাল আরও উত্তুঙ্গ মাত্রা পাবে, বাংলা কথাসাহিত্যকে ঘিরে। ##

www.chinfoundation.org

মিলনের গল্প এবং জন-সংস্কৃতির বেসরকারি মুক্তাঞ্চল

জার্মান প্রবাসে তখন, লেখেন *কালো ঘোড়া*– মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস, যে মুক্তিযুদ্ধ তার চেতনার কেন্দ্রে, অহংকার ও গর্বও; তারও আগে লেখা হয় *ভালোবাসার গল্প*– ১৯৭৭-এ, তখন লেখক হওয়ার শুরু– জনপ্রিয় হওয়ারও কাল, পরে ক্রমশ দায়বদ্ধ লেখক– সমাজশীল লেখক, চেতনশীল কারুর্কর্মী– ইমদাদুল হক মিলন (জ. ১৯৫৫)। একসময় নাটকও লিখে থাকেন বেশকিছু, হন তুমুল জনপ্রিয়, ক্রমশ এগিয়ে চলেন লেখকরূপে, তাঁর লেখক হওয়ার গল্প তৈরি হয়, হয়ে ওঠেন ঈর্ষণীয় এবং শীর্ষস্থানীয় গল্পকথক– তখন জনপ্রিয়তা ছাড়িয়ে, হয়ে ওঠেন বিচিত্রজীবনের কথক, যেমন পাঠচাষীদের লেখা নিয়ে *ভূমিপুত্র*, হাজাম পেশার *কালাকাল* আর প্রবাসজীবন নিয়ে লেখা *পরাধীনতা*। কিন্তু দুর্দান্তভাবে সবকিছু ছাপিয়ে ওঠেন নূরজাহান-এ, যেটি লেখা হয় ১৯৯২ সালে, ফতোয়াবাজদের ফতোয়ার রশিতে ১০১ দোররার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত নারী নূরজাহান, এক গ্রামের প্রতিনিধি হয়ে, চাপা অন্ধকারের বিপরীতে তুমুল প্রতিবাদের স্বর আর সত্তাশীল দ্রোহের করুণ ও অবিসম্বাদিত আলেখ্য নির্ভর এই মহাকাব্যিক উপন্যাস; মিলন তার চেতনার শক্তিকে তীব্র দায়শীলতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্যিই অনুমেয় হয়ে ওঠে, একজন গল্পকারের কাজ, কথকের কথনশীলতার প্রয়োজনীয়তা– যেটি আরও প্রকাশ্য ও দীপ্যমান ইমদাদুল হক মিলনের *শ্রেষ্ঠগল্পের* ৩৩ টি গল্পে (হাতেখড়ি সংস্করণ : ২০০২, ঢাকা)। এতে বাঙময় বিক্রমপুর ও তার গ্রাম মেদিনীমন্ডল। 'সবুজ পাতার'র গ্রাম, কৈশোর গ্রাম, আনন্দময় তরঙ্গশীল গ্রাম এসব অধিকাংশ গল্পের প্রতিপাদ্য। তবে গ্রাম তো সংস্কার-কুসংস্কার, কূপমণ্ডূক, দারিদ্র্য আর অন্ধবিশ্বাসে ঠাসা– স্মৃতি ও শ্রুতিবিজড়িত সত্য-মিথ্যার বয়নে প্রহ্লাদিত, তাতে জীবনের ভেতরের উপভোগ, অফুরাণ প্রাণব্যঞ্জনা কিংবা ঘনঘোর অন্ধকারের বিপরীতে উৎসবের অনুপ্রাণন, কম নয় কিছু! বিচিত্র জীবনরসের জারণ আর কঠিন সংস্কারের কুঠারাঘাতে ওইসব গল্প হয়ে ওঠে প্রফুল্লময় দার্ঢ্যে ভরপুর। ইমদাদুল হক মিলনকে খুব শ্রেয়োশীল লেখকরূপে সহজেই চিনে ফেলা যায়– প্রামণ্যকথকরূপে যিনি বলে ওঠেন : 'জোয়ারের দিন থেকে নিরন্নের কাল, ভূমিকা থেকে পরাধীনতা, সোনাদাস বাউল নয়ত বনমানুষ, যাবজ্জীবন নয়ত দরগাতলার জোড়া সাপ, এই তো আমি, আমার লেখা।'

২.

www.chirnofoundation.org

গল্প কী? কেন গল্প লেখা, কী তার ন্যারেশন? শুধুই কী গল্প বলা, মানুষ খোঁজা– কেন? এক্ষেত্রে কেবল সমাজস্তরের ইঙ্গিত নয়, 'ব্যক্তিসর্বস্ব' মানবপ্রকৃতির স্বরূপটি, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার প্রতিনিধিত্বে, নির্মমতার প্রতীকে, অপরূপ করে তোলা– তাতে শ্রমনিষ্ঠ বৃহত্তর অংশের মানুষসকল 'তুচ্ছ' হয়েও অসংখ্য সত্যে কার্নিভালের মাহাত্ম্য পেয়ে যায়, চলে তার ভাষার শক্তিতে প্রতিলিপিত ক্রিয়াকৌশল আর ললাটলিপির বিধানকে ক্রূর করে পরোক্ষ-প্রতিরোধে বলে চলা কুসুম-কথা, পবন-কথা, মমিন-সাধু, টুকির কথা আর বুলবুলির কেচ্ছা কষ্টগাথা। ভাষা ব্যবহারেই এ সত্যটির প্রতিষ্ঠা। যা point of view তথা লেখক নির্ধারিত, 'awarness', 'exploitation'–এর সম্ভাব্য আয়রনিক সত্যস্বরূপ। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও শ্লেষে 'the problem of the authority of the narrator' বলে যা গণ্য– বর্ণনার যে কৌশল, সেখানে মুহূর্তটি মুখ্য। উদাহরণ টানি :

> বুলবুলির বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। উদাস দুঃখি গলায় বলল, একবার ধান কাটতে গিয়া বাও হাতের লউঙ কাইট্টা হালাইছিল বাজানে। ম্যালা রক্ত বাইর অইছিল। দেইকা মায় কইল ধানক্ষেতে রক্ত দিয়া আইলানি। হুইনা বাজানে কইছিল, পেড ভইরা ভাত খাইতে অইলে রক্ত তো ইট্টু দেওন লাগবই। আমিও আইজ পেড ভইরা বাত খাওনের লেইগা রক্ত দিছি। এইডি হেই রক্ত।

প্রসঙ্গত বলতে হয় : 'The uses of irony in narretive art range from a simple effect such as this to effects of extraordinary complexity; and the control of irony is a principal function of point of view' আয়রনি রচিত হয় ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে; শিল্পীর বর্ণনার আবহে সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল কর্পোরেট বাস্তবতায় শিল্পীর নন্দনভূমি 'সমস্যা' ও 'সুযোগে'র প্রক্রিয়া নির্ধারিত। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ইঙ্গিতে ইতিহাস-ঐতিহ্যের সূক্ষ্ম সন্ধিবিন্দুটি তাতে দিব্য হয়ে ওঠে। শিল্পীর সার্বভৌম সত্তাটি তখন সৃষ্টিতে মুখরিত। "নিরন্নের কাল" গল্পের বুলবুলি আর দীনু কিংবা "জীবনযাত্রা" গল্পের মনীন্দ্র-নুড়ি-টুকির কথোপকথনে গল্পপরিসরের 'সাত-আট বছরের ব্যবধান' সূত্রটিতে পুঁজির বণ্টন ও অসমতার ক্ষেত্রটি সুযোগ ও সমস্যা তৈরি করে দিয়েছে। চিত্রটি নিপুণ ও তলস্পর্শী। তবে নিরন্ন বুলবুলির বিষাদ ও হতাশার ভরকেন্দ্রটি খুব দ্রুত চিনে ফেলা যায় গল্পে। কিন্তু প্রাচুর্য অনিঃশেষ। কেচ্ছা ওই ধান-দুধ-মাছভরা জীবনের। উৎসবের। যা কাল-পরিক্রমায় এক পর্যায়ে উদ্ভট ও আতিশয্যপূর্ণ। কৌতুকপ্রদও। উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিটি অনেকার্থদ্যোতক, শোষণ-চিহ্নিত। "জীবনযাত্রা" গল্পের মনীন্দ্রও 'ভাতের চেয়ে কি শরীর বড়' প্রশ্নের মুখে ফেলেছে মা-মেয়ে সকলের কাছে। সেখানে প্রথানুগ সমাজ-আচরণ, আদেশ-নির্দেশ টেকে না। ভেস্তে যায় সম্ভ্রম।

www.chinnofoundation.org

তাই একে একে পাশের বাড়ির বউ আতবী, আতবীর মেয়ে পরী, নুড়ি, টুকি সকলেই গুণীন মণীন্দ্রের কাছে একাকার হয়ে যায়। মনঃসমীক্ষার অভিঘাত এতে ধরা পড়ে। লেখকের এই প্রান্তিক জনমানসচিত্র ও নারী সমাজের অপ্রাতিষ্ঠানিক বয়নকৌশল আধিপত্যবাদের বিপ্রতীপ স্তরটি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। স্মর্তব্য, এই পীড়নের বহুস্বরিক রূপ দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু লেখকের বয়ানে এটিও সত্য এ পীড়ন যত সর্বগ্রাসী তার প্রতিরোধও তত অনিবার্য। লেখকের 'ফোক-কার্নিভাল হিউমার' টোনটি এখানে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এরকম আরও একটি বয়ান "মেয়েটির কোন অপরাধ ছিল না" গল্পে। এ বিনির্মাণও প্রায় একই টোনের হলেও এর প্রতিস্বর আলাদা মানের। যেখানে ধর্মতন্ত্রের বীভৎস গলিত রূপ প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। আধিপত্যবাদী আকরণের ভেতর জমে ওঠে যেন অজস্র অস্তিত্বের মিছিল। এখানে উচ্চারিত পাশবিকতার প্রতি তর্জনীসংকেত। ইমদাদুল হক মিলন তাকে অন্তেবাসী করতে গিয়ে এক শ্লেষগর্ভ দ্বিবাচনিকতার (binary opposite) জন্ম দেন। প্রকৃত সত্যকে (real world) কাঁধে নিয়ে কাম্য জগত (fictional world)-কে সৃজন করেন। এ দুই জগতের সফল যোগসূত্রেই তো আর্ট রচিত হয়। এখানেই পাঠকের রসাস্বাদনের মর্ম উৎসাদিত। কিন্তু রসাস্বাদনের জন্য ফিকশনাল জগতে যেমন কিছু কৌশল ও সত্য-কল্পনার উপস্থাপন দরকার তেমনি বর্ণনায়ও *illustration*-টুকু কাম্য মানতে হয়। এবং তা তৈরি হয় *allegory* এবং *satire*-এর মতো ঐতিহ্যানুগ বিষয়ের প্রয়োগের ভেতর দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, কাহিনিগদ্যে তা-ই দস্তুর :

১. **কাহিনিগদ্যে চরিত্র** / representational character :

ইমাম সাহেবের পায়েল কাছে ঝাড়ুটা রেখে দৌড়ে গিয়ে কুসুমকে ধরল কানা হাশেম। তার সঙ্গে জুটল মোল্লা বাড়ির বদর। কোত্থেকে যেন গরু বাঁধবার একগাছা দড়ি নিয়ে এল বদরের বড়ভাই মোতালেব। মুহূর্তে বকুল গাছের সঙ্গে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলল কুসুমকে। দৃশ্যটি দেখে কেউ কোনও কথা বলল না।, হাহাকার করে উঠল কেবল পরী। মাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, ওমা বুবুরে বান্ধে কেন? তোমরা কিছু কও না?

২. **কাহিনিগদ্যের অর্থময় প্রতিপার্শ্ব** / meaning of narrative :

বাঁশঝাড়ের মাথার ওপর কাত হয়ে আছে ক্ষয়া চাঁদ। চাঁদের আলো তেমন স্বচ্ছ নয়, রজতরেখার জলের মতো সামান্য ঘোলাটে। এরকম আলোয় মানুষের ঘরবাড়ি কেমন দুঃখী মনে হয়। যেন বা অনাদী কালের কোনও গভীর দুঃখ বুকে চেপে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের পাতায় পাতায় খেলছে নিশীথবেলার মগ্ন হাওয়া। হাওয়ার শব্দের সঙ্গে মিশেছে ঝিঁঝির ডাক। দূরে কোথায় একাকী ডেকে ক্লান্ত হচ্ছে রাতপাখি। ডানায় চাঁদের আলো মেখে উড়ে যায় বাদুড়। কুসুমদের বাড়ির বাঁশঝাড় তলায় দাড়ান পবনের পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করে

www.chinnofoundation.org

একটি সাহসী ইঁদুর। ঝরা পাতায় সর সর করে শব্দ হয়। কিন্তু এসবের কিছুই খেয়াল করে না পবন। একদৃষ্টে কুসুমদের বড় ঘরটির দিকে তাকিয়ে আছে সে।

পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল সমাজে ধর্মতন্ত্রের মর্মান্তিক অন্ধকার ও গলিত কুৎসিতরূপে ব্যক্তি ধরা পড়ে। নীতিভ্রষ্ট, স্বার্থসার চরিত্রও এখানে লক্ষণীয়। সমাজের কূপমণ্ডূক শ্রেণিচরিত্র ধূর্ততা-কৃত্রিমতা-পুরুষতন্ত্র ও ক্ষমতা-কর্তৃত্বের তোষণ শক্তিকে প্রয়োগ করে, বিপরীত মানুষ বা মানবেতর অপ্রাতিষ্ঠানিক জীবনপ্রণালীর দিকে। এতেই সমাজে চিরস্থায়ী বৈষম্য ও বিচারহীনতা বে-আইনের নির্বিচার রাজত্ব চলতে থাকে। সেজন্য সর্বস্তরের বা সর্বদৈশিক কাঠামোতে বাস্তবতা বন্দি হয়। রাষ্ট্র-কাঠামোর সর্বোচ্চ থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত এই তাঁবেদারি আর ক্ষমতার পর্যাবৃত্ত রচনা করে। ইমদাদুল হক মিলন এমন অর্থারোপেই গল্পের *illustration*কে করায়ত্ত করেন, বেছে নেন তার প্রতিনিধিত্বশীল বিপুল জনসমাজের সহযোগী শক্তিকে। যেখানে সর্বতোভাবে গড়ে ওঠে মুক্ত পরিসরের সূত্রাধার, প্রান্তিক মানুষের উৎসাদনশীল দ্বন্দ্বময় বিবর্তিত সমাজরেখার ধারণা।

৩.

কাহিনিগদ্যে প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র সমস্ত সম্ভাব্য দিকগুলো অনুসন্ধান করে। এতে করেই রচিত হয় ব্যক্তি-অস্তিত্ব। সমাজ সংক্ষুব্ধ এ চরিত্র প্রকৃত জগতের চিত্রকেই প্রকাশ করে। শিল্পিত শর্তে তা হয়ে ওঠে দূরগামী। একইভাবে শিল্পীর বর্ণনার ভেতরের অর্থারোপ অনুষঙ্গটিতে প্রকাশ পায় আলঙ্কারিক ডিসকোর্স। এক্ষেত্রে শিল্পপ্রযুক্ত ধ্বনি (tone) একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে। কারণ, 'Allegorical narrative is a mode of thought and a mode of story-telling, and there is inevitably a healthy tension between these two modes' এরূপে লেখকের বর্ণনায় প্রতীক প্রাচুর্যময় অভীক্ষা অর্জন করে। উত্তেজনার প্রকোষ্ঠটিতে বিরাজমান থাকে ওইরূপ ভাষা ও চিন্তা। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ প্রয়াসটি তখনই সিদ্ধিতা পায় যখন উপর্যুক্ত প্রবণতা দুটি সর্বাত্মক সম্মিলনে দাঁড়ায়। এ লক্ষ্যে আমরা গল্পগ্রন্থের "প্রস্তুতিপর্ব", "লোকটি রাজাকার ছিল", "নেতা যে রাতে নিহত হলেন" গল্পের বিষয়ের দিকে চোখ ফেরাতে চাই। রাজনৈতিক গল্প এগুলো, ভাষাও ভিন্ন, চিন্তার ধরণও ভিন্নস্বরের। "প্রস্তুতিপর্ব" মুক্তিযুদ্ধের গল্প। তাতেও পদ্মা, পদ্মার বাসিন্দার চরিত্রে প্লট নির্মিত, চোখে পুরোপুরি সত্য-নির্ণয়। ডায়ালেক্ট ওই লয়ে চিহ্নিত : 'এই মাওয়ার বাজারে আইলে দোকানদাররা বিড়িসিগ্রেটের প্যাকেট দিত, চা মিষ্টি খাওয়াইত। বেবাক মাগনা। মুক্তিবাহিনী

www.chinnofoundation.org

কুনো কথা কইলে কুনো হালায় রাও করে! আর অহন দেহেন যুইদ্ধ খতম, দেশ সাদিন অইল, আমাগো বাল দিয়াও পোছে না কেউ।' রতন সম্পর্ক করেছিল আলতার সঙ্গে। যে আলতার বাবা শান্তি কমিটির সঙ্গে যুক্ত–রাজাকার। নেতাইচরণের ভাষার ভেতরে এই রাজাকারের ত্রাসনের ভয়াবহ রূপ বিদ্যমান। রতন মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু আলতার সঙ্গে প্রেমের কারণে রাজাকারকে স্বাধীনের পর কিছু বলেনি। কিন্তু ক্রমশ এক পর্যায়ে রাজাকার ক্ষমতাধর হয়ে পড়ে এবং রতনকে জেলে পাঠায়, মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দেয়। কূটচরিত্র হিসেবে চেয়ারম্যান গল্পের কেন্দ্র, খোকা-দুলাল-বাচ্চু আর নেতাইচরণ রাজাকার নিধনের জন্য নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব ঘোষণা করে। গল্প দীর্ঘ নয় কিন্তু ঘন ও গভীরতাস্পর্শী। "লোকটি রাজাকার ছিল"-এ রাজাকার পরিবর্তন হয়ে পরিশুদ্ধতা অর্জন করে। নিজাম নামের এ চরিত্রটি রফিকের যুক্তি ও ন্যায়ের কাছে পরাস্ত হয়। সংলাপ-নির্ভর গল্প এটি। নামকরণেই বক্তব্য নির্ণীত। তবে নিজামের দারিদ্র্যই রাজাকার হওয়ার কারণ ছিল। স্বাধীন দেশে এসকল চরিত্র বাস্তবানুগ ও চাক্ষুষ বর্তমান। "নেতা যে রাতে নিহত হলেন" বিদ্রূপ ও পরিহাসপ্রবণ গল্প, এর শেষ সংলাপ : 'আমাকে হাজতেই রাখুন, ছেড়ে দিলে নেতা হত্যার প্রতিশোধ নেব।' এ নেতা কে, কেন সে নেতাকে দেখতে এসেছিল এবং বন্দীত্ব বরণ করেছিল– তার পূর্বাপর ব্যাখ্যা এতে আছে। এই গল্পগুলো সুবেদী ও স্পর্শকাতর। "দেশভাগের পর" মাইনরিটি সাপ্রেসান, সংস্কারে-কুসংস্কারে আটকান, সুন্দর ও অনবদ্য গল্প। স্পর্শকাতর ও মর্মস্পর্শী এ গল্পটি প্রশংসার্হ। 'inventions of an individual brain' অনবদ্য বলেও শেষ করা যায় না। ভাষাপুটে 'উমাচরণ', 'রতন', 'নেতাইচরণ' প্রভৃতি কতো পরিশ্রমের, বাংলাভূখণ্ডের এ সম্পদ গল্পভাষায় তো অতুল্য! এসবের ইমেজস্পর্শ নিশ্চয়ই আমাদের গল্পের মহার্ঘ। সে প্রক্রিয়ায় বঞ্চিত, আইনহীন প্রান্তবর্তী মানুষ, তাদের সংস্কার-কুসংস্কার-বিশ্বাস মিলিয়ে শুদ্ধিকরণের লিখনবিশ্বে একপ্রকার প্রতিশোধস্পৃহার প্রাধান্যও গৃহীত হয়। এ গল্পে তাই দাঁড়িয়ে বলা চলে : 'He is retelling a traditional story, and therefore his primary allegange is not to fact, not to truth, not to entertainment, but to the *Mythos* itself—the story as preserved in the tradition which the epic story teller is re-creating'. লৌকিক জীবনবারতা এ ধরনের গল্পে পরিচর্যা পেয়েছে। আঞ্চলিক জীবনবৃত্তের নানাকৌণিক সম্ভাব্যতা এখানে বিস্ময়কর। 'retelling a traditional story'-র প্রয়াসটি তো কম নয়, কিন্তু তা সমূলে, বাস্তব অনুষঙ্গে, পূর্ণাঙ্গ করে প্রতিষ্ঠিত।

'it is more of a portrait than A portrait of the artist—more static, less dynamic; more mimetic, less mythic'– এ ভাবেই ভাষাকে

www.chimofoundation.org

গণমানুষের অনিবার্য উচ্চারণে বন্দি করেন যেখানে অন্তঃশক্তির প্রাণনা, প্রেরণা সামগ্রিক শুদ্ধতা অর্জন করে। আর তার বহিঃপ্রকাশ একেবারে ভূমি-মাটি-শ্রম সংলগ্ন। নামাঙ্কিত চরিত্র সাক্ষ্য দেয় তার নিঃসৃত ভাষা ও প্রবণতার প্রকারভেদ গুণে। আর শ্রেণিস্তর নির্ধারণে এ ভাষার ভূমিকা যেমন অনবদ্য তেমনি অনিবার্য। সংস্কারই তো গোঁড়ামির কেন্দ্র। যেখানে সত্য পরিহাসপ্রিয়– বুলবুলি, কুসুম সেই সত্যসন্ধ– যেখানে রাষ্ট্র দুর্বল, মানুষগুলোর অপ্রাতিষ্ঠানিক বয়ান দ্বিবাচনিকতায় প্রলুব্ধ। সেরকম অন্যান্য গল্পসমূহ 'দরগাতলার জোড়াসাপ' কিংবা 'ফুলের বাগানে সাপ'-এর মতো গল্পগুলো একই বার্তা বহন করে। 'সাপ' যখন পৌরাণিক ইমেজ, যৌনতার প্রতীকও।

৪.

বিষয়টি নিরন্নকালের, সে প্রক্রিয়ায় প্রান্তবর্তী মানুষ, তাদের সংস্কার-কুসংস্কার-বিশ্বাস মিলিয়ে অস্তিত্বিক মূলীভূত, বাস্তবানুগ ও পূর্ণাঙ্গ অন্তেবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতীকে প্রতিষ্ঠিত। সর্বোপরি জীবনই তাতে প্রতীকায়িত। চরিত্রসমূহ এক ইমেজে দাঁড়ায়। ফিউডাল ইমেজে এর বিবর্ধিত রূপের বিপরীতে পদ্মা-তীরবর্তী অঞ্চলের বিনাশটি সুচিহ্নিত। যারা হাজার বছরের নিজস্ব সংস্কৃতির অংশীদার– তাদের শোষণ, বিতাড়ন-নির্যাতন, ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকিয়ে জীবনকে নস্যাৎ করার ফন্দী, সম্ভ্রমহানির জন্য লালসার উদ্যত ফণা, জাতকুল-মর্যাদা বিনষ্ট করে এলাকার সম্পদ ও সম্পত্তি লুণ্ঠন বক্ষ্যমান গল্পগুলোর ইঙ্গিতময় প্রতিপাদ্য। এজন্য সবচেয়ে বড় আনুকূল্য প্রতিবেশের– যেখানে বিনাশী রূপটি চিহ্নিত, এবং ওই সৃজনীতে আটকা পড়ে গল্পের পরিকাঠামো। এজন্য লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি (point of view), প্লটগঠন, চরিত্রনির্মাণ, সিনারিও, গল্পকৌশল এবং শৈলী অনুপঙ্খনীয় কাম্য হয়ে ওঠে। বিষয়-নির্বাচনে সাধারণত যে দৃষ্টিকোণ ইমদাদুল হক মিলন প্রয়োগে করেছেন– সেটি সম্পর্কে আমরা তিনটি বিষয় বিবেচ্য জ্ঞান করতে পারি : এক. চরিত্র, দুই. কথক, তিন. দর্শক। এ প্রস্তাবনার ভেতরেই কথক দ্রষ্টা, যিনি লেখক এবং সর্বজ্ঞ দর্শক। পলাতকা ছায়ায় এই কথক-দ্রষ্টা হেঁটে চলেন, কুড়িয়ে নেন তার পাথেয়। অবিকল ব্রাত্যনিগ্রহ আর প্রান্তিক পর্যাবৃত্ত কায়েমের ক্ষেত্র তাতে নির্মিত, ডকুমেন্টেশনটি ক্রমশ শাখা-প্রশাখা ছড়ায়, খুনসুঁটি-ঠাট্টায় বিস্তৃত হয়। ফলে বিধৃত রূপ-সমীপবর্তী ভাষা ও উপভাষা এবং প্রতিবেষ্টিত বাংলার ভূগোলে তাতে অনিমেষ রূপে সৃজিত। লেখকের এ রুক্ষ্ম-প্রকৃতিই মিখায়েল বাখতিন কথিত 'কার্নিভাল'– লোকায়তের প্রত্যাঘাত। যার সাথে অস্তিত্বিক উপস্থিতির ইঙ্গিতটি জড়িত। অচলায়তন ভাঙার শর্ত নির্ধারিত। মিলন শুধুই গল্প বলেন না, তার গল্পের খাদে আটকানো মানুষগুলো বায়বীয় নয়, নয় ভুঁইফোঁড় উন্মুল

www.chinnofoundation.org

বস্তুজ্ঞাপক কোনোকিছু। তাইতো নির্বাচন তার মনীন্দ্র কবিরাজ, মুক্তিযোদ্ধা রতন-রফিক, কালাকেষ্টা, মমিন সাধু, সোনাদাস বাউল কিংবা বুড়া নেতাইচরণ। লেখক ভূমিমানুষের শরীক। বাস্তবতার বেসরকারি কারিগর। কড়ায়গণ্ডায় তিনি তুলে আনেন অতুল লোকায়ত আত্মাকে, প্রাণশক্তির শরীককে– বৈভবের পরিমার্জনায়; আর এইটিই তখন গল্পে পর্যবসিত হয়। রূপ-রস-গন্ধের ইন্দ্রিয়জরিপে এ ভাষাবস্তুটি "omniscience" রূপে জীবন্ত ও দ্রোহদীর্ণ। ক্ষমতাদম্ভের বিপরীতে পরিস্রুত তা দীপ্যমান সীবনচিহ্ন।

ইমদাদুল হক মিলনের কিছু গল্পের ভেতরে ক্ষয়িষ্ণু নাগরিক মধ্যবিত্তের নিপাট চরিত্রও আছে। সেখানে বিবৃত প্লট-কাঠামো ঝরঝরে, অনেকটা মেলোড্রামাটিক। "খেলোয়াড়" কিংবা "গগনবাবুর জীবনচরিতে"র মতো গল্প তেমন ক্ষুরধার না হলেও নির্ভার বিবরণে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্তের ঠাসা চালচলন, দাম্পত্য জীবন, রীতিনীতি; বিষাদাক্রান্ত জীবন-কাঠামো, নির্মল হাস্যরস, উইট-শ্লেষ-ব্যঙ্গ বিবরণের ধাঁচে পরিষ্কার ধরণে চিত্রিত। তবে তা সিনেমাটিক হলেও, ভেতরের ক্ষয়-কষ্ট-টানাপড়েন-যন্ত্রণা, নাগরিক উঞ্ছবৃত্তি একপ্রকার দৈনন্দিনতার ভেতর দিয়ে পরিচিতি পায়। গল্প-কাঠামো দুর্বল নয়, বেগবান রীতিতে যেন বর্ষণের ধারাপাত, ওই গগনবাবুর জীবন– কেরাণীর জীবন। দেশভাগের খণ্ডচিত্র এ গল্পের বাড়তি মাত্রা। স্বপ্ন-কল্পনা, সত্য-মিথ্যা, বাস্তব-অবাস্তব মেশানো গগনবাবু। দৈনন্দিনতার ভেতরে স্ত্রী সনাতনী, সন্তান ও পড়শীর মধ্য দিয়ে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ একপ্রকার নাগরিক সংশ্লেষে জারিত। গল্পের বক্তব্য এখানে বহুবিস্তারি নয়, সাদামাটা ও প্রথানুগ। "খেলোয়াড়" গল্পটিও একই প্রকৃতির। বীশু ওতে মূলচরিত্র। মধ্যবিত্তের উপরিতলের দৃশ্যপাতে এক বালকের বিস্ময়দৃষ্টির ভেতরে খেলোয়াড়-ন্যাক– অতঃপর আয়-রোজগার, সংসারের আচার-নিয়মকানুন-মূল্যবোধ-আবেগ-রোমান্স নিয়ে প্লট গঠিত। সংলাপ কাহিনিকে গতি দেয়। এ ধরনের গল্পে জনপ্রিয়তার কলতান আছে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পাঠকও আমলে নেন কিন্তু নাট্যিক আবরণে মোড়া গল্পের ভেতরচিত্র ইমদাদুল হক মিলনের অন্য গল্পের চেয়ে গুণে ও মানে দুর্বল মনে হয়। তবে এর উল্লেখনীয় দিক : গতিশীলতা ও মধ্যবিত্তিয় রোমান্টিক ভাবাবেগ। কোথাও তার কাহিনি এতোটুকু আটকায় না। উদাহরণ :

ক)

সে আমার অপেক্ষায় জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ঘরে তার নীল ডিমলাইট জ্বলবে। মিষ্টি সুরে বাজবে মিউজিক। এই তেইশ বছরের জীবনে ওই একটিমাত্র সুন্দর দৃশ্য আমার অপেক্ষায় থাকে। হায় কতদিন যে ওই প্রিয় দৃশ্যটির কাছে আমার ফিরে যাওয়া হবে না।

www.chinnofoundation.org

খ)

দু-পাঁচটা উপরি টাকা আজকাল প্রায়ই পান গগনবাবু। সে টাকায় অফিস ফেরার পথের বাজার খরচাটা উঠে যায়। দুপুরবেলা অফিসে ক্যান্টিনে গিয়ে এক কাপ চা আর দু'টো বিসকিট খাওয়া যায়। সকারবেলা ভরপেটে রুটিভাজি খেয়ে বেরোন। দুপুরবেলা না খেলেও চলে। বাসায় ফিরে রাতে একবার বাত খাবেন। তারপর চৌকিতে একা শুয়ে ঘুম। কিন্তু উপরি পয়সা পেলে দুপুরবেলা চা বিসকিট খাওয়ার জন্যে মনটা আকুলি বিকুলি করে। মনকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে জা বিসকিটটা তিনি খান। দিন চলে যাচ্ছে গগনবাবুর।

মিলনের এ গল্পগুলো তার গল্প হয়ে ওঠার, পরিচর্যার সময়; অনুমান হয়। কিন্তু বিভাগোত্তর নাগরিক বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান। আমাদের মধ্যবিত্তের অনেক পরিবারের একটি সাধারণ দর্পণ এখানে চিত্রিত। সমাজের ভঙ্গুর শ্রেণিস্তর– এত ধরা পড়েছে। শীর্ণ জীবন তবে মৌলিক এ শ্রেণিস্তরটি তো অস্বীকার করা অসম্ভব। কারণ, এরাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মুক্তিযুদ্ধ কিংবা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বের শক্তি। রাজনীতিরও।

৫.

ভঙ্গুর গ্রামীণ সামন্ত সমাজের অবক্ষয়ী চিত্র ইমদাদুল হক মিলনের গল্পের অন্যতম দিক। এ ধরনের গল্পের কথনস্রোত বেশ তরঙ্গসঙ্কুল। পুঁজির প্রতিক্রিয়া জনসংস্কৃতির ভেতরে নানারকম শ্রেণি ও স্তর তৈরি করে। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিও তাতে কম যায় না! মিলনের গল্পে অন্তেবাসী জনসংস্কৃতির প্রত্যক্ষণ ঘটেছে– মূলত ভূঁইফোঁড় উচ্ছিষ্টভোগী লুটেরা পুঁজির ব্যক্তিচরিত্রকে ঘিরে। যার একটি অংশ চাকরি-বাকরি বা উঞ্ছবৃত্তির সূত্রে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিস্তরের। সেখানে কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ আছে, রাষ্ট্র-কাঠামোও তাতে সম্পর্কসূত্র রচনা করে। বিষয়গুলো উঠে এসেছে মানবেতর জীবন-ভূমি-বৃত্তি- পেশার ভেতর দিয়ে। কিন্তু আদতে জনসংস্কৃতির বেসরকারি বয়ানটিই লেখকের মূল কেন্দ্রবিন্দু (focal point)। সে কারণে দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের মতো ঘটনাও গল্পের পরিসর খুঁজে নিয়েছে। পদ্মতীরবর্তী অঞ্চলের ইতিহাস-নৃ-সংস্কৃতি উপভাষিক দ্যেতনায় স্বয়ম্ভূ হয়ে উঠেছে। শ্রেষ্ঠগল্পে কার্যত মিলন-পাঠ, আধিপত্য বা প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে লোকায়ত মানুষের বেসরকারি বয়ানসূত্র নির্ণয়– যেখানে প্রতিস্পর্ধিত জনতার কার্নিভালে মুক্ত-পরিসরের সম্ভাবনাই জেগে ওঠে। গড়ে উঠেছে প্রান্তিক সংস্কৃতির বিপুল প্রয়াসী উত্তীর্ণ মানুষের জীবনবাদী কণ্ঠস্বর। এবং অনেকরকম চরিত্র থাকা সত্ত্বেও সেইটিই মিলনের গল্পভূমির মুখ্য পাদপীঠ। ##

www.chinnofoundation.org